

THE BIOGRAPHY OF
ABU BAKR AS-SIDDEEQ

এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আবু বকর আস-সিদ্দীক

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী
অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

**THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMMAD EL-SALLABI**

সত্যের আধুনিক প্রকাশ



মাক্তাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

REPRINTED, MAR 2021

مكتبة الفرقا

The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
আবু বকর আস-সিদদীক
রাযিয়াল্লাহু আনহু
দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাদ্ধাবী

—◆—
অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর
মুহাদিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজিপুর



MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ



আবু বকর আস-সিদদীক রা. (দ্বিতীয় খণ্ড)

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamibooks.com

maktabfurqan@gmail.com

☎ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬-২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ☎ +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫

পঞ্চম প্রকাশ : শাবান ১৪৪২ / মার্চ ২০২১

চতুর্থ প্রকাশ : যিলকদ ১৪৪১ / জুন ২০২০

তৃতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৪১ / অক্টোবর ২০১৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৪০ / অক্টোবর ২০১৮

প্রথম প্রকাশ : যিলকদ ১৪৩৭ / আগস্ট ২০১৬

প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

গ্রন্থ সংশোধন : মুহাম্মাদ সানোয়ার হুসাইন, আব্দুল কাদের

ISBN : 978-984-91176-7-4

মূল্য : ৳৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)

US \$20.00

অনলাইন পরিবেশক

www.islamibooks.com; www.rokomari.com

www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী রচিত সিরাতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি অনবদ্য গ্রন্থ। কিতাবটি ফয়সাল শফিক কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ২০০৭ সালে মাকতাবা দারুস সালাম প্রকাশনা থেকে *The Biography of Abu Bakr ra.* নামে প্রকাশিত হয়। পাঠকের পাঠ-সুবিধা এবং সৌন্দর্য ও মননশীলতার দিকটি বিবেচনা করে গ্রন্থটি অনুবাদ করে দু-খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আমরা ইতোমধ্যে জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছি। অনুবাদ কার্যক্রম ও যথাযথ সম্পাদনার প্রয়োজনে একটু দেরিতে হলেও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারায় আমরা মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রথম খণ্ডের মতো এটিও মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর দামাত বারাকাতুহুম সাহেব সম্পাদনা করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি গ্রন্থটির কিছু অংশ মূল আরবী থেকে অনুবাদ করে সহযোগিতা করেছেন। এ পর্বে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদ ও ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পারস্য ও ইরাক অভিযানে তার দূরদর্শিতা, সমর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণসহ একজন আদর্শ সমরবিদ হিসেবে তার কার্যক্রম বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া তার ইন্তেকালের ঘটনাবলী, উত্তরসূরী নির্বাচনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, উপদেশ ও শিক্ষাসহ তার সম্পূর্ণ জীবনের কর্মপরিধির বিবরণ শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুই বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যা

বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে প্রুফ-সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাস্থীণ চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও কবুল করুন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রকাশক ও অনুবাদক

১১/১ ইসলামী টাওয়ার

বাংলাবাজার, ঢাকা

২৭ যিলকদ ১৪৩৭ হিজরী

৩১ আগস্ট ২০১৬ ইসায়ী

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ	১৩
প্রথম। রিদ্ধাহর পারিভাষিক অর্থ এবং কতিপয় আয়াত	১৩
দ্বিতীয়। ধর্মত্যাগের কারণসমূহ ও প্রকারভেদ	১৭
তৃতীয়। নবুওয়াতের শেষ সময়ে ধর্মত্যাগের ঘটনা	১৯
চতুর্থ। ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর অবস্থান	২১
পঞ্চম। মদীনা রক্ষায় আবু বকর রা.-এর পরিকল্পনা	২৮
ষষ্ঠ। মদীনা দখলে মুরতাদদের ব্যর্থ আক্রমণ	৩০

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ	৩৮
প্রথম। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত মোকাবেলা	৪১
ক। অভ্যন্তরীণভাবে অকার্যকর করার চেষ্টা	৪১
খ। সুশৃঙ্খল বাহিনী প্রেরণ	৪২
গ। ধর্মত্যাগীদের উদ্দেশে প্রেরিত চিঠি	৪৮
দ্বিতীয়। আল-আসওয়াদ আল-আনাসী এবং তুলাইহা	
আল-আসাদীর ফিতনার মূলোৎপাটন	৫৯
১। আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর নিহত হওয়ার ঘটনা ও	
মুরতাদদের ইয়েমেনে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন	৫৯
ক। রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে আসওয়াদ আল-আনাসী	৫৯
খ। আবু বকর রা. কর্তৃক ফাইরোজ দাইলামীকে	
সানআর শাসক নির্বাচন ও পত্র প্রেরণ	৬৪
গ। আবু বকর রা.-এর শত্রু দমন করার নীতি	৬৭
ঘ। ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের সৈন্যদল	৬৮
ঙ। হাযরামাউত এবং কিন্দার দিকে আল-মুহাজির ইবনে	
আবি উমাইয়ার বাহিনীর অগ্রযাত্রা	৭০

শিক্ষা ও উপদেশ

✓ ইয়েমেনের মহিলাগণ	৭৬
✓ হৃদয়গ্রাহী ভাষণসমূহ	৮০
✓ বুযুর্গদের কারামত	৮২

✓ আবু বকর রা.-এর ধৈর্য এবং বিনয়	৮৪
✓ ইকরিমা রা.-এর প্রতি আবু বকর রা.-এর উপদেশ	৮৭
✓ গভর্নরদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখা	৮৯
✓ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরবর্তীতে ইয়েমেনের অবস্থা	৯০

২। তুলাইহা আল-আসাদী	৯২
ক। বযাখার যুদ্ধ এবং বনু আসাদের ধ্বংস	৯৮
খ। আসাদ এবং গাভফান গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ	১০০
শিক্ষা ও উপদেশ	১০২

✓ আল্লাহর প্রতি আবু বকর রা.-এর বিশ্বস্ততা এবং তার অবিশ্বাস্য সামরিক পরিকল্পনা	১০২
✓ আদী ইবনে হাতিম রা.	১০৫
✓ তুলাইহার সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহ	১০৯
✓ বযাখার যুদ্ধের প্রভাব	১১০
✓ পূর্বে ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে আবু বকর রা.-এর আচরণ	১১৩
✓ ফাজ্জার ঘটনা	১১৪

৩। সাজাহ, বনু তামীম এবং মালিক ইবনে নুওয়াইরা	১১৫
শিক্ষা ও উপদেশ	১২০
✓ বনু তামীমের সকল সদস্যই মুরতাদ ছিল না	১২০
✓ খালিদ রা. এবং মালিক নুওয়াইরাকে হত্যা	১২১
✓ উম্মে তামীমের সঙ্গে খালিদ রা.-এর বিয়ে	১২৩
✓ সেনাপতিদের প্রতি আবু বকর রা.-এর নমনীয়তা	১২৭
✓ ওমান এবং বাহরাইনে ধর্মত্যাগীদের তৎপরতা	১৩১
✓ বাহরাইনে মুরতাদদের তৎপরতা	১৩৪
✓ আলা ইবনে হায়রামী রা.-এর কারামত	১৩৭
✓ মুরতাদদের পরাজয়	১৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

মুসাইলামা আল-কায্যাব এবং বনু হানীফা গোত্র	১৪০
প্রথম। অতীত জীবন	১৪৩
✓ বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের ইয়ামামা প্রত্যাবর্তন	১৪৫
✓ রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট মুসাইলামার পত্র	১৪৭
✓ হাবীব ইবনে যার্মদ আল-আনসারী রা.-এর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান	১৪৮
✓ রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়া হানাকী	১৪৯
দ্বিতীয়। বনু হানীফা গোত্রের মুসলমানগণ	১৫০

তৃতীয়। সৈন্যবহর নিয়ে খালিদ রা.-এর ইয়ামামার দিকে	১৫৪
✓ মুজাজ্জা ইবনে মিরারাহ হানাতীকে বন্দী	১৫৬
✓ মূল যুদ্ধের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ	১৫৯
চতুর্থ। যুদ্ধ শুরু	১৬৯
পঞ্চম। দুর্লভ সাহসিকতা	১৬৪
১। বারা ইবনে মালিক রা.	১৬৪
২। মুসাইলামা কায্যাবের মৃত্যু	১৬৪
৩। আবু আকিল : আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ রা.	১৬৬
৪। নাসিবাহ বিনতে কা'ব রা.	১৬৭
ছয়। ইয়ামামার যুদ্ধে কয়েকজন শহীদের বিবরণ	১৬৮
১। সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শিমাস রা.	১৬৮
২। য়ায়েদ ইবনে খাত্তাব রা.	১৬৯
৩। মা'আন ইবনে আদী আল-বালওয়ালী রা.	১৭০
৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর রা.	১৭১
৫। আবু দুজানা সিমাক খারিসাহ রা.	১৭২
৬। আব্বাদ ইবনে বিশর ইবনে ওয়াকাল রা.	১৭২
সাত। মুজাজ্জার প্রতারণা	১৭৬
আট। খালিদ রা.-কে হত্যার চেষ্টা	১৮৪
নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদ সংকলন প্রসঙ্গে	১৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ	১৯২
প্রথম। মজবুত এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ার প্রাথমিক শর্তাবলি	১৯২
১। বিজয় অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা	১৯৪
২। ইসলামীক আইন প্রয়োগের সুফল	১৯৬
৩। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের আখলাক	১৯৮
দ্বিতীয়। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে সামাজিক অবস্থা	২০২
তৃতীয়। কীভাবে আবু বকর রা. বহিঃশত্রুদের অযাচিত	
হস্তক্ষেপ প্রতিহত করেছিলেন	২০৬
চতুর্থ। মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিছু প্রাপ্তি	২১১
১। সব বাতিল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে ইসলাম	
স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়	২১১
২। একদল বিশিষ্ট মুসলমানদের শক্তিশালী অবস্থান	
এবং সুরক্ষিত স্বদেশের গুরুত্ব	২১৪
৩। নতুন মুজাহিদ নিয়োগের প্রকৃতি	২১৬
৪। মুরতাদদের ব্যাপারে ইসলামী আইন	২১৬

আবু বকর রা. এর বিজয়, তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উমর
রা.-কে নির্বাচন এবং আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল

ভূমিকা	২২০
প্রথম অধ্যায়	
ইরাক বিজয়	২২৪
প্রথম। আবু বকর রা. কর্তৃক ইরাক বিজয়ের পথ সূচনা	২২৪
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ	২২৮
দ্বিতীয়। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর ইরাক অভিযান	২৩৪
✓ যাজ আস-সালাসিল অভিযান	২৩৫
✓ মাযার বা সানীর যুদ্ধ	২৩৯
✓ ওয়ালজাহর যুদ্ধ	২৪১
✓ আললীসের যুদ্ধ	২৪৪
✓ হীরার যুদ্ধ	২৪৭
✓ আঘার বিজয়	২৫৮
✓ আইনুস্তামার	২৫৯
✓ দাওমাতুল জান্দাল	২৬২
✓ হুসাইদের যুদ্ধ	২৬৬
✓ মুসাইয়্যাখের যুদ্ধ	২৬৮
✓ ফিরাযের যুদ্ধ	২৬৯
তৃতীয়। খালিদ রা.-এর হজ্জ; আবু বকর রা. কর্তৃক তাকে শামে যাওয়ার আদেশপ্রদান এবং ইরাকে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মুসান্না রা.-কে নিয়োগ	২৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু বকর রাযিরাজ্যে আনহুর শামদেশ বিজয়	২৭৫
প্রথম। রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পথ উন্মোচন	২৭৯
দ্বিতীয়। উপদেষ্টাদের সঙ্গে আবু বকর রা.-এর পরামর্শ এবং তারপর ইয়েমেনবাসীকে যুদ্ধে যোগদানের আদেশ	২৮০
তৃতীয়। আবু বকর রা. কর্তৃক সেনাপতিদের হাতে	

যুদ্ধের পতাকা অর্পণ	২৯৪
চার। শামে সংকটের উৎপত্তি	৩০৯
পাঁচ। শাম অভিযুগে খালিদ রা.-কে প্রেরণ	৩২১
১। আজনাদাইনের যুদ্ধ	৩২৯
২। ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৩৩২

তৃতীয় অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ	৩৫৫
প্রথম। আবু বকর রা.-এর পররাষ্ট্রনীতি	৩৫৫
১। বিদেশি নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টি	৩৫৫
২। রাসূল সা.-এর অনুকরণে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধিকরণ	৩৫৭
৩। বিজিত এলাকায় ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার জনগণের প্রতি সদাচরণ	৩৫৯
৪। বিজিত এলাকায় লোকজনকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান	৩৬১
দ্বিতীয়। আবু বকর রা.-এর সামরিক কৌশলের বিবরণ	৩৬৩
১। শত্রুর ভূখণ্ডের একটি শহর একবারে দখল করা	৩৬৩
২। মুসলিম সৈন্য সংগ্রহ	৩৬৬
৩। যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ	৩৬৭
৪। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জায়গায় সৈন্য প্রেরণ	৩৬৮
৫। সেনাপতি পরিবর্তন	৩৬৯
৬। সেনাপতিদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন	৩৭০
তিন। আবু বকর রা.-এর বক্তব্য এবং উপদেশে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব এবং সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যের অধিকারসমূহ	৩৭২
১। আল্লাহ তা'আলার প্রতি দায়িত্বসমূহ	৩৭৩
২। সেনাপতির অধিকারসমূহ	৩৭৪
৩। সৈন্যদের অধিকারসমূহ	৩৮১
চার। মুসলমানগণ কীভাবে রোমান ও পারস্যদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন	৩৯০

চতুর্থ অধ্যায়

আবু বকর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগ এবং আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল	৩৯৪
প্রথম। আবু বকর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নিয়োগ	৩৯৪
দ্বিতীয়। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল	৪০২

সারসংক্ষেপ



দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা.-এর যুদ্ধ

**প্রথম। রিদ্দাহর পারিভাষিক অর্থ এবং কতিপয় আয়াত
যেগুলো এর বিরুদ্ধে কঠিনভাবে সতর্ক করেছে**

১। রিদ্দাহর সংজ্ঞা

আবুআমা মুহিউদ্দীন নববী রহ. ‘রিদ্দাহ’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ‘রিদ্দাহ অর্থ ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তা নিয়ত করেই হোক কিংবা কোনো কাজ বা কোনো কুফুরী উক্তি করে হোক এবং তা বিশ্বাস করে উচ্চারণ করুক কিংবা গোঁড়ামির স্বীকার হয়ে বা ঠাট্টা করে বলুক। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে অস্বীকার করল অথবা রাসূলগণকে অথবা কোনো একজন রাসূলকে অস্বীকার করল অথবা সর্বসম্মতভাবে হারাম যেমন : ব্যভিচার ইত্যাদিকে হালাল সাব্যস্ত করল অথবা এর উল্টো অর্থাৎ সর্বসম্মতভাবে হালাল কোনো কিছুকে হারাম সাব্যস্ত করল, অথবা সর্বসম্মত ওয়াজিবকে অস্বীকার করল অথবা কুফুরীর ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো, কিংবা এ ব্যাপারে সন্দেহের শিকার হলো তাহলে সে কুফুরী করল, অর্থাৎ সে ইসলাম ত্যাগকারী বলে গণ্য হবে।’

‘রিদ্দাহ’-এর ব্যাখ্যায় উলাইশ আল মালেকী রহ. বলেন, ‘কোনো মুসলমানের সুস্পষ্ট শব্দে কুফুরী করা অথবা এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা কুফুরীকে আবশ্যিক করে কিংবা এমন কর্ম যা কুফুরী শামিল করে।’^১ ইবনে হাযম জাহেরী মুরতাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, ‘মুরতাদ হলো এমন ব্যক্তি যে সব ধর্ম ছেড়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। অতঃপর তার

^১ মুহাম্মাদ যুহরী গাসরাভী, শরাহ আল মাতন আল-মিনহাজ, (পৃ. ৫১৯)।

^২ আহকামুল মুরতাদ, আস-সামুরাদি (পৃ. ৪৪)।

থেকে ইসলাম ত্যাগ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং সে অন্য কিতাবী ধর্ম বা ভিন্ন কোনো ধর্ম অথবা ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতাকে বেছে নেয়।”^৩

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ ‘রিদ্বাহ’ শব্দের ধর্মীয় বা নীতিগত ব্যাখ্যা। আরবীতে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে উসমান হান্বলী বলেন, ‘রিদ্বাহ’ মানে প্রত্যাবর্তন করা বা পশ্চাতে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰی اَدْبَارِكُمْ

আর তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে এসো না।^৪

শরীয়তের দৃষ্টিতে রিদ্বাহ বলা হয়, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর কুফর আবশ্যক করে এমন কাজে লিপ্ত হয়।^৫ তার সংজ্ঞার ব্যাখ্যা এই যে, মুরতাদ হলো সেই ব্যক্তি যে নিশ্চিত বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত দীনের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে। যেমন : সালাত, যাকাত, নবুওয়াত ইত্যাদি, অথবা এমন উক্তি বা কর্মসম্পাদন করল কুফুরী ছাড়া যার কোনো দ্বিতীয় ব্যাখ্যা নেই।^৬

২। কতিপয় আয়াত বা মুরতাদ প্রসঙ্গে দিক নির্দেশনা প্রদান করে

আল্লাহ তা’আলা ইসলামধর্ম ত্যাগকারীদের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা তাদের ধ্বংসাত্মক পশ্চাতে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন শব্দ এসেছে, ‘পশ্চাতে ফিরে যায়’, ‘ক্ষতির পথে গমন করে’, ‘চেহারা মিটিয়ে দেওয়া’, ‘মুখের মধ্যে হাত মারা’, ‘সন্দেহের মধ্যে মুরপাক খাওয়া’, ‘চেহারা কালো হওয়া’ ইত্যাদি। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَطِيْعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

^৩ আল-মহল্লী (১১/১৮৮), আল-মুনীরিয়া প্রকাশনা, ১৩৫২ হি.।

^৪ সূরা আল-মায়দা, ৫:২১।

^৫ আহকামুল মুরতাদ, আস-সামুরাসি (পৃ. ৪৪)।

^৬ হারাকাতুল রিদ্বাহ, ড. আলী আল-আত্হম (পৃ. ১৮)।

হে বিশ্বাসীগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তারা তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।^১

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِنَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ
أَن نُّطِيسَ وَجُوهًا فَتَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে যে কিতাব পূর্ব থেকে আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা (কুরআন) এবার অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমরা ঈমান আন, এর আগে যে আমি কতক চেহারাকে মিটিয়ে দিয়ে সেগুলোকে পশ্চাদেশ্বরূপ বানিয়ে দেব। অথবা শনিবারওয়ালাদের উপর যেমন লানত করেছিলাম তাদের উপর তেমন লানত করব। আল্লাহর আদেশ সর্বদা কার্যকরই হয়ে থাকে।^২

তাকসীরে ইবনে কাসীর গ্রন্থে **أَن نُّطِيسَ** শব্দের ব্যাখ্যা অঙ্কিত করা হয়েছে। আর **فَتَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا** শব্দের তাকসীর লেখা হয়েছে, ‘তাদের জন্য আমি পশ্চাতে দু-টি অতিরিক্ত চোখ করে দেব।’ আর এটা শাস্তির ক্ষেত্রে মারাত্মক। তাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া ও বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়া এবং সুস্পষ্ট সত্য প্রমাণাদি থেকে গুমরাহীর পথে তাড়িত হওয়াকে একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, তারা পেছন দিকে ও গম্ব্য থেকে পশ্চাতে গমন করছে।^৩

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

^১ সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪৯।

^২ সূরা আন-নিসা, ৪:৪৭।

^৩ তাকসীরে ইবনে কাসীর।

সেই দিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হয়ে যাবে, যাদের মুখগুলো কালো হয়ে যাবে, তাদের বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছিলে? সুতরাং তোমরা এ শাস্তি আবাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করত।^{১০}

তাকসীরে কুরতুবী কিতাবে ইমাম কুরতুবী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে আয়াতটি মুরতাদপ্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়, আয়াতটি মুরতাদদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। হাদীসটি এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমার সাথীদের একটি দল কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে আগমন করতে চাইবে। কিন্তু তাদের হাউজ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, ‘হে আমার রব! এরা আমার সাথী।’ তিনি বলবেন, ‘আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পর তারা কী ঘটিয়েছে। তারা তো পশ্চাতে ফিরে গেছে।’^{১১}

এ হাদীসের আরেকটি সূত্র এমন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাদের ডান দিক থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব, তারা আমার সাথী (কেন তাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ) তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার (মৃত্যুর) পর তারা কত কিছু নতুন আবিষ্কার করেছে। সুতরাং আমি বলব যেমন আল্লাহর নেক বান্দা (ইসা) বলেছেন, ‘আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, সাক্ষী ছিলাম তাদের কর্মকাণ্ডের, আর যখন আমাকে আপনি তুলে নিলেন তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন।’ (সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ১১৭) তখন বলা হবে, ‘নিশ্চয়ই আপনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তারা পশ্চাতে ফিরে গেছে (মানে মুরতাদ হয়ে গেছে)।’^{১২}

^{১০} সূরা আল-ইমরান, ৩:১০৬।

^{১১} তাকসীরে কুরতুবী (৪/১৬৬)।

^{১২} আল-খাসাইসুল কুবরা, আব্বায়া সুয়ুতী (২/৪৫৬)।

দ্বিতীয় । ধর্মত্যাগের কারণসমূহ ও প্রকারভেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর আরব বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ধর্মত্যাগের যে ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর কারণগুলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালে মানসিক কষ্ট, দীনের ক্ষেত্রে শিথিলতা, কুরআন-হাদীসের মর্ম অনুধাবনে বিচ্যুতি, জাহিলিয়াতের প্রতি অনুরাগ, জাহিলিয়াতের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রতি নৈকট্য, নীতি-নৈতিকতা থেকে দূরত্ব, শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি বিদ্রোহ, অতীতের গোঁড়ামি, ক্ষমতার মোহ, ধর্মের মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন, মালের প্রতি লোভ-লালসা, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যান্য প্রভাববিস্তারকারী বিষয় যথা : ইয়াহুদী, নাসারা ও মাজুসীদের তৎপরতা ইত্যাদি।^{১৩}

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ধর্মত্যাগের প্রকারভেদ

মুরতাদদের মধ্যে একটি দল ছিল যারা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ত্যাগ করে করেছিল। তারা মূর্তিপূজার দিকে ফিরে গিয়েছিল। কেউ কেউ নবুওয়াতের দাবি করেছিল। কেউ কেউ সালাত বর্জন করার আহবান জানিয়েছিল। কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে জানত, সালাত আদায় করত, কিন্তু যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। আবার কতিপয় এমন ছিল যারা রাসূলের মৃত্যুতে খুশি প্রকাশ করেছিল। তাদের তৎপরতা জাহেলী যুগের কর্মতৎপরতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কেউ কেউ তো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিল। তারা অপেক্ষা করছিল কারা পরাজিত হয় সেটা দেখার। (পরে তারা জয়ীদের দলে যোগ দেবে)। প্রত্যেকটি দল সম্পর্কে ফিকহ ও ইতিহাসবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।^{১৪}

^{১৩} হারাকাতুর রিদ্দাহ (পৃ. ১১০-১৩৭)।

^{১৪} হারাকাতুর রিদ্দাহ (পৃ. ২০)।

খাস্তাবী রহ. বলেন, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীরা দু-দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল ছিল, যারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল, দীন-মিল্লাতকে বর্জন করেছিল এবং কুফরের দিকে ফিরে গিয়েছিল। এ দলটির দুটি শাখা ছিল :

এক। বনু হানীফা ও অন্যান্য গোত্রের অধিবাসী যারা মুসাইলামার নবুওয়াতের দাবিকে বিশ্বাস করেছিল। আর ইয়েমেন ও অন্যান্য এলাকার লোক যারা আল আসওয়াদ আল আনাসীর অনুসারী। এ দলটি স্পষ্টত আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন অস্বীকারকারী এবং শুণ নবুওয়াতের দাবিদার।

দুই। যারা ইসলামধর্ম ত্যাগ করেছিল এবং শরীয়ত অস্বীকার করেছিল। তারা সালাত, যাকাত ও অন্যান্য দীনের বিষয়াদি বর্জন করেছিল। তারা জাহেলী যুগে যে ধর্মমতের উপর ছিল, সেখানে ফিরে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দল ছিল, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছিল। সালাতকে স্বীকার ও যাকাতের অনিবার্য হওয়াকে অস্বীকার করেছিল। তারা যাকাত ইমামের কাছে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব হওয়াকে অমান্য করেছিল।^{১৫} এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা ও যারা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করেছিল। তারা ঠিক যাকাত দিতে অস্বীকার করেনি, কিন্তু তাদের নেতারা তাদের বাধা দিয়েছিল। আর তারা নেতাদের কথায় হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

খাস্তাবী রহ. এর ব্যাখ্যা ও প্রকারভেদের মতোই কাযী ইয়ায রহ. ধর্মত্যাগীদের বিভক্ত করেছিলেন। তবে তার মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পর তিন ধরনের ধর্মত্যাগী ছিল। প্রথম দল পূর্ববর্তী ধর্ম মূর্তিপূজার দিকে ফিরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দল ছিল মুসাইলামা, আসওয়াদ আনাসী ও অন্য কোনো শুণ নবীর অনুসারীরা। আর তৃতীয় দল ইসলামের মধ্যে থেকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল যাকাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানার সাথে সম্পর্কিত।^{১৬}

^{১৫} মুসলিম শরীফ-এর ভাষ্যগ্রন্থ, আদ্বাযা নববী (পৃ. ২০৩)।

^{১৬} প্রাপ্ত।

ড. আব্দুর রহমান ইবন সালেহ আল মাহমুদের মতে ধর্মত্যাগীরা চার দলে বিভক্ত ছিল। এক. পূর্ববর্তী ধর্ম—প্রতিমাপূজার দিকে প্রভাববর্তনকারী। দুই. মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের অনুসারী সম্প্রদায়। তখন যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছিল তন্মধ্যে অন্যতম হলো মুসাইলামা, আল আসওয়াদ আল আনাসী ও সাজাহ। তিন. যারা যাকাত আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করেছিল। চার. যারা যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেনি বটে তবে তারা আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর কাছে তা পৌছাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।^{১৭}

তৃতীয়। নবুওয়াতের শেষ সময়ে ধর্মত্যাগের ঘটনা

হিজরী নবম সন যাকে প্রতিনিধিদলের (আগমনের) বছর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সে বছরই ধর্ম ত্যাগের ঘটনা শুরু হয়। এটা সেই বছর যাতে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগমন করা লোকেরা তাদের নেতৃত্বের লাগামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সোপর্দ করেছিল। এ সময়ে ধর্মত্যাগের ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এভাবে চলতে চলতে দশম হিজরী তার প্রান্তসীমায় উপনীত হয়, যা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজের বছর। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ সম্পাদন করেন এবং যে রোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন তারও সূচনা হয়। এ খবর লোকজনের মাঝে প্রচার হয়। তখন বালুর নিচ হতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জ্বলজ্বল করে উঁকি দেয়। বিষাক্ত সাপগুলো তার গর্ত থেকে মাথা বের করে। যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বিদ্রোহ করার দুঃসাহস দেখায়। আসওয়াদ আল আনাসী ইয়ামানে, মুসাইলামা আল কাযযাব ইয়ামামা এলাকায়, তুলাইহা আল আসাদী তার সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

যখন ইসলামের বিরুদ্ধে মুসাইলামা ও আসওয়াদ আল আনাসী আগ্রাসী তৎপরতা পরিচালনা করে। আর তাদের দু-জনেই দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, তারা ধর্মত্যাগের পক্ষে অগ্রসর হতে থাকবে। ইসলামের দিকে ফিরে

^{১৭} আল-বুখারি বি-গাইরি মা-জানযাল্লাহু, ড. আব্দুর রহমান আল-মাহমুদ (পৃ. ২৩৯)।

আসার তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তারা বরং শক্তিশালী মাধ্যম ও তাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাদের বিষয়ে এমন স্বপ্ন দেখান যা দ্বারা তার চোখ শীতল হয়। আর এর ফলে তাঁর পরে তাঁর উন্মত্তের চোখ শীতল হবে।

তিনি মিসরে উঠে লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ইরশাদ করেন, ‘হে লোকসকল! স্বপ্নে আমি লাইলাতুল কদর দেখেছিলাম কিন্তু পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমি এও স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার দু-হাতে স্বর্গের দু-টি চুড়ি। তা দেখে আমি অপছন্দ করলাম এবং ফুৎকার দিলাম। ফলে এগুলো উড়ে গেল। আমি চুড়ি দু-টির ব্যাখ্যা বলব এ হলো এ দু-জন চরম মিথ্যাবাদী। ইয়েমেনের লোকটি ও ইয়ামামার লোকটি।’^{১৮}

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চুড়ি দু-টিকে ফুৎকার দেওয়ার অর্থ হলো তারা দু-জন তার ফুঁতে নিহত হবে। কেননা, তিনি সরাসরি তাদের সাথে যুদ্ধ করেননি। তাদের স্বর্গের বিশেষণে বিশেষায়িত করার অর্থ হলো তারা মিথ্যাবাদী। কেননা, তাদের অবস্থা ছিল চাকচিক্য ও আড়ম্বরতা। যেমন : চুড়িরূপে ব্যবহার করার দ্বারা তাদের বাদশাহ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, চুড়ি বাদশাহরাই পরে। আর তারা হাত দু-টিকে বেঁটন করে আছে এর দ্বারা তাদের ঘটনা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক হবে এটা বোঝায়। কেননা, চুড়ি হাতের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে।^{১৯}

ড. আলী আল-আতুম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ফুৎকার দ্বারা তাদের উড়ে যাওয়ার অর্থ হলো ভয়ংকর আকারে হলেও তাদের ষড়যন্ত্র দুর্বল। তাদের বিষয়টা হলো বুঁদবুঁদের মতো। যা অচিরেই মিলিয়ে যাবে। শয়তান দ্বারা তাদের ষড়যন্ত্র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে বটে তবে একসময় তা নিঃশেষ হবে। তাদের স্বর্গ হওয়ার অর্থ হলো তাদের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব উপার্জন ও অর্জন। কেননা, স্বর্গ প্রতারণিত পার্থিব চাকচিক্য ও জাঁকজমক

^{১৮} বুখারী (৩৬২১); মুসলিম (২৭৭৩)।

^{১৯} হারাকাতুর রিক্বাহ (পৃ. ৬৬)।

বোঝায়। যে স্বর্গের পেছনে লোকেরা দৌড়ে থাকে। তাদের চুড়িসদৃশ রূপে উপস্থাপন করার দ্বারা মুসলমানদের শেকলে আবদ্ধ করে চতুর্মুখী চাপের মধ্যে ধ্বংস করার প্রয়াসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন চুড়ি কবজির উপরাংশকে ঘিরে রাখে।

চতুর্থ। ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে আবু বকর রা.-এর অবস্থান

ধর্মত্যাগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের জমা করে ভাষণ দেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। তারপর বলেন, ‘সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, পরিপূর্ণ নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম বিদূরিত হয়েছে, ইসলাম অপরিচিত ও বর্জিত হতে চলেছে। ইসলামের রশি পুরোনো হয়ে গেছে, তার যুগ প্রাচীন হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানগণ ইসলামের পথ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আহলে কিতাবের উপর অসন্তুষ্ট তাই তাদের কল্যাণ দান করেন না, যদিও তাদের কাছে কল্যাণের বস্তু রয়েছে। আর তাদের নিকট অকল্যাণের বস্তু থাকার কারণে তাদের থেকে কোনো অকল্যাণও দূর করেন না। তারা তাদের কিতাবের মধ্যে পরিবর্তনসাধন করেছে এবং যা তার মধ্যে নেই তা তাতে সংযুক্ত করেছে। আরবরা নিরাপদ ছিল। তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহর শক্তির আওতায় রয়েছে। তারা না তার ইবাদত করত, না তার কাছে প্রার্থনা জানাত। তাই তিনি তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেন এবং ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী বানান। কঠিন পাথুরে ভূমিতে তাদের রাখেন, সেখানে (প্রয়োজনীয়) বৃষ্টিপাত হতো না। অতঃপর তাদের মাঝে শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তাদের শ্রেষ্ঠ উন্নত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেন। অন্যদের উপর তাদের জয়ী হতে সাহায্য করেন। একপর্যায়ে তাদের নবীকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর শয়তান তাদের সেই বাহনে আরোহণ করায় যে বাহন থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শয়তান তাদের হাত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ②

মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে অনেক রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন তোমরা কি পেছন ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে (পূর্ববর্তী দ্বীনে) ফিরে গিয়েছে সে কিছুতেই আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।^{২০}

(হে শ্রোতামণ্ডলী!) তোমাদের চারপাশে আরব বেদুইনরা যাকাতের উট-বকরি দিতে অস্বীকার করছে। তারা তাদের দ্বীনের উপর অবিচল থাকেনি। যদি তারা এ দিকে ফিরে আসে, আজই আমি তাদের থেকে এগুলো উত্তোলন করব। বর্তমানে তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের থেকে শক্তিশালী নয়। তোমাদের নবীর বরকত অতীত হয়ে গেছে। তিনি তোমাদের সেই নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করে গেছেন যিনি তাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়ে সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং নিঃস্ব-অসহায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেছেন।

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের পাড়ে। অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।^{২১}

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহর নির্দেশমতো লড়াই করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ তার ওয়াদাকে পূর্ণ করেছেন, তার প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্য বাস্তবায়ন করেছেন। এ লড়াইয়ে আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শহীদ হবে সে জান্নাত লাভ করবে, আর যারা বেঁচে থাকবে তারা তার এ জমীনে তারই খলীফা হিসেবে বেঁচে থাকবে। মনে রাখবে,

^{২০} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪৪।

^{২১} সূরা আল-ইমরান, ৩:১০৩।

আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্ত এবং তার কথার কোনো ব্যতিক্রম হয় না।
তিনি বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٢﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ
তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে
শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান
করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন
তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং
তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের শান্তি দান করবেন।
তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক
করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।^{২২}

কতিপয় সাহাবী (এর মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুও
ছিলেন) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিলেন যে, যাকাত
অস্বীকারকারীদের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলুন এবং তাদের সাথে সন্তাব বজায়
রাখুন। যখন তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে যাবে তখন তারাই যাকাত
নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ
পরামর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকাল হয় এবং আবু বকর
রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খলীফা নিযুক্ত হন, তখন আরবদের একটি দল
কাফির হয়ে যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে
বললেন, ‘আপনি এসব লোকদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, অথচ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমাকে যুদ্ধ করার
অনুমতি দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ লোক এক আল্লাহ ও তার রাসূল
মুহাম্মাদকে মেনে নেওয়ার সাক্ষ্য না দেবে; কিন্তু যখন এ কথার সাক্ষ্য

দেবে তখন তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। অবশ্য কালেমার হক এর ব্যতিক্রম। তার হিসাব আল্লাহর কাছে।”^{২৩} তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম! এসব লোক যদি এমন একটি বকরির বাচ্চা কিংবা ভিন্ন বর্ণনামতে পশু বাঁধার রশি দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যাকাত হিসেবে প্রদান করত, তবু আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। যাকাত হলো মালের হক। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম! এ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সিদ্ধান্ত। যায় মাধ্যমে আল্লাহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়কে উন্মোচিত করেছেন। আমি বুঝে নিলাম যে, এটাই সত্য ও হক সিদ্ধান্ত।’^{২৪}

অতঃপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! মুরতাদদের সাথে লড়াই ও যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান সমস্ত উম্মতের ঈমানকে মূলে ফিরিয়ে এনেছে।’^{২৫}

যে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিতর্ক করছিলেন, উক্ত হাদীসের মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ঐ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসআলাটি স্পষ্ট করে দেন। তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি বাক্য যা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পক্ষে দলিলরূপে উপস্থাপন করেছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখিয়েছেন যে, এ বাক্যটিই যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দলিল। এমনকি সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য হওয়ার সাক্ষীও দেয়। সেই বাক্যটি হলো,

فَإِذَا قَالُوا هَا عَصَوْا مِثِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

যখন তারা তা বলবে, তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা।

^{২৩} বুখারী (১৪০০)।

^{২৪} বুখারী (৬৯২৪); মুসলিম (২০)।

^{২৫} বুরুব আর-রিদাহ, মুহাম্মাদ আহমাদ বাসমিল (পৃ. ২৪)।

তবে কালিমার কোনো হকের কারণে কার্যত মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত ইলহামে প্রাপ্ত ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ মেজাজ ছিল সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি। এ অবস্থান ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত ভুল বলে গণ্য হতো। তা অপরিণামদর্শী পরাজয় ও জাহিলিয়াতের প্রতি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হতো। আল্লাহ তা করতে দেননি (আলহামদুলিল্লাহ)।

অতঃপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এরূপ মূল উৎপাটনকারী সিদ্ধান্ত ইতিহাসের পটভূমি পাল্টে দিয়েছিল; ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিরই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সময়ের বিষাক্ত বিচ্ছুগুলো পেছনে সরে গিয়েছিল, ফাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী জাহিলিয়াত লেজ গুটাতে বাধ্য হয়েছিল।^{২৬}

ইসলামের ব্যাপারে তার চরম আত্মমর্যাদাবোধ, দূরদর্শিতা ও নবীষুগে যে মত ও পথের উপর ছিলেন—তার উপর অবিচলতা ঐ বাক্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল যে বাক্যটি তার মুখ প্রকাশ করেছিল এবং তার অন্তর ব্যক্ত করেছিল এবং যে বাক্যটি ছিল এক অলংকারপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা ও বৃহৎ কলেবরে গ্রন্থের সমান; যখন আরব বেদুইনদের অনেকগুলো গোত্র বাইতুল মালে তাদের যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কিংবা যাকাতকে অস্বীকার এবং এর ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, তখন দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘ওহী বন্ধ হয়েছে। আর দীন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গেছে। (এখন এতে) সংকোচন করা হবে, আর আমি বেঁচে থাকব? (অর্থাৎ আমার জীবনের সর্বশক্তি ব্যয় করে ইসলামের মধ্যে বিচ্যুতির আগমনকে প্রতিহত করব।)’^{২৭}

অন্য বর্ণনায় রয়েছে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! লোকদের সাথে সহমর্মিতার আচরণ করুন এবং সদয় হোন।’ তিনি আমাকে বললেন, ‘জাহেলী যুগের প্রতাপশালী কি

^{২৬} আশ-শরাহ বাইনাল-আসালাহ ওয়াল-মুআসিরাহ (পৃ. ৮৬)।

^{২৭} আল-মুরতাযা, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (পৃ. ৭০)।

ইসলামে এসে কাপুরুষ হয়ে গেল? ওহী বন্ধ হয়েছে, দীন পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এখন এতে সংকোচন হবে, আর আমি জীবিত থাকব।^{২৮}

ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিককে মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তিনি তাদের চিন্তাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে শোনার পরই যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। তবে তিনি ছিলেন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং লক্ষ্যভেদী ফায়সালাদানকারী।

তার সামনে সঠিক বিষয়টি প্রতিভাত হওয়ার পর তিনি মুহূর্তকাল ক্ষেপণ করেননি। কোনো বিষয় দোদুল্যমানতার কাছে না যাওয়া ছিল তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম। এ মহান খলীফা তাঁর পুরো জীবনেই এর মূর্তপ্রতীক ছিলেন। মুসলমানরা তার এ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে নির্ভার ছিলেন।^{২৯}

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি ও সঠিক প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি সাহাবীদের সকলের হৃদয়কে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চারপাশে যারা ছিলেন তাদের চেয়ে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কেননা, তিনি তার ঈমান যা সকলের ঈমানের চেয়ে মজবুত ছিল, যা দ্বারা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্যদান এর থেকে যাকাত আলাদা কিছু নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একত্ববাদের স্বীকৃতি দেবে সে এ কথারও স্বীকৃতি দেবে যে, আল্লাহ তার মালের ক্ষেত্রে যা ফরয করেছেন, তা প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য। আর মাল তো মূলে আল্লাহরই। আর সামাজিক জীবনে যাকাত ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর কোনো ওজন নেই। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে,

^{২৮} মিশকাত আল-মাসাবীহ (৬০৩৪)।

^{২৯} আল-বদর ওয়াত-তারিখ, আল-মাকদাসী (৫/১৫৩)।

পরিপূর্ণভাবে যাকাত আদায় না করার ক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার বিধিবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন পরিপূর্ণভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু না বলার ক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার বৈধ হয়। এটা ওটার মতোই। এটাই ইসলাম। যাকাত ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইসলাম নয়। আল্লাহ তা'আলা যারা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করে আর কিছু অংশকে বিশ্বাস করে না, তাদের চরমভাবে সতর্ক করেছেন,

أَفْتَوْمُنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস কর আর কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনোই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।^{৩০}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থানের মধ্যে নশ্তার অবকাশ ছিল না। ছিল না দর কষাকষির সুযোগ। সেই অবস্থান থেকে নিচে নামার কোনো লক্ষণ ছিল না। তার অবস্থান ছিল ইলহামী। এ দ্বীনের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পর তাঁর অনেক বড় অবদান। দ্বীনকে পরিশুদ্ধকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ ও আমূল ধরে রাখায় তার পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী। এ বিষয়ের স্বীকৃতি সকলেই দিয়েছেন। ইতিহাস আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সীমালঙ্ঘনকারী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইসলামের রশি এক এক করে ছিঁড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রকে প্রতিহতকরণকে নবী-রাসূল কর্তৃক তাদের যুগের ফিতনা মোকাবেলার সাথে তুলনা করেছে। তার কাছে যে দায়িত্ব এসেছিল তা ছিল নবুওয়াতের স্থলবর্তিতার দায়িত্ব। তিনি এর হক সঠিকভাবে আদায় করেছেন। এ দায়িত্ব সুচারুরূপে আজাম দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তাদের দুআ তার পাথেয় হয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাকে পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের তার অধীন করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম। মদীনা রক্ষায় আবু বকর রা.-এর পরিকল্পনা

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী গোত্রগুলোর প্রতিনিধিদল খলীফার দৃঢ় সংকল্প ও অনমনীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ করে মদীনা থেকে বের হয়ে গেল। তারা দু-টি বার্তা নিয়ে গেল। প্রথমত, যেহেতু যাকাতের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট, এজন্য এটা আশা করার কোনো কারণ ছিল না যে, মুসলমানদের খলীফা এ ব্যাপারে আপস কিংবা তাদের সঙ্গে কোনো সন্ধিচুক্তি করবেন, বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানরা খলীফার দৃঢ় অবস্থান দেখে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খলীফার অনুগত থেকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া অথবা তাদের দুর্বল প্রতিপন্ন করতে পারাটা জরুরি ছিল। কারণ, উসামার অভিযানের কারণে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমনিতে কম ছিল। এ সুযোগে সর্বশক্তি দিয়ে মদীনা আক্রমণ করে খেলাফত ধ্বংস করে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ লোকগুলোর চেহারা দেখে তাদের মধ্যে যে মুনাফিকী মনোভাব ছিল তা বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের নীচতা ও কুমতলব ধরে ফেললেন। তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘পৃথিবী কুফরীতে ছেয়ে গেছে। তাদের প্রতিনিধিদল তোমাদের সংখ্যাস্বল্পতা দেখে গেছে। তোমরা জান না যে, তারা দিনের বেলা হামলা করবে, না কি রাত্রে। তোমাদের থেকে তাদের নিকটতম দূরত্ব ‘এক বারীদ’ (বার মাইল) মাত্র। তারা আশা করেছিল যে, আমরা তাদের প্রস্তাব মেনে নেব এবং তাদের অব্যাহতি দেব। কিন্তু আমরা তাদের প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করেছি। তাদের সাথে আমাদের নিরাপত্তাদানের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা নিজেরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং অন্যদের প্রস্তুত কর।’^{৩১}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন :

ক। মদীনাবাসীর জন্য মসজিদে নববীতে রাত্রিযাপন আবশ্যিক করে দেন। যাতে শত্রুর মোকাবেলায় সবচেয়ে উত্তম প্রস্তুতিতে থাকেন।

খ। মদীনা প্রবেশের পথ ও পাহাড়ি ঘাঁটিগুলোর মধ্যে মজবুত পাহারার ব্যবস্থা করেন। তাদের সেখানে রাত্রিযাপনের নির্দেশ দেন, যেন তারা যে কোনো অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

গ। তিনি মদীনার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আমীর হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করেন : আলী ইবন আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবাইর ইবন আল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{৩২}

ঘ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার আশেপাশে যেসব গোত্র ইসলামের উপর অবিচল ছিল তাদের কাছে দূত প্রেরণ করেন। গোত্রগুলো হলো : আসলাম, মুযাইনাহ, গিফার, আশজা, জুহাইনা, কা'ব প্রমুখ। তাদের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল তারা যেন ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তারা খলীফার ডাকে ব্যাপকভাবে সাড়া দিল। এমনকি তাদের আগমনে মদীনা ভরে গেল। খলীফার নিকট তাদের ঘোড়া ও উটগুলো জিহাদে ব্যবহার করার জন্য পেশ করল।^{৩৩}

এ সব গোত্রগুলোর লোকসংখ্যার আধিক্য ও সিদ্ধিকে আকবরের সাহায্যে তাদের ব্যাপক উপস্থিতি একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। শুধু জুহাইনা গোত্রের চারশত পুরুষ খলীফার দরবারে আগমন করে। তাদের সাথে তাদের সওয়ারি ও ঘোড়া ছিল। আমর ইবন মুররা জুহানী একশত উট মুসলমানদের সাহায্যে পেশ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন।^{৩৪}

ঙ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার আশপাশে অবস্থানরত ধর্মত্যাগীদের পাশাপাশি অনেক দূর অঞ্চলের ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। যদিও তারা মদীনার জন্য সরাসরি কিংবা মারাত্মক কোনো হুমকি ছিল না, তবে তারা সার্বিকভাবে পুরো আরব উপত্যকার জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু

^{৩২} প্রাগুক্ত।

^{৩৩} আস-সাবিতুন আল-ইসলাম আইরাম ফিতনাছুর-রিদাহ, ড. মাহদী রিয়কুদ্দাহ (পৃ. ২১)।

^{৩৪} প্রাগুক্ত।

আনহু জানতেন অদূর ভবিষ্যতে তাদের মোকাবেলা করতে হবে এবং তিনি তা দ্রুত মোকাবেলা করারই সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান গভর্নরদের উদ্দেশে চিঠি প্রেরণ করে এ লড়াইয়ের সূচনা করেন—ঠিক যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় তার গভর্নরদেরকে চিঠি দিয়ে স্ব স্ব অঞ্চলে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনবাসীর উদ্দেশে এ রকম একটি চিঠি লিখেছিলেন। ইয়েমেনে আসওয়াদ আল-আনাসীর সৈন্য ও ধর্মত্যাগীদের একটি বড় দল ছিল। চিঠির বক্তব্য ছিল এই যে, ‘অতঃপর ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে এবং তাদেরকে ঘিরে রেখেছে সেসব সন্তানদের সাহায্য কর। ফাইরোজের আনুগত্য কর। কেননা, আমি তার হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছি।’

ইয়েমেনে এ চিঠি বিরাট প্রভাব ফেলে। পারস্যের একদল মুসলিম যুবক ফাইরোজের নেতৃত্বে তাদের মুসলিম আরব ভাইদের সাহায্য করে। তাদের সম্মিলিত বাহিনী অতর্কিত আক্রমণে অবিশ্বাসী বিদ্রোহীদের দমন করে। একপর্যায়ে ধীরে ধীরে ইয়েমেনের পুরো অধিবাসী হকের পতাকাতলে সমবেত হয়ে যায়।^{৩৫}

চ। মদীনার মুসলমানদের কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাছাকাছি ধর্মত্যাগী দলসমূহ যেমন : বনু আবস এবং যুবয়ান গোত্রের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ করা অপরিহার্য মনে করলেন। এজন্য তিনি আগে শিশু ও নারীদের দূর্গে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে নারী ও শিশুদের মুরতাদদের বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে নিরাপদ রেখে মুসলমান পুরুষরা আসন্ন যুদ্ধে পূর্ণশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

ষষ্ঠ। মদীনা দখলে মুরতাদদের ব্যর্থ আক্রমণ

মুরতাদরা তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে বেশি দেরি করেনি। মুরতাদদের প্রতিনিধিদল মদীনা ত্যাগের তিন দিন পরই তারা মদীনা আক্রমণ করে বসে। এ আক্রমণে আসাদ, গাতফান, আবস, যুবয়ান এবং বকর গোত্রের

লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এসব গোত্র তাদের সামান্য কিছু যোদ্ধাকে প্রেরণ করে; বাকিরা 'যুহুসাই' নামক স্থানে পরবর্তীতে শক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত অবস্থান করে।

মদীনার সীমান্ত প্রহরীরা আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে খবর পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করে। তিনি তাদের খবর পাঠান যে, তারা যেখানে রয়েছে সেখানেই যেন অবস্থান করে। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে উপস্থিত সকলকে নিয়ে মদীনার সীমান্তের দিকে রওনা হন। সীমান্ত প্রহরীর সঙ্গে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। শত্রুরা সীমান্তে মুসলমানদের কোনো বাধা আশা করেনি। তারা যখন দেখল যে, মুসলমানদের বিশাল বাহিনী সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত, তখন তারা হতাশ হলো। সামান্য একটু যুদ্ধেই শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলো। মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহীরা তাদের পেছনে ধাওয়া করে যুহুসাই পর্যন্ত নিয়ে গেল। সেখানে যেহেতু আরও মুরতাদ সৈন্য অপেক্ষারত ছিল, তারা সম্পূর্ণ পরাজয় এড়ানোর জন্য মুসলমানদের বাহন উটগুলোর জন্য ফাঁদ তৈরি করে। ফলে উটগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তবে তা এত মারাত্মক ছিল না যাতে মুজাহিদরা ছিটকে পড়ে যায়। একটু পরেই উট স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং কোনো ধরনের ক্ষতি বা দুর্ঘটনা ছাড়াই মুসলমানরা মদীনায় ফিরে আসে।

বিদ্রোহীরা মুসলমানদের ব্যাপারে দুর্বলতার ধারণা করল। তারা যুল কিসসা বাহিনীর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠাল যে, মুসলমানরা এখন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের সহজেই পরাজিত করা সম্ভব। সুতরাং তারা এ সংবাদের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হলো। সেই মুহূর্তে তাদের জানা ছিল না আল্লাহর ফায়সালা সম্পর্কে, যায় ইচ্ছা তিনি করেছেন। তিনি চাইলেন তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই রাত্র প্রস্তুতির সাথে অতিবাহিত করলেন। তিনি নিজে ক্লান্ত হলেন এবং তাদের ক্লান্ত করলেন। তাঁর বাহিনীকে সাথে নিয়ে রাতের শেষভাগে রওয়ানা করলেন। সৈন্যদলের ডানপাশে নু'মান ইবন মুকরিন, বায়ে আব্দুল্লাহ ইবন মুকরিন এবং পেছনের অংশে ছিল সুআইদ ইবন মুকরিন। এভাবে চলতে চলতে সুবহে

সাদিকের আগেই সাহাবায়ে কেরাম ও শত্রুবাহিনী একই স্থানে মিলিত হলো। তারা মুসলিম বাহিনীর পদধ্বনি কিংবা কোনোরূপ আওয়াজই শুনতে পেল না। ফলে তারা তরবারিগুলো রেখে বিশ্রাম করছিল। মুসলমানরা অতর্কিত আক্রমণে তাদের নাজেহাল করে দিল।

সূর্য উকি দেওয়ার আগেই তারা ময়দান ছেড়ে পালাল। মুসলমানরা তাদের উপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করল। তুলাইহা আল-আসাদীর ভাই হিবাল নিহত হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ধাওয়া করে যুল কিসসা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এটা ছিল প্রথম বিজয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নু'মান ইবন মুকরিনকে কতিপয় সৈন্যসহ সেখানে রেখে মদীনায ফিরে এলেন। মুশরিকরা সেখানে চরমভাবে পরাস্ত হলো।

বনু যুবয়ান ও আব্‌স গোত্রের মুশরিকরা নিজেদের এলাকায় যে সব মুসলমানরা বসবাস করত তাদের উপর আক্রমণ করল। মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করল। অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও তাদের অনুসরণ করল। বনু যুবয়ান ও বনু আব্‌সের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শপথ করেন যে, মুশরিকদের প্রত্যেক গোত্র থেকে সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশি লোককে হত্যা করবেন।^{৩৬}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মুরতাদ নেতাদের কঠিন শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। তার এ অবস্থানের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমানের বসবাস ছিল, তারা দীনের উপর পূর্বের চেয়ে অধিক দৃঢ় হয়ে ওঠে। মুরতাদরা দিন দিন আরও বেশি মুসলমানদের হাতে অপমানজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রের যাকাত মদীনায আসতে শুরু করে। রাতের বেলা কয়েকটি গোত্রের যাকাত আসে—সাফওয়ান, যবরকান ও আদী গোত্রের যাকাত; রাতের প্রথম প্রহরে সাফওয়ান গোত্রের, মধ্যভাগে যবরকান গোত্রের আর শেষরাতে আদী গোত্রের।^{৩৭}

^{৩৬} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/৬৬)।

^{৩৭} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/৬৬)।

এক রাতেই আরব ছয়টি গোত্র তাদের যাকাতের মাল মদীনায়ে প্রেরণ করে। যখনই কেউ মদীনায়ে যাকাত-সংক্রান্ত সংবাদ নিয়ে পৌঁছত, লোকেরা বলাবলি করত যে, লোকটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘না, সে সুসংবাদদাতা।’ খোঁজ নিয়ে জানা যেত লোকটি তার গোত্রের যাকাতের মাল নিয়ে হাজির হয়েছে। তখন লোকেরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলত, ‘আপনি অনেকক্ষণ আমাদের কল্যাণের সুসংবাদ দিচ্ছেন।’ এটা এমন এক সুসংবাদ যার একদিকে সম্মান, অন্য দিকে সম্পদ বয়ে আনছিল।

ইত্যবসরে উসামা ইবন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে নিয়ে বিজয়ীবেশে মদীনায়ে ফিরে আসেন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব আদেশ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেসব অসিয়ত করেছিলেন, সবকিছুই তিনি বাস্তবায়ন করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে বের হচ্ছিলেন। এ সময় তিনি উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায়ে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাকে ও তাঁর বাহিনীকে বলেন, ‘তোমরা বিশ্রাম কর এবং তোমাদের আরোহণ জন্তুগুলোকে বিশ্রাম করাও।’^{৩৮}

অতঃপর তিনি যুল কিসসা অভিযুক্ত সৈন্যদলের সাথে বের হয়ে যান। যারা সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিল তারাও সেই সৈন্যদলে যোগদান করল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে সাধারণ মুসলমানরা বলল, ‘আল্লাহর কসমের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি ফেরত চলে যান। নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। কেননা, যদি আপনার কিছু হয় তাহলে মুসলমানদের মাঝে শৃঙ্খলা থাকবে না। শত্রুর মোকাবেলায় আপনার অবস্থান বিপজ্জনক হবে। আপনি বরং আপনার স্থলে অন্য কাউকে প্রেরণ করুন। যদি সে শহীদ হয়, তাহলে অন্য কাউকে তার স্থলে আমীর বানাবেন।’ তিনি শপথ করে বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তা করব না। এর পরিবর্তে আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তোমাদের সান্ত্বনার কারণ হব (আমাদের পরিণতি যা-ই হোক, তোমরা এটা ভেবে সান্ত্বনা পাবে যে, আমি দ্বীনের জন্য আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি)।’

এখানে ধর্মত্যাগীদের দমন করার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রের একটি মহান দিক ফুটে উঠেছে। একজন নেতা হিসেবে তিনি তার জাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছেন। এতে তিনি সকল মুসলমানের জন্য আমল বা অনুসরণের ক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে উঠেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই দৃঢ়চেতা মনোভাবের জন্য মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্তরে শৌর্য-বীর্যের অনবদ্য প্রেরণা অনুভব করল। তাদের নেতার সব আদেশ বাস্তবায়নে জেগে উঠল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ক্রান্তি-অবসাদের মধ্যেও যুহুসাই ও যুল কিসসা অভিযানে বের হলেন। তিনি নু'মান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সুআইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেখা পেলেন যারা তার পক্ষে যুহুসাই এলাকা পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যুহুসাই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক হওয়ায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবরাক এলাকার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে রাযাযাবাসীর উপর আক্রমণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা হারিস ও আউফকে পরাজিত করলেন। হুতীআকে বন্দী করা হলো। আব্বাস ও বনুবকর সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবরাকে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এদিকে বনু যুবয়ান কয়েকটি শহরে জয়লাভ করল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এসব এলাকা বনু যুবয়ানের জন্য হারাম। কেননা, এসব এলাকা আমরা গনীমতরূপে লাভ করেছি। তিনি বনুযুবয়ানকে সেখান থেকে নির্বাসিত করলেন।

মোটকথা, যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের উপর জয়ী হলেন আর তারা যে দরজা দিয়ে বের হয়েছিল, সেই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল; অর্থাৎ ইসলামে ফিরে আসল। তিনি লোকদের ক্ষমা করে দিলেন। বনু সালাবা আবরাক এলাকায় আসল যাতে সেখানে পুনর্বাস থাকতে পারে। তাদের নিষেধ করে দেওয়া হলো। তারা মদীনায় হাজির হয়ে খলীফার দরবারে জানতে চাইল কেন তাদের নিজ ভূমিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলছ। এটা তোমাদের শহর নয়। এ শহর আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং শত্রুর হাত থেকে আমরা ছিনিয়ে এনেছি।' তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন না।

মুসলমানদের ঘোড়ার সাহায্যে আবরাককে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা দিলেন। প্রথমে রাবাযাকে সকল মানুষের চারণভূমিরূপে ঘোষণা দেন। যা একসময় শুধু বনু সালাবার চারণভূমি ছিল। পরবর্তীতে সাদাকার পশু প্রতিপালনকারীদের সাথে অন্যদের লড়াই হওয়ায় শুধু সাদাকার পশুর চারণভূমি হিসেবে একে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা দেন।

আবরাক যুদ্ধ সম্পর্কে যিয়াদ ইবন হানযালা বলেন, 'সেই দিনের কথা স্মরণযোগ্য যেদিন আমরা আবরাকের যুদ্ধে যুবয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তখন তারা ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে ছিল। আমরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে চূড়ান্ত লড়াই করি। তিনি তখন দোষারোপ পরিহার করেন। এভাবে মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্র থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, তিনি তার অনুসারীদের বাদ দিয়ে কখনও নিজের জন্য পার্থিব কিছুই প্রতি ধাবিত হননি। কোনোকালে মুসলমানদের নীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি। তবে তখনই হয়েছে যখন তারা তাদের নেতৃত্বকে সম্মান অর্জনের মাধ্যম এবং গনীমত কামাইয়ের দরজা ও ঋণ থেকে উদ্ধারের ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেই সাথে তারা নিজের সুখকে প্রাধান্য দিয়েছে। কাজের চেয়ে কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। উম্মতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দূরে থেকেছে।'

একের পর এক পর পর তিনটি যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গমনকে নিঃসন্দেহে বিরাট কুরবানী ও মহৎ আত্মোৎসর্গ বলে গণ্য করা হবে। মুসলমানরা কসম দিয়ে তাকে মদীনায়ে থাকতে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনো সেনাধিনায়ককে পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। তিনি তাদের সেই অনুরোধ রাখেননি। নিজ মতের উপর অবিচল থেকে বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না। নিজের ব্যাপারে তোমাদের সহমর্মিতাকে গ্রাহ্য করব না।'

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে তিনি বড় ধরনের বিনয়ের অধিকারী ছিলেন এবং উম্মতের কল্যাণের বিষয়টি ছিল তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের চেয়ে অনেক দূরে ছিল তার অবস্থান। আর এভাবে তিনি অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পর পর তিনটি যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ—অথচ তখন তিনি বার্ধক্যে

পৌঁছেছেন, জীবনের ষাটটি বছর পার করেছেন। এটা অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে বিরাট কর্ম-উদ্দীপনা ও মানসিকশক্তি দান করেছে।^{৩৯}

এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনায় এসেছে যে, সিরার ইবন আর আযওয়ার যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ মর্মে সংবাদ দিল যে, তুলাইহা আল-আসাদী সৈন্য সমবেত করছে। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কাউকে দেখিনি যিনি আবু বকরের এরূপ ব্যাপক-বিস্তৃত যুদ্ধে ময়দান খুলেছেন। আমরা যখন এ বিষয়ে কোনো সংবাদ দিতাম তখন যেন তার পক্ষের সংবাদই দিতাম বিপক্ষের কোনো সংবাদ দিতাম না। অর্থাৎ কোনো সংবাদেই তিনি সামান্যতম বিচলিত হতেন না।

যেহেতু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বদ্ধমূল বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা ছিল যে, আল্লাহ তার ওলীদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করবেন, এ কারণে এরূপ মজবুত গুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমলের দিক থেকে অন্য সাহাবীদের তুলনায় অনেক বেশি উপরে ছিলেন না। তবে সুউচ্চ ও মজবুত ঈমানের দিক থেকে সব সাহাবীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, যখন কোনো একজন ব্যক্তি তাকে বলল, ‘আপনার উপর সমস্যার যে বোঝা চেপেছিল, যদি তা কোনো পাহাড়ের উপর চেপে বসত তাহলে তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত। যদি কোনো মহাসমুদ্রের মাঝে আপতিত হতো, তাহলে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যেত। অথচ আপনাকে ঘাবড়াতে দেখছি না।’ উত্তরে তিনি বলেন, ‘(হিজরতের সময়) সাওর গুহার রাতের পর আমার অন্তরে কখনও ভয় ঢোকেনি। কেননা, সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে চিত্তিত দেখে বলেছিলেন, হে আবু বকর! তোমার কিছুই হবে না। আল্লাহ এ দীন পূর্ণতায় পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।’^{৪০}

^{৩৯} আত-তারিখ আল-ইসলামী, আল-হুয়াইদী (৯/৪৮)।

^{৪০} আবু বকর আস-সিদ্দীক: আফযালুস-সাহাবাহ ওয়া-আহাকুহুম বিল-খিলাফাহ (পৃ. ৬৯)।

সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্বভাবগত বীরত্বের সাথে দীনী বীরত্ব যুক্ত হয়েছিল। আল্লাহর জন্য মজবুত-দৃঢ় ইয়াকীন ছিল। তার আস্থা ছিল আল্লাহ তাকে ও মুসলমানদের সাহায্য করবেনই। এ বীরত্ব আসলে কারও ক্ষেত্রে সম্ভবই না। যদি তার অন্তর শক্তিশালী না হয়। আর এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটে ঈমানের বৃদ্ধির দ্বারা ঈমান কমে গেলে দৃঢ়তাও কমে যায়। সুতরাং ঈমানের দৃঢ়তার দিক থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তার কাছাকাছি কোনো সাহাবীর অবস্থান ছিল না।



তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ

ধর্মত্যাগীদের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছিল। যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিল তারা অনেকে স্বগোত্রের ধর্মত্যাগীদের উপদেশ দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা ধর্মত্যাগীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তাদের কর্মকাণ্ড ঈমানের জন্য কতটা ক্ষতিকারক। মূলত ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ ছিল দাওয়াতী কার্যক্রম। উল্লেখ্য, ইসলামে দাওয়াত কোনোকালেই দুর্বলতম পদ্ধতি ছিল না, বরং দাওয়াতই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা, দাওয়াত হক কথার লক্ষ্যকে স্থির করার সুনিপুণ অস্ত্র। কখনও কখনও ব্যক্তিকে আত্মসর্গের পথে নিয়ে যায়। সেসব গোত্রে এমন কিছু হৃদয় ছিল যাতে দৃঢ়ভাবে ইসলাম প্রবেশ করেছিল এবং তারা ইসলামের সত্যিকার স্বাদ পেয়েছিল। ইসলামের উপরই তাদের জীবন পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং নিজ গোত্রের লোকদের অন্যায়-অবিচার তাদের দৃষ্টি এড়ান না। তারা তা প্রতিহত করার চেষ্টায় সোচ্চার হন এবং তাদের মন্দ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকেন। কিন্তু অন্যায় কাজ ত্যাগ করার পরিবর্তে ধর্মত্যাগী ও বাতিলপন্থীরা তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। অতঃপর তারা তাদের সম্প্রদায় থেকে বিতাড়ন ও বহিস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করল। এমনকি তাদের অনেককে হত্যা করতে গিছপা হলো না। কেউ কেউ অবশ্য দাওয়াতী কার্যক্রমে সফল হলো। সফলদের অন্যতম হলেন, আদী ইবন হাতিম যিনি তার সম্প্রদায়কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তদ্রূপ আল জারুদ বাহরাইনবাসীকে দাওয়াতের মাধ্যমে সঠিক পথে আনতে পেরেছিলেন (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ)।

কতিপয় মুসলমান যখন তাদের সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগীদের উপদেশের মাধ্যমে বোঝাতে ব্যর্থ হলেন। তখন তারা ইসলামের উপর যারা অবিচল

ছিলেন তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালালেন। তারা মনে করলেন ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে এটাও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অতঃপর সেটা আমলে রূপান্তর হয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাই বনু সুলাইম গোত্রের ধর্মপ্রাণ লোকেরা তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছে। অতঃপর তারা দু-দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় দল যারা মুরতাদ-ধর্মত্যাগীরা।

ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ইয়ামানে যুবকরা গোপনে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করার কৌশল গ্রহণ করে। (এর বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ)। অথচ প্রথমদিকে আল আনাসীকে মোকাবেলা করার ব্যাপারে তারা নেতিবাচক চিন্তা গ্রহণ করেছিল।

মাসউদ অথবা মাসরুক ইবন আবিস আল কাইসী আল কিনদী ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য আশআস ইবন কাইসকে বোঝাবার জন্য উপদেশ দেওয়া শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তাদের দু-জনের মাঝে দীর্ঘ এক বিতর্ক চলল। (একপর্যায়ে আশআস দীনে ফিরে আসলেন) এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ তৎপরতা দ্বারা অনেক মুরতাদ অবস্থা থেকে ফিরে এলেন। অথবা এরূপ অবস্থানের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের কাজটি সহজ হয়ে যায়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা বাস্তবায়নের নির্ভরতা ছিল মহান আল্লাহর উপর। অতঃপর আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্র, নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের মজবুত ভিত্তিমূলের উপর, যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন এবং ধর্মত্যাগীদের ফিতনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিকগণ ধর্মত্যাগের ফিতনা ব্যাপকভাবে হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বিষয়টিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করেননি, অথবা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিপাতযোগ্য বলে উল্লেখ করেননি। তারা সঠিকভাবে ইসলামের ব্যাপারে অনুমান করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে স্বভাবতই তারা ভুলের শিকার হয়েছেন।

এ ফিতনার ক্ষেত্রে মৌলিক বাস্তবতা যা ছিল তা হলো এ ফিতনা সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ভৌগলিক বিস্তৃতির মতো ব্যাপ্ত ছিল না। অর্থাৎ কোন একটি এলাকা কিংবা পুরো গোত্রের সকলেই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এমন না। বরং যেসব এলাকায় ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে অনেক নেতা, অনেক গোত্র, দল-উপদল ও সাধারণ মানুষ এমনও ছিল যারা ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল।^{৪১}

ড. মাহদী রিয়কুল্লাহ আহমাদ এ প্রসঙ্গে একটি গভীর অনুসন্ধানী তত্ত্বমূলক আলোচনা করেছেন। তিনি একটি প্রশ্ন তুলে সেটার জবাবদানের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে যে ধর্মত্যাগের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল তা কি প্রত্যেক আরব গোত্র, নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঘটেছিল? নাকি এ ফিতনার মধ্যে কিছু কিছু গোত্র, নেতৃবৃন্দ ও কতিপয় সাধারণ মানুষ, যারা আরব অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত ছিলেন, তাদের মাঝেই ঘটেছিল?

উত্তরে তিনি বলেন, তথ্য অনুসন্ধানের পর যা জানা যায় তা হলো, ‘গোত্রগুলোর নেতৃবৃন্দ ও সর্বসাধারণের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল, সবাই ইসলামধর্ম ত্যাগ করেনি। যেমনটা উল্লেখ করেছেন ঐ সকল লেখক যাদের নাম আমি উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছি। আমি যা পেয়েছি তা হলো, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্র, দল-উপদল ও সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠী, যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিল এবং আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তাদের উপর ভিত্তি করে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এরা ছিল ইসলামের ময়বুত দেয়াল ও শক্তি যা ধর্মত্যাগীদের আন্দোলন নস্যাৎ করতে কাজ করেছিল।’^{৪২}

^{৪১} আস-সাবিতুন আল-ইসলাম আইয়্যাম ফিতনাতুর-রিদাহ (পৃ. ৪)।

^{৪২} আস-সাবিতুন আল-ইসলাম আইয়্যাম ফিতনাতুর-রিদাহ (পৃ. ১৯)।

প্রথম। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত মোকাবেলা

১। অভ্যন্তরীণভাবে অকার্যকর করার চেষ্টা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি চিঠি-পত্র ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে যেসব সম্প্রদায়ে নবুওয়াতের দাবি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা ইসলামে অবিচল ছিলেন তাদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের মধ্যে ধর্মত্যাগীদের সাথে লড়াই করার জন্য বাহিনী গঠন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই পথ অনুসরণ করেন। ধর্মত্যাগীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যা কিছু করা সম্ভব তা-ই করার চেষ্টা করেন। ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে সচেতনতা, তাদের অপদস্ত করা ও তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টির প্রয়াস চালান। তিনি ইসলামের উপর যারা অটল ছিলেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সামরিক বাহিনীর জন্য তাদের তাদের থেকে রিজার্ভ বাহিনী গঠন করেন। তিনি উসামার বাহিনী ফিরে আসার পর ধর্মত্যাগীদের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করার উন্নতকে প্রস্তুত করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের নেতৃবৃন্দ ও ইসলামের উপর দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করা লোক—উভয়ের সাথে কৌশলগত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন যাতে তার লক্ষ্য অর্জিত হয়। আর এটা করেন উসামার বাহিনী ফেরত আসার আগ পর্যন্ত সময়ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে।

ইয়েমেন ও অন্যান্য স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তিনি তাদের কাছে চিঠি লিখেন। তারা যেন ইসলামের দিকে দাওয়াতী কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং তাঁর পরবর্তী নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান করেন। এটা ছিল আগমনকারী সৈন্যদলের সুবিধার্থে প্রাথমিক পদক্ষেপ।

অন্যদিকে মুসলমানদের কতিপয় দল মদীনা উপস্থিত হয়ে ভুল বোঝাবুঝি মিটমাট করার চেষ্টা করেন। তারা সাথে করে যাকাত নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে আদী ইবন হাতীম আততায়ী, যবরকান ইবন বদর আততায়ী ছিলেন অন্যতম।

মুসলমানরা কাইস ইবন মাকশোহ আল মুরাদীর আন্দোলন শুরু করে দেয়। কতিপয় অগ্রবর্তীদল তিহামা, আসসারয়াত ও নাজরান এলাকায় অবস্থান করে। এ প্রচেষ্টাগুলোতে কয়েকটি ফলাফল পরিদৃষ্ট হয় :

ক। সচেতনতা, দাওয়াত, মুসলমানদের শক্তিশালী করা এবং ধর্মত্যাগীদের দলকে অপদস্থকরণের অভিযানগুলো বাস্তবায়নে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা সফলতা লাভ করে। তাছাড়া এটি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভূমিকা হিসেবে কাজ করে যখন সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর পরবর্তী পদক্ষেপ হর সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী প্রেরণ করা।

খ। উপরিউক্ত পদক্ষেপ পর্যায়েক্রমে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে এবং তা ইসলামের উপর যারা অবিচল ছিল তাদের পরবর্তীতে যে বিজয়গুলো মুসলমানদের অর্জিত হর সেগুলোর সৈনিক ও নেতারূপে তৈরি করে। যেমন, আদী ইবন হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক বিজয়ের একজন নেতা ছিলেন।

গ। বিভিন্ন সীমান্ত যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্ধারণ করেছিলেন তাতে সীমান্ত গ্রহরী নিয়োগদান করা হর। যারা পরবর্তীতে মুসলিম সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত হয়।

২। সুশৃঙ্খল বাহিনী প্রেরণ

যখন উসামা ইবন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী দু-মাস পর মতান্তরে চল্লিশ দিন পর মদীনায় ফিরে আসলেন এবং তারা ছুটিতে গেলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের জামা'আত যুল কিসসা অভিযুখে অভিযানে বের হলেন। যুল কিসসা মদীনা থেকে বত্রিশ মাইল বা দু-দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অভিযানটি ছিল ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। সাহাবায়ে কিরাম খলীফাকে অন্য কারও নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করার ও খলীফা যেন মদীনায় ফিরে যান এ মর্মে অনুরোধ করেও জোর দাবি জানায়। কারণ, উম্মতের সার্বিক বিষয়াদি দেখভালের দায়িত্ব তার উপর ছিল।

এ বিষয়ে যা বর্ণিত আছে তা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবানিতে শোনা যাক। তিনি বলেন, 'আমার পিতা প্রকাশ্যে তরবারি

উঁচিয়ে তার সওয়ারির উপর আরোহণ করে যুল কিসসা অভিযুখে রওয়ানা করেন। আলী ইবন আবু তালিব এসে তার বাহনজন্তুর লাগাম ধরে আরজ করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! কোথায় রওয়ানা করেছেন? উহুদের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা আপনাকে শোনাতে চাচ্ছি।’ তারপর বলতে থাকেন, ‘আপনি আপনার তরবারিতে চুমু দিন। আপনার ব্যাপারে আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করবেন না। আল্লাহর শপথ! যদি আপনার দ্বারা মসীবতের শিকার হই তাহলে আপনার পর ইসলামের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না।’ অতঃপর তিনি ফিরে যান।^{৪৩}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে এগারোটি বিগ্রেডে (বৃহৎ সৈন্যদলে) ভাগ করেন। প্রত্যেক বিগ্রেডে একজন আমীর নিযুক্ত করেন।^{৪৪} আমীরদের আদেশ করেন তারা যে জনপদ দিয়ে অতিক্রম করবেন তারা যেন সে এলাকার তাবিঈ মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হোন।

বিগ্রেড আমীরগণের তালিকা নিম্নরূপ :

১। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদেব বিগ্রেড যাদের বনু আসাদ অতঃপর বনু তামীম, তারপর ইয়ামামার উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল।

২। ইকরামা ইবন আবু জাহলের বাহিনী। একে প্রথম বনু হানীফা গোত্রে মুসায়লামার সাথে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ওমান, মুহরা, তারপর হাযারা মাওত ও ইয়েমেনের উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়।

৩। গুরাহবীল ইবন হাসানাহ এর বাহিনী, ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর তার বাহিনীকে ইয়ামামাতে প্রেরণ করা হয়। তারপর হাযারা মাওত এলাকায় প্রেরণ করা হয়।

৪। তুরাইফা ইবন হাযির যার বাহিনী হাওয়াযিন গোত্রের বনু সুলাইম এর শাখা গোত্রে প্রেরণ করা হয়।

^{৪৩} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২/৩১৯)।

^{৪৪} আভ-তারিখ আল-ইসলামী (৯/৪৯)।

৫। আমর ইবনুল আস এর বাহিনী যা কাযাতাহ এলাকায় প্রেরিত হয়।

৬। খালিদ ইবন সাজিদ ইবনুল আস এর বাহিনী শামের মালভূমি এলাকায় প্রেরিত হয়।

৭। আস আলা ইবনুল হায়রামীর বাহিনী বাহরাইনে প্রেরিত হয়।

৮। হুযাইফা ইবন মিহযান আল কাঈ এর বাহিনী ওমান এলাকায় প্রেরিত হয়।

৯। উরফাযাহ ইবন হায়ছামাহ এর বাহিনী মুহরা এলাকায় প্রেরিত হয়।

১০। মুহাজির ইবন আবী উমাইয়া এর বাহিনী প্রেরিত হয় ইয়েমেন এলাকায় (সানা ও হাযারা মাওত এলাকায়)

১১। সুআইদ ইবন মুকরিনের বাহিনী ইয়েমেনের তিহামা অঞ্চলে।^{৪৫}

এভাবে যুল কিসসা এলাকাটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে কিংবা সুশৃঙ্খল বাহিনী তৈরির প্রশিক্ষণকেন্দ্রের স্বীকৃতি লাভ করে যে বাহিনীগুলো ধর্মত্যাগীদের শাস্তা করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এরূপ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের দ্বারা তার বিরল ব্যক্তিত্ব ও সূক্ষ্ম ভৌগোলিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।^{৪৬}

উক্ত বিগ্রেডগুলোর বণ্টন এবং এলাকা নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানতে পারি যে, তিনি একজন সূক্ষ্ম ভূগোল-বিশারদ ও মানচিত্র বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি জনবহুল এলাকা ও আমর উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগের রাস্তাঘাট সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবগত ছিলেন, যেন পুরো আরব উপদ্বীপ তার সামনে সচিত্র উপস্থিত ছিল।

তিনি সেনাবিগ্রেডগুলোর গমনাগমন সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তাদের কোথায় একত্রিত হতে হবে কোথায় তারা বিচ্ছিন্ন হবে। তারপর

^{৪৫} আভ-তারিখ আভ-তাবারী (৪/৬৮); দিরাসাত ফী আসার আন-নবুওওয়াহ (পৃ. ৩২১)।

^{৪৬} দিরাসাত ফী আহাদ আন-নবুওওয়াহ ওয়াল-খুলাফা আর-রাশিদীন (পৃ. ৩২১)।

কোথায় দ্বিতীয়বার একত্রিত হবে সবই তার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। এসব সেনাকুলের মাধ্যমে গোটা আরব উপদ্বীপকে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আনার সুদূরপ্রসারী নির্ভুল ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টান্তমূলক প্রতিবেদন সামনে রাখেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সার্বক্ষণিক জানতেন তার প্রেরিত সৈন্যদল কোথায় অবস্থান করছে, তারা কোথায় মার্চ করছে এবং তাদের প্রয়োজনাতি সম্পর্কেও ব্যাপকভাবে অবগত ছিলেন। তাদের আগামী দিন কী করণীয় তা তিনিই নির্ধারণ করতেন। যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল সূক্ষ্ম ও দ্রুতগতির। বিভিন্ন এলাকার সংবাদ নেতৃত্বের কেন্দ্র মদীনায় সেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থাকতেন সেখানে পৌঁছে যেত। তিনি নিয়মিত তার সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সৈন্যবাহিনী ও খেলাফতের মূলকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের তথ্য আদান-প্রদানের কাজে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাদের অন্যতম হলেন আবু খাইছামা আনু নাজ্জারী আল আনসারী, সালামাহ ইবন সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বারযা আল আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও সালামাহ ইবন ওয়াকস।^{৪৭}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেসব সেনাবাহিনী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত ছিল। এটা ছিল রাষ্ট্রের অন্যতম সফলতার একটি দিক। সেসব সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণতা-দক্ষতার পাশাপাশি নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্তমূলক শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তারা যে আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন সারিয়াহ ও গাযওয়াতে শরীক হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা তার অতিরিক্তরূপে বিদ্যমান ছিল। এসব বিবেচনা করত আরব উপদ্বীপে তখন যত সেনাবাহিনী ছিল তাদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনী সবচেয়ে অগ্রসর ছিল একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।^{৪৮} এসব সেনা ইউনিটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার ছিলেন আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু;

^{৪৭} কিত-তারিখ আল-ইসলামী, শওকী আবু খলীল (পৃ. ২২৬-২২৭)।

^{৪৮} মিন দওলাহ উমর ইলা দওলাহ আব্দুল মালিক, ইবরাহীম বাইদুন (পৃ. ২৮)।

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহ ও ইসলামী বিভিন্ন বিজয়ে যিনি ছিলেন এক বিরল ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই সৈন্যদলকে এরূপ (এগারোটি বিঘ্রেডে) বিভক্ত করা হয়। যার সারকথা এই যে, ধর্মত্যাগীরা বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তাদের এমন কোনো সম্মিলিতশক্তি ছিল না যারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অবস্থান নেবে। তাছাড়া এরূপ কিছু করার জন্য পর্যাপ্ত সময়ও ছিল না। কেননা, তাদের ধর্মত্যাগ করার পর মাত্র তিনমাস সময় অতিবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা তাদের উপর এমন ভয়ংকর কিছু করবে, সেটা অনুমান করতে পারেনি। মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কেও তাদের ধারণা সঠিক ছিল না। তারা চিন্তাই করতে পারেনি যে, মুসলমানরা তাদের কয়েক মাসের মধ্যে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত আক্রমণ করে তাদের শক্তি সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং বাতিলকে সাহায্য করার জন্য তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পূর্বেই তাদের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনা করলেন। সুতরাং তাদের ফিতনা শত্রু অবস্থানে যাওয়ার আগেই দ্রুত আক্রমণ করলেন। তাদের এতটুকু সুযোগ দিলেন না যাতে তারা মাথা উঁচু করে তাকাতে এবং জিহ্বা বের করে ইসলামের দেহে দংশন করতে পারে।

এ পরিকল্পনা মূলত ঐ হিকমত অনুযায়ী যা প্রবাদাকারে বলা হয়—কবি বলেন,

لا تقطع ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهياً فأتبع رأسها الذنب

তুমি বিষধর সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি সাহসী ও বিচক্ষণ হও, তাহলে লেজের পর তার মাথা কেটে দাও।

তিনি নব্য ফিতনার দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা—ত্রিমাাত্রাই ঘিরে ফেলেন এবং শত্রুভাবে ধরেন। এর লাগাম টেনে নেন। তিনি জানতেন যদি তিনি এভাবে না করেন, তাহলে একসময় ছাইয়ের নিচ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার ভেসে উঠবে। তখন তা শুল্ক ও তাজা সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দেবে। যেমন প্রথমোক্ত কবি বলেন,

أرى تحت الرماد وميض نار و يوشك أن يكون لها ضرام

আমি দেখেছি ছাইয়ের নিচে আগুনের ঝলক

অদূর ভবিষ্যতে এ থেকে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হতে পারে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, চৌকস সমরবিদ যিনি সঠিক পরিকল্পনা তৈরিতে সক্ষম। তিনি এ ব্যাপারে বাস্তব রোডম্যাপ তৈরি করেন।

মুসলিম সেনাবাহিনী গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। তাওহীদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর সাহায্য লাভের প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছিল। তারা কেবল সাহসী এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধাই ছিলেন না, দৃঢ় ঈমানেরও অধিকারী ছিলেন এবং যে কোন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সবকিছু থেকে এই ঈমানী শক্তিরই প্রয়োজন ছিল বেশি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই নিখাদ দু'আকে কবুল করলেন। তাদের জন্য তার সাহায্য প্রেরণ করলেন। তাদের মাধ্যমে তার দ্বীনকে বুলন্দ করলেন এবং দ্বীনকে রক্ষা করলেন। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে পুরো আরব উপদ্বীপ ইসলামের পতাকাতলে এসে আশ্রয় নিল।^{৪৯}

আর এদিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরব বিভিন্ন গোত্র, যাদের মধ্যে ধর্মত্যাগের ঘটনা ও বিদ্রোহ হয়েছিল, তাদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। এসব চিঠিতে তিনি তাদের ইসলামে ফিরে আসার এবং তা যেভাবে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, ঐ একইভাবে ও পরিপূর্ণভাবে জীবনে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। আর যদি তারা আপন অবস্থায় বহাল থাকে, তাহলে তাদের ইহকাল ও পরকালে এর মন্দ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন। তিনি তাদের শক্তভাবে সতর্ক করেন। তাদের বিপথগামী হওয়া এবং বাতিলকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে তার এ শক্ত অবস্থান যথার্থ ছিল। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের জন্য শক্তভাবে সতর্ক করার পর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরি ছিল। কারণ, এ ভ্রান্ত মতবাদ সেসব গোত্রের নেতাদের চিন্তা-চেতনাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর তাদের অনুসারীদের মধ্যে কাজ করছিল অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা।^{৫০}

^{৪৯} আত-তারিখুল ইসলামী, নবম খণ্ড, (পৃ. ৫১)।

^{৫০} আত-তারিখুল ইসলামী, নবম খণ্ড (পৃ. ৫১)।

৩। ধর্মত্যাগীদের উদ্দেশে প্রেরিত চিঠির মূলবক্তব্য এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি ওয়াদাসমূহ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালো করেই জানতেন যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে আসন্ন লড়াইয়ে বিজয়ের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথাপি তিনি শত্রুপক্ষকে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু লিখে প্রচারপত্র তৈরি করেন। এটি বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে মুসলমান ও ধর্মত্যাগীদের মাঝে প্রচার করেন। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের আগে এ পত্র প্রেরণ করেন। তিনি অনেক লোককে এ কাজে নিয়োগদান করেন। তারা বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশে ও জনসভায় এ পত্র পড়ে শোনান। যারা এ পত্র শুনেছে, তাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, যারা এটি শোনেনি তাদের কাছে যেন তারা এ সংবাদ পৌঁছে দেয়। সর্বস্তরের শ্রোতাদের এতে সম্বোধন করা হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রেরিত চিঠির বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো :

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূলের খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে এ চিঠিটি সেই সব লোকের প্রতি প্রেরিত হলো, যাদের নিকট এটা পৌঁছবে। ইসলামের উপর যে প্রতিষ্ঠিত আছে কিংবা ইসলাম যে ত্যাগ করেছে—বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের নিকট এ পত্র। হিদায়েতের পথ অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যে হিদায়াত পাওয়ার পর ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেনি। আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। তিনি যা কিছু বিধান নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার করছি। যে ব্যক্তি তা মানছে না তাকে ঘৃণা করছি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। পর সমাচার, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট এমন সত্য নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি একই সাথে সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং যিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, এবং যিনি এক উজ্জ্বল প্রদীপ। এ ব্যবস্থা এ জন্য করেছেন যাতে তিনি জীবিত লোকদের সতর্ক করতে পারেন ও কাফিরদের উপর শাস্তির ফায়সালা কার্যকরী করেন। যে কেউ সে

সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন। আর যে কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রাম করেছেন, যে পর্যন্ত না সে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের ওফাত দান করেছেন। তিনি আল্লাহর বিধান চালু করেছেন, উম্মতকে কল্যাণ দান করেছেন, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন। এ সত্য আল্লাহ তার রাসূলকে জনিয়েছেন ও মুসলমানদের জন্য কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِلَهُم مَّيِّتُونَ

নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।^{৫১}
তিনি আরও বলেছেন,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

আমি আপনার আগের কোনো মানুষের জন্য স্থায়ী জীবন দান করিনি। যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে?
ঈমানদার লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٧﴾

আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বৈ নন। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তার যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহ তাদের পুরস্কার দান করবেন।^{৫২}

এখন যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, তার জানা

^{৫১} সূরা আয-যুমার, ৩৯:৩০।

^{৫২} সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪৪।

উচিত যে, আল্লাহ চিরজীব, তার মৃত্যু নেই, নিদ্রা নেই, তন্দ্রা নেই, তিনি তার কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণকারী, শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তোমাদের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে : তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমাদের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি লক্ষ রাখবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা পালন করবে, রাসূলের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহর দেওয়া দীন শক্তভাবে ধারণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে মানে না সে পথভ্রষ্ট। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সাহায্য করে না সে লাস্তিত। আল্লাহর পথ ব্যতীত যে কারও পথই বাতিল ভ্রান্ত। আল্লাহ বলেন,

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন, সে-ই হেদায়েতপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য তুমি কোনো পথের দিশারী অভিভাবক পাবে না।^{৭৩}

তাকে স্বীকার না করা পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো বান্দার আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না। আর আখিরাতে তার কর্ম-নফল কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক দীন ইসলাম মেনে নেওয়ার ও সে অনুযায়ী আমল করার পর আমার তা থেকে ফিরে গিয়েছে। তারা এরূপ করেছে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, তার নির্দেশ সম্পর্কে অস্ত্র থাকার কারণে ও শয়তানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি ফিরিশতাদের আদেশ করলাম, তোমরা আদমকে সেজদা করো। তারা সকলেই সেজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত। সে তার রবের আদেশ অমান্য

করল। তবে কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল।^{৫৪}

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ①

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। ডাকে শত্রু গণ্য করো। সে তার দলকে জাহান্নামী হওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়।^{৫৫}

আমি মুহাজির, আনসার এবং তাবেঈ সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যদের মাধ্যমে তোমাদের নিকট নির্দেশ পাঠিয়েছি। আমি তাদের বলে দিয়েছি যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনা ব্যতীত কাউকে রেহাই দেবে না। ঈমান গ্রহণের আহ্বান না জানান পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। যদি এ আহ্বানে সাড়া দেয়, ঈমানের স্বীকৃতি দেয় এবং সৎকর্মসমূহ করতে থাকে তাহলে ডাকে ছেড়ে দাও ও সাহায্য কর। আর যদি তা না মানে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। এরপর তাদের মধ্যে আর কারও কোনো শক্তি থাকবে না। আমি আরও নির্দেশ দিয়েছি যে, তাদের মধ্যে যাদের আয়ত্তে পাওয়া যাবে, তাদের জীবিত রাখা হয়ে না, বরং তাদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে, তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী ও আটক করা হবে। আমি বলে দিয়েছি, ইসলাম ব্যতীত আর কিছুই গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে নেবে তা তার জন্য কল্যাণ হবে। আর যে তা মানতে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহকে কিছুতেই অক্ষম করতে পারবে না। আমি আমার দূতকে নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এ পত্র তোমাদের সকল সমাবেশে পাঠ করে শোনায় এবং আযান হচ্ছে ইসলামের প্রতীকস্বরূপ। যখন মুসলমানরা আযান দেয়, অতঃপর তারাও আযান দেয়, তখন তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাক। আর যদি তারা আযান না দেয়, তাহলে তাদের উপর যা বর্তায়

^{৫৪} সূরা আল-কাহফ, ১৮:৫০।

^{৫৫} সূরা আল-ফাতির, ৩৫:৬।

(অর্থাৎ জিযিয়া) চাও; যদি অস্বীকার করে তাহলে বাধ্য কর। যদি স্বীকার করে নেয়, তাদের থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় কর।”^{৭৬}

উপরের চিঠিতে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দু-টি বিষয়ই ঘুরে-ফিরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, ধর্মত্যাগীদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মত্যাগীরা তাদের ভ্রান্ত আকিদার উপর বহাল থাকলে তার পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত চিঠিতে যেসব বিষয় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক। চিঠিটি সমাজের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল জনগণের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যেন সবাই ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান অবগত হতে পারে।

খ। এতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আর যে এ কথা স্বীকার করবে, সেই প্রকৃতপক্ষে মু’মিন। আর যে তা অস্বীকার করবে, সে কাফির। তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গ। নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। তার উপর আল্লাহর বাণী ‘নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন’—এ কথা কার্যকর হয়েছে। আর কোনো মু’মিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করতে পারে না। সে কেবলই চিরজীব অবিনশ্বর এক আল্লাহর ইবাদত করে। তার কোনো মৃত্যু নেই। এজন্য মুরতাদদের কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ। ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া ইসলামের শিক্ষার মূল মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও শয়তানের আহ্বানেই সাড়া দেওয়ার কারণেই সম্ভব। এটা যেন শত্রুকে বন্ধু বানান। এটা সুস্থ আত্মার জন্য বড় জুলুম। কেননা, এর মাধ্যমে সে তার আত্মাকে জাহান্নামে নিয়ে যার।

ঙ। মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট জামাত তথা মুহাজির, আনসার ও তাবেরঈনদের সমন্বয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা হয় যাতে তারা তাদের দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত

রাখতে এবং একে অবমাননা করা থেকে রক্ষা করার জন্য একনিষ্ঠভাবে লড়াই করে।

চ। আর যে ইসলামের পথে ফিরে আসবে এবং গোমরাহীর স্বীকারোক্তি দেবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে এবং দ্বীনের চাহিদা মোতাবেক আমল করবে, তাহলে সে মুসলিম সমাজেরই একজন। একজন মুসলমান যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, সেও তা-ই ভোগ করবে। সার্বিকভাবে মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হবে, তাকেও একই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ছ। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে ফিরে আসতে অস্বীকার করবে এবং বিভ্রান্ত মতবাদের উপর বহাল থাকবে, সে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হবে। তার উপর আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাকে হত্যা করা হবে অথবা পুড়িয়ে মারা হবে। তার পরিবারে নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে। সে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। কেননা, সে আল্লাহর রাজত্বের বাইরে কোথাও যেতে সক্ষম হবে না।

জ। যুরতাদরা একটি কাজ করলে মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। আর তা হলো আযান। তাদের পক্ষ থেকে যদি আযান না শোনা যায়, তাহলে তাদের উপর দ্রুত আক্রমণ করা হবে।

বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য খলীফা তার এ নির্দেশ থেকে সেনাধিনায়ক ও সাধারণ সৈন্যদেরও বাদ দেননি। তিনি সমরনেতাদের প্রতিও চিঠি প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের পূর্বে উল্লেখিত পত্রের বিষয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরার জন্য আহ্বান করেছেন। তাদের প্রতি প্রেরিত পত্রের বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূলের খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেনাপতিগণের প্রতি নির্দেশনামা—তারা সাধ্যানুযায়ী নিজেদের প্রকাশ্য এবং গোপনীয় কার্যসমূহে আল্লাহ তা'আলার ডয় মনে রাখবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পূর্ণরূপে চেষ্টা করবে। যারা আল্লাহর ইসলামের গণ্ডি হতে শয়তানের ফাঁদে পড়েছে, তাদের

বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। প্রথমে তাদের ইসলামের যাবতীয় বিধানের প্রতি পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করার জন্য আহ্বান করবে। আহ্বানে সাড়া দিলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ নেই। আর যদি তারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া না নেয়, তবে তাদের প্রতি বীর-বিক্রমে আক্রমণ চালাবে, যে পর্যন্ত না তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে। ইসলাম কবুল করলে তাদের ইসলামের অবশ্যকরীয় কার্যাবলি, মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং তাদের প্রতি মুসলমানদের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করবে। তাদের নিকট থেকে যা প্রাপ্য তা উসুল করে নেবে, আর তাদের প্রাপ্য তাদের পূর্ণরূপে দিয়ে দেবে। যদি ইসলামের দাওয়াত অগ্রাহ্য করে, তবে তাদের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেবে না। মুসলিম সৈন্যগণ! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবহেলা করবে না। যারা আল্লাহর আদেশের সম্মুখে মাথা নত করবে এবং সর্বাঙ্গীকরণে তা মেনে নেবে, তাদের ঈমান ও ইসলাম কবুল করে নেবে। ভালো কাজে তাদের সাহায্য করবে। যুদ্ধ করবে শুধু ঐসব লোকের সঙ্গে যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূল কর্তৃক আনীত বিধানসমূহ অস্বীকার করবে। কিন্তু পুনরাহ্বানে ইসলামের ডাকে যারা সাড়া দেবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো পথ থাকবে না। পুনরায় ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে নিয়ে নিজেদের সব কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করলে আল্লাহ তা'আলাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার তরফ হত আগত এই দাওয়াত গ্রহণ করবে না, সে যেখানেই যাবে এবং যেখানেই পৌঁছবে, নিহত হবে।

ইসলামের বশ্যতা স্বীকার না করে কেউ ইসলামের জন্য দান করলে তা গ্রহণ করবে না। তবে হ্যাঁ, সর্বাঙ্গীকরণে ইসলামের দাওয়াত কবুল করার পর ইসলামের সেবায় কিছু দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাদের উপর জয়লাভ করলে তাদের হত্যা করবে।

যুদ্ধে গনীমতের মাল যা কিছু হস্তগত হবে, তার এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকি চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। পৃথককৃত পঞ্চমাংশ আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে—তা ইসলামী রাজ্যের বাইতুল মালের অংশ। নিজের সঙ্গীগণকে কোনো কাজে তুরান্বিত করা এবং ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখবে। না বুঝে না জেনে কোনো বেকার মানুষকে সেনাদলে যোগদান করতে দেবে না।

কেননা, সে সেনাদলে প্রবেশ করে গুণচরবৃত্তি করতে পারে এবং ফলে মুসলমানগণ কোনো বিপদে পতিত হতে পারে। মুসলমানদের সাথে সকল বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আর পথে ও বিশ্রামকেন্দ্রে সর্বত্র তাদের সঙ্গে নশ্র ব্যবহার করবে। একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দেবে না। একজনের দাবিকে অন্যজনের দাবির উপর অগ্রাধিকার দিবে না। মুসলমানদের এই উপদেশ প্রদান করবে যে, সর্বদা যেন নিজেদের সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথায় ও কাজে নশ্রতার আচরণ বজায় রাখে।^{৭৭}

সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এ চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিকারভাবে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পদ্ধতি ও নীতিমালা বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেননি। এভাবে তিনি সেনাপতিদের প্রতি পরিকার ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এক, ইসলামের দিকে আহ্বান করা ব্যতীত যুদ্ধ নিষেধ। দুই, যারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। তিন, তাদের সংশোধনের ব্যাপারে চেষ্টা-তদবীর করা। চার, ইসলামকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা বন্ধকরণ এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে হবে। তাদের দেখিয়ে দিতে হবে শরীয়ত তাদের কী কী হক দিয়েছে এবং কী তাদের করণীয়। এ ব্যাপারে শৈথিল্য করা মোটেও সমীচীন নয়। অথবা যে পর্যন্ত ধর্মত্যাগীরা আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরে না আসে, সে পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা।

সুতরাং ইসলামী সেনাবাহিনী যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দিকে আহ্বানের কাজকে আবশ্যিক করে নিল এবং ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়াকেও শিরোধার্য করে নিল। কেননা, এসব কিছু একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মত্যাগীরা যেন পুনরায় দ্বীনের দিকে ফেরে যেখান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ধর্মত্যাগের প্রকাশ্য যে বাতাস বইছিল, তাকে রুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়ন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মূল উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, তাদের নিকট থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। বরং পরস্পর ঐকমত্যের জন্য তাদের কাছে

টেনে আনার জ্বরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। মোটকথা, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে উক্ত অঙ্গীকারনামা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তিনি তাদের কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে, তাদের কর্মপদ্ধতি যেন দাওয়াতকেন্দ্রিক হয় এবং একটি লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার সাথে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আর তা হলো ইসলামবিরোধী সবকিছুকে প্রতিহত করা।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেছেন। রাসূলই তাকে নেতৃত্বের কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। একজন সমরনেতার নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে সফলতা সম্পূর্ণভাবে একজন সৈন্য হিসেবে তার পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আদর্শ সৈনিক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও একনিষ্ঠ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তার সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত হুবহু মেলাতেন। জিহাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চরম আত্মোৎসর্গকারী। তিনি কোনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটেননি। আমরা সামনের আলোচনায় তার নেতৃত্বের সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনাকে বিশ্লেষণ করব। তিনি তার সমরাধিনায়কদের যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সেগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং তার সাধারণ পরিকল্পনা যা তিনি যুদ্ধ চলাকালে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো নিয়েও বিশ্লেষণ করব।

তিনি যুদ্ধের সেনাপতিদের উদ্দেশে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যায়:

ক। তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে। প্রকাশ্য ও গোপন কাজে তাকওয়া বজায় রাখে। ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাই সঠিক পদ্ধতি। কেননা, যখন কোনো আমীর তাকওয়াকে অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

নিশ্চয়ই যারা যুতাকী এবং সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।^{৫৮}

খ। চেষ্টা, যুজাহাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা—এগুলোই হচ্ছে সাহায্যপ্রাপ্ত সফল বান্দার আখলাক। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমাদের পাওয়ার জন্য চেষ্টা-যুজাহাদা করে আমি অবশ্যই তাদের অনেকগুলো পথের সন্ধান দিই। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।^{৫৯}

গ। যারা ধর্মত্যাগ করেছে, তাদের ইসলামে প্রবেশ করা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে ছাড় দেওয়া হবে না। অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে। কেননা আকীদার ব্যাপারে কোনোরূপে শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ। গনীমতের মাল যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তবে বাইতুল মালে তার এক-পঞ্চমাংশ অবশ্যই জমা দিতে হবে।

ঙ। ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা যাবে না যাতে তাদের প্রত্যাগমনের যথেষ্ট সুযোগ নিশ্চিত হয়।

চ। কোনো আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি যেন সেনাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, এরূপ ব্যক্তির গোয়েন্দাকার্যে লিপ্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছ। সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতে হবে। সফর ও বিশ্রামের সময় তাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। অন্যথায় কারও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জ। সকল সেনাদের মঙ্গল কামনা করবে। বিশেষ করে তাদের পরস্পর সহাবস্থানের ক্ষেত্রে এ দিকটি অবশ্যই লক্ষ রাখবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যুরতাদদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ, মুসলিম বাহিনীকে বিভিন্ন বিঘ্রেড়ে বিন্যাস এবং সেনাপতিদের উদ্দেশে প্রেরিত চিঠি-পত্র বিশ্লেষণ করে আমরা তার সমরপরিকল্পনার

একটি সাধারণ দিকনির্দেশনা খুঁজে পাই যা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্বে বর্ণনা করা যায়:

ক। এ পরিকল্পনার একটি অন্যতম দিক হচ্ছে, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনাদলের মধ্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে তারা একটি মূল নেতৃত্বের অধীনে বিভিন্ন উপদল হিসেবে একক সত্তা হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। এক দল অন্যদলের সঙ্গে মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হবে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার মিলিত হবে। এ সবই সম্ভব হয়েছে কারণ, খলীফা মদীনা থেকে নিজেই পুরো সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

খ। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমরাজ্যের রাজধানী মদীনাকে রক্ষা করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিলেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বড় বড় ও বিশিষ্ট সাহাবীদের একটি দলকে পরামর্শের জন্য তার পাশে রেখেছিলেন।

গ। খলীফা ভালো করেই জানতেন যে, মুসলিম সেনাবাহিনীর কোনো কোনো দল বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অবস্থান করছে। তার মনে এ আশঙ্কা ছিল যে, এসব মুসলমান মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। এজন্য তিনি তার সেনাপতিদের আদেশ করেন তারা যেসব এলাকা অতিক্রম করবে, সেসব এলাকার মুসলিম সেনাদের নিকট থেকে তারা যেন সাহায্য গ্রহণ করে। প্রয়োজনে সেই এলাকা রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীর একটি দলকে সেখানে রেখে যায়।

ঘ। ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাদের সামনে ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করেন। যেসব, সেনাবাহিনী বাহ্যত এমন একদিকে অভিযানে বের হয় যেখানে তাদের লক্ষ্য ভিন্ন দিকে। এভাবে শত্রুদের কাছে মূল অভিযানের লক্ষ্য অস্পষ্ট রাখা হয়। এর মাধ্যমে তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও যুদ্ধ পরিচালনায় বিচক্ষণতা ফুটে ওঠে। তাছাড়া খলীফার প্রতিটি সিদ্ধান্তই বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। এতে তার নেতৃত্বদানে গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়। আল-আসওয়াদ আল-আনাসী এবং তুলাইহা আল-আসাদীর ফিতনার মূলোৎপাটন ও মালিক ইবনে নুওয়াইরাকে হত্যা

এক। আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর নিহত হওয়ার ঘটনা ও
মুরতাদদের ইয়েমেনে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন

আল-আসওয়াদের আসল নাম আবহালাহ ইবনে কা'ব। তাকে যুল থিমার
(চেহারা আবৃতকারী) উপনামে ডাকা হতো। কেননা, সে সব সময় মাথা ও
চেহারা আবৃত করে রাখত। সে আল-আসওয়াদ আল-আনাসী নামে বেশি
পরিচিত ছিল কারণ, তার চেহারা ছিল খুবই কালো। তার শক্তির উৎস
ছিল কয়েকটি। যথা, বিরাট দেহ, প্রবল শক্তি এবং বীরত্ব। তাছাড়া সে
জাদু ও জ্যোতিষীবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে ছিল বলিষ্ঠ ও অলঙ্কারপূর্ণ
ভাষার অধিকারী। জ্যোতিষী হিসেবে মানুষকে ভেলকি দেখাত এবং
অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাত। যেসব মানুষ তার কথা শুনত, সে
তাদের অন্তর মোহাবিষ্ট করে নিজের কজায় নিতে পারত। মানুষের উপর
প্রভাববিস্তার করার জন্য সে তার সম্পদ ব্যয় করত।^{৬০}

ক। রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে আসওয়াদ আল-আনাসী

বিদায় হজ থেকে ফিরে আসার পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন আসওয়াদ আল-আনাসী
নবুওয়াতের দাবি করে। কথিত আছে যে, সে তার নাম 'রাহমানুল
ইয়েমেন' হিসেবে প্রচার করে যেমনিভাবে মুসাইলামা তার নাম 'রাহনামুল
ইয়ামামা' বলে প্রচার করেছিল।^{৬১} তবে আসওয়াদ নবুওয়াতের দাবি
করেছিল ঠিকই, কিন্তু একইসাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার কিংবা পরিত্যাগ করেনি। সে দাবি করত,
তার কাছে দু-জন ফেরেশতা অহী নিয়ে আসে। তাদের একজনের নাম

^{৬০} আসর আল-খলীফাহ আর-রাশিদিয়াহ, আল-উমারী (পৃ. ৩৬৪)।

^{৬১} আল-ইয়েমেন কী সাদরিল-ইসলাম, আস-সূজা (পৃ. ২৫৬)।

সাহীক, অপরজনের নাম শাকীক (অথবা শারীক)। সে আত্মপ্রকাশের পূর্বে নিজ কর্মকাণ্ডের সংবাদ গোপন রাখে এবং তার ভক্তদের সংঘবদ্ধ করে। অতঃপর যখন সে আত্মপ্রকাশ করে, লোকেরা চমকে ওঠে। সর্বপ্রথম তার অনুসরণ করে তার সম্প্রদায়ের যুবকরা। তার গোত্র হলো 'আনাস'। তারপর সে মাযহিজ গোত্রের নেতাদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে। আর তখনই সাধারণ লোকজন তার অনুসারী হয়। মাযহিজ গোত্রের কিছু নেতা তো তার দলে ভিড়েছিল নেতৃত্বের লোভে। তাছাড়া এতে গোত্রীয় সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাও কাজ করেছিল। কেননা, সে ছিল আনাস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যারা মূলত মাযহিজের শাখা ছিল। নাজরানবাসী হারিস ইবনে কা'ব গোত্র তার সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ করে তাকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ করে। তারা তখন মুসলমান ছিল। আসওয়াদ নাজরানে গেলে সবাই তার অনুসারী হয়ে যায়। কেননা, তাদের ইসলামগ্রহণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে ছিল না। তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে মুসলমান হয়েছিল। যুবাইদ, আওদ, মাসীলা ও সা'দ আল-আশীরার শাখা হাকাম গোত্রের কতিপয় লোক তার অনুসরণ করে। সে নাজরানে কিছুদিন অবস্থান করে। আমরা ইবনে মা'দী কারীব আয-যুবাইদী ও কায়স ইবনে মাকশূহ আল-মুরাদী যুক্ত হওয়ার পর তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। সে মুরাদ গোত্রের ফারওয়া ইবনে মাসীক ও নাজরানের আমরা ইবনে হাযমকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। আর তখনই তার মাথায় সানআ দখলের চিন্তা আসে। সুতরাং সে ছয়-সাতশত সৈন্যের একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সানআ অভিযানে বের হয়। এ বাহিনীর বেশিরভাগ লোক ছিল হারিস ইবনে কা'ব ও আনাস গোত্রের।^{৬২} সে সানআবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন সেখানকার নেতা ছিল শাহর ইবনে বাজান আল-ফারেসী। শাহর তার পিতার সঙ্গে সানআর উপকণ্ঠে 'শাউব' নামক স্থানে মুসলমান হয়েছিল।

উভয়দল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শাহর ইবনে বাজান শাহাদাতবরণ করেন। আর আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর সামনে সানআবাসী পরাজিত হয়। সুতরাং সে সানআ দখল করে নেয়। বিজয়ের পঁচিশ দিন পর সে (গামদান) প্রাসাদে অবস্থান নেয়।

^{৬২} তারিখুর রিদ্দাহ, আল-কালাদি (পৃ. ১৫১-১৫২)।

যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিল, তাদের সে অত্যন্ত নির্মমভাবে অত্যাচার করত। উদাহরণস্বরূপ, সে আন-নুমান নামে একজন মুসলমানকে বন্দী করে এবং তার শরীরের অঙ্গসমূহ একটি একটি করে কেটে নির্দয়ভাবে তাকে হত্যা করে। এরূপ পরিস্থিতির কারণে তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মুসলমানগণ কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করত না।

অবশ্য অন্যান্য মুসলমানগণ যারা তার কর্তৃত্বের বাইরে ছিল, তারা সংঘবদ্ধ হওয়ার ও সৃশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। ফরওয়া ইবনে মাসীক আল-মুরাদী ‘আল-আহসিয়াহ’ নামক স্থানে লোক জমা করে। মুসলমানদের কিছু লোক তার সঙ্গে একত্রিত হয়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসওয়াদ আল-আনাসীর খবর পত্র-মারফত প্রেরণ করে। সেই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে রাসূলকে অবহিত করে। আর মূসা আল-আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মু’আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর আশেপাশে যারা ছিল, তারা আস-সাকাসিক ও আস-সুকুনের পাশ্বেতী অঞ্চলে সমবেত হয় যা হাযারা মাওতে অবস্থিত ছিল। চিঠির প্রতিউত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের উপর অবিচল লোকদের কাছে এ বার্তা প্রেরণ করেন যে, তারা যেন মুরতাদ-ধর্মত্যাগীদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়।^{৬৩}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আরও নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন সম্মুখযুদ্ধে কিংবা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করে। তিনি হিময়ার এবং হামদানের নেতৃবৃন্দের কাছে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য চিঠি লেখেন এবং দূত প্রেরণ করেন। তাদের আদেশ করেন, তারা যেন আসওয়াদ আল-আনাসীর বিরুদ্ধে যুবক সম্প্রদায়কে সাহায্য করে। তিনি ওয়াবার ইবনে ইয়াখনাসকে ফাইরোজ দাইলামী, খুশাইমাস দাইলামী এবং দাযওয়াই আল-ইসতাখারীর কাছে প্রেরণ করেন।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালীকে হিময়ারের দু-নেতা যীকাল ও যীযালীমের কাছে প্রেরণ করেন। আল-আকরা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-

^{৬৩} তারিখুত-তারাবী, চতুর্থ খণ্ড (পৃ. ৪৯-৫০)।

হিময়ারীকে হামদানের দু-নেতা যীযাওদ ও যীমুরানের কাছে প্রেরণ করেন।

একইভাবে নাজরানে বসবাসকারী আরব ও অনারব সকলের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহানীকে তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। তিনি ইয়েমেনে থাকাবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ পান। তবে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তা তথ্যসূত্রগুলো হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে খুব সম্ভবত তাকে মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে একটি পত্র পেয়েছিলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আদেশ ছিল যে, তিনি যেন আসওয়াদ আল-আনসারীর বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত ও সংঘবদ্ধ করেন যাতে তারা তাকে দমন করতে সক্ষম হয়। যেমন, আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাহির ইবনে আবু হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু আসওয়াদ আল-আনাসীকে অতর্কিতে আক্রমণ কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে পরাস্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে পত্র পেয়েছিলেন।^{৬৪}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ পদক্ষেপের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাদের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন। তাদের কারও সম্পর্কে জানা যায়নি যে, তারা ধর্মত্যাগ করেছেন কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন। হিময়ার ও হামদানের নেতৃবৃন্দ তাদের গোত্রের যুবকদের উদ্দেশ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। সে সময়েই নাজরানবাসী আসওয়াদ আল-আনাসীর পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের আন্দোলন অথবা বিদ্রোহ মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। আর তখনই সে বুঝতে পারে যে, তার পতন আসন্ন।^{৬৫}

^{৬৪} আত-তারিখ আত-তাবারী, চতুর্থ খণ্ড (পৃ. ৫১)।

^{৬৫} আল-ইয়েমেন ফী সদরিল ইসলাম (পৃ. ২৭২)।

হামদান ও হিময়ারী নেতৃবৃন্দ ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে পত্র আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে। এতে ইয়েমেনের কতিপয় নেতৃবৃন্দও যোগদান করে। খুব সম্ভবত এরূপ কিছু পত্র আসওয়াদের সাথে যুদ্ধরত যুব সম্প্রদায় ও ফারওয়া ইবনে মাসীকের কাছে প্রেরিত হয়ে থাকবে। কারণ, আল-আসওয়াদ আল-আনাসীকে হত্যা করার ক্ষেত্রে তার বিশেষ তৎপরতা ছিল। তবে সর্বপ্রথম আমির ইবনে শাহর আল-হামদানীই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

এভাবে আসওয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইয়েমেনের সবগুলো ইসলামীশক্তি সমবেত হয়ে যায়। তারা তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। কেননা, তারা জানতেন তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলে তার অনুসারীদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তখন তাদের সাথে লড়াই করা হতে সহজেই মুক্তি পাওয়া যাবে। এজন্য তারা যুবসম্প্রদায়ের নেওয়া পরিকল্পনাকে সমর্থন জানান। তাদের পরিকল্পনা এই ছিল যে, অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রয়োগ করে তার হত্যা নিশ্চিত করতে হবে।

যুবসম্প্রদায় বিশেষত ফাইরোজ ও দাযওয়াই আল-ইসতাখারী দু-জন আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাইস ইবনে মাকশুহ আল-মুরাদীর সঙ্গে একমত হলেন যে, আল-আনাসী থেকে রেহাইয়ের একটি ব্যবস্থা নিতেই হবে। কেননা, সেনাপ্রধানের সঙ্গে আল-আনাসীর মতবিরোধ চলছিল। তার আশঙ্কা ছিল, যে কোনো মুহূর্তে আসওয়াদ তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ পর্যায়ে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আসওয়াদের ক্রীকে দলে নিল। এ মহিলা ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। আযাদ আল-ফার্সিয়া। এর আগে তিনি শাহর ইবনে বাযানের ক্রী ছিলেন। তার ঐ স্বামীকে হত্যা করার পর ইয়েমেনের মিথ্যুক আল-আসওয়াদ আল-আনাসী তাকে জোর করে নিজের অধিকারে নিয়ে বিয়ে করে। সুতরাং তিনিও তার স্বধর্ম রক্ষায় আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। এভাবে তিনি আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য মুসলমানদের নেওয়া গোপন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি অব্যর্থ কৌশল বাতলে দেন। তার শোয়ার ঘরে তাকে হত্যা করার পথকে সুগম করলেন। আর যখন আসওয়াদকে হত্যা করে তার কতিত মস্তক তার অনুসারীদের সামনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত

হয়ে পড়ে এবং এ ভীতি সবার অন্তরে বদ্ধমূল হতে থাকে। সুতরাং যে যেদিকে পারল, পালিয়ে বাঁচল।

যে রাতে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়, ঐ রাতেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানিয়ে দেন। পরদিন তিনি সাহাবীদের বললেন, 'গতরাতে আসওয়াদ আল-আনাসীকে হত্যা করা হয়েছে। এক বরকতময় পরিবারের এক বরকতময় ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে।' কেউ একজন তার নাম জানার আশ্রয় প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ফাইরোজ।'^{৬৬}

ড. সালাহ আল-খালিদী তার রচিত সূয়ার মিন জিহাদ আস-সাহাবাহ কিতাবে আসওয়াদ আল-আনাসীকে গোপনে হত্যা করার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন।^{৬৭} আসওয়াদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সানআর শাসনব্যবস্থা তিন ব্যক্তি তথা ফাইরোজ, দাযওয়াই ও কাইস ইবনে মাকশূহর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সানআয় এসে পৌছেন। তখন তারা তিনজনই তাকে আমীর হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে তিন দিনের বেশি অবস্থান করেননি। এ সময় তিনি তাদের ইমামতি করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌছে। ইতিমধ্যে সানআ থেকে আসওয়াদকে হত্যা করার বিস্তারিত বিবরণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানান হয়। তখন উসামার বাহিনী মদীনা থেকে রওনা হচ্ছিল। এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় থাকা অবস্থায় বিজয়ের প্রথম সংবাদ লাভ করেন।^{৬৮}

খ। আবু বকর রা. কর্তৃক ফাইরোজ দাইলামীকে সানআর শাসক নির্বাচন এবং এ মর্মে তার নিকট পত্র প্রেরণ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাইসকে সানআর শাসক নিযুক্ত করেননি। কারণ, সে ছিল আসওয়াদ আল-আনাসীর একজন নিকটতম ও বিশ্বস্ত

^{৬৬} তারিখুত-তাবারী (৪/৫৫)।

^{৬৭} সূয়ার মিন জিহাদ আস-সাহাবাহ, আল-খালিদী (পৃ. ২১১-২২৮)।

^{৬৮} মুহুতুল বুলদান, আল্লামা বালায়ুরী (১/১২৭)।

অনুসারী। সে আন্তরিকভাবেই তার উপর ঈমান এনেছিল। সম্ভবত সে মাযহিজ গোত্রের প্রতি তার প্রীতির কারণে এ রকম করেছিল অথবা নেতৃত্বের লোভে করেছিল। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম পদক্ষেপ ছিল ধর্মত্যাগীদের থেকে কোনো সহযোগিতা গ্রহণ না করা। তিনি দাযওয়াই, জাশীশ ও কাইস ইবনে মাকশূহকে ফাইরোজের সহযোগী সাব্যস্ত করেন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কাইস ইবনে মাকশূহ মনে মনে খারাপ ফন্দি আটল। সে এ তিন যুবককে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। প্রথমে সে দাযওয়াইকে হত্যা করতে সক্ষম হল। সে নিজেই অথবা তার ইশারায় অন্য কেউ দাযওয়াইকে হত্যা করেছিল। ফাইরোজ কাইসের এ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গেলেন। তিনি খাওলান এলাকায় তার মামার বংশের লোকদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন।^{৬৯} কাইস গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতাকে উল্লে দিল। বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের যুবকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করল এই বলে যে, তারা তোমাদের উপর স্বৈরশাসন চালাচ্ছে। তারা বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের হত্যা করবে এবং অন্যদের দেশছাড়া করবে।

কিছু গোত্রের নেতারা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করল। তারা কাইসের সঙ্গে গেল না। আবার তার যুবকদেরও সমর্থন দিল না। তারা কাইসকে বলল, 'তুমি তো তাদের সঙ্গী। তারাও তোমার দলের লোক।' কাইস তাদের ব্যাপারে হতাশ হলো। তখন আরেক কূটকৌশলে মনোনিবেশ করল। সে আসওয়াদ আল-আনাসীর অনুসারীদের নিকট চিঠি পাঠাল। তাদের কেউ কেউ সানআ ও নাজরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছিল। আবার কেউ কেউ লাহাজ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। সবাইকে সে তার অনুগতদের সঙ্গে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। যাতে সম্মিলিতভাবে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এভাবে সানআবাসী টের পাওয়ার আগেই তারা আসওয়াদের পরাজিত অবশিষ্ট বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেল। অতঃপর কাইস যুবকদের বিতাড়নের জন্য তাদের একস্থানে জড় করার চেষ্টা করল।^{৭০}

^{৬৯} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৪০)।

^{৭০} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৪০)।

ফাইরোজ দাইলামী খাওয়ানে পৌছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখল। এ পত্রে কাইসের পক্ষ থেকে যা হয়েছে, তার বিবরণ ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠি পেয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় যাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাদের নিকট দ্বিতীয়বার পত্র প্রেরণ করেন। তার চিঠির ভাষা ছিল স্পষ্ট। তা এই যে, তোমরা যুবকদের সাহায্য কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের বিরোধিতা করছে এবং তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তোমরা ফাইরোজের আনুগত্য করো। তার সাথে পূর্ণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ। কারণ, তাকে আমি শাসক নিযুক্ত করেছি।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ পদক্ষেপের মূলে দু-টি লক্ষ্য ছিল :

এক। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাওয়ার কারণে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সেটা হলো, তাদের সাথে পত্র-যোগাযোগ ও দূত প্রেরণ করা। আর উসামার বাহিনী ফিরে আসার পর অধিকতর মারাত্মক ধর্মত্যাগীদের এলাকা যথা ইয়ামামা, বাহরাইন, ওমান এবং বনু তামীমের এলাকায় বড় আকারে অভিযান পরিচালনা করতে মনস্থ করেছিলেন। এগুলো ইয়েমেনের মুরতাদদের এলাকার চেয়েও বিপজ্জনক ছিল।

দুই। যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন তাদের সুযোগ দেওয়া যাতে ইসলামের সত্যতার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বীনের ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতা বৃদ্ধি পায়।

যতক্ষণ তারা জবাবদিহিতা ও ইসলামের আমানতের ধারক থাকবে অন্যদের তুলনায় বিশেষত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গেই পত্র-যোগাযোগ করেছিলেন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তারা ইসলামের ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন এবং তাদের থেকে যা চাওয়া হয়েছিল সেটা বাস্তবায়ন করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিয়োজিত শাসক ফাইরোজ কয়েকটি গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইলেন। এসব গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বনু আকীল ইবনে রাবিআ ইবনে আমীর ইবনে

সানসান। অতঃপর তিনি একই উদ্দেশ্যে 'আক' গোত্রের কাছে দূত প্রেরণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাহির ইবনে আবু হালার এবং মাসরুক আল-আককীর কাছে পত্র প্রেরণ করেন যেন তারা যুবকদের সহায়তা করেন। আক ও আশআরীদের মধ্যবর্তী এলাকায় তাদের অবস্থান ছিল। সুতরাং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে বের হলেন। তারা কাইস ইবনে মাকশূহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার জন্য একযোগে কাজ করতে লাগলেন। তার পরিকল্পনা ছিল যুবকদের ইয়েমেন থেকে বিতাড়িত করা। সুতরাং তারা যুবকদের রক্ষা করলেন। অতঃপর জোটবদ্ধ হয়ে আনআর দিকে অগ্রসর হলেন। তারা কাইসের সঙ্গে মারাত্মক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলেন। একপর্যায়ে কাইস সানআ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। সে আসওয়াদ আন-আনাসীর অনুসারীরা যে এলাকায় ছিল, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল। এটা ছিল নাজরান, সানআ ও লাহাজের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এখানে এসে সে আমর ইবনে মাদীকারিব আযযাবিদীর সাথে যুক্ত হয়। আর এভাবে সানআতে দ্বিতীয়বারের মতো চিঠি-পত্র ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে।

গ। ভেতর থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রু দমন করার নীতি

এ নীতিটিকে ইতিহাসবিদগণ এভাবে ব্যক্ত করেন যে, যারা মুরতাদ হয়নি এবং ইসলামের উপর অবিচল ছিল, তাদের দিয়েই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করা। এভাবে খলীফার পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা ছাড়া ইয়েমেনের তিহামা অঞ্চলের মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিজয় সূচিত হয়। তিহামা অঞ্চলের যুবকগণ বিশেষ করে মাসরুক আল-আককী, যিনি তার গোত্র আক এর সাহায্যে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এর মাধ্যমে মুসলমানরা তিহামা অধিকার করেন। যারা তিহামা জয় করেন, তাদের নেতা ছিলেন তাহির ইবনে আবু হালা। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তিহামার একটি অংশের শাসক ছিলেন। সে অংশ হলো আক ও আশআরী সম্প্রদায়ের বসবাসের এলাকা।

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উকাশা ইবনে সাওরকে আদেশ করে তিহামাতে অবস্থান করার জন্য। যাতে তিনি তার চারিদিকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত লোক জমায়েত করেন। আর বাজীলা গোত্রে

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালীকে প্রেরণ করেন। তাকে এ মর্মে আদেশ করেন যে, তার গোত্রের যেসব লোক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের যেন মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তাদের নিয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। অতঃপর তিনি খাছআম গোত্রে গমন করেন এবং তাদের গোত্রের ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সুতরাং জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন এবং খলীফা তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন করলেন। খুব অল্পসংখ্যক লোকই তার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিল। তিনি তাদের নিয়েই মুরতাদদের হত্যা করেন এবং তাদের পেছনে ধাওয়া করেন।

নাজরানে অবস্থানকারী বনু হারিস ইবনে কা'ব গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আসওয়াদ আল-আনাসীর অনুগামী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পরেও তারা ধর্মত্যাগের উপর বহাল ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মাসরুট ইবনে আল-আককী বের হলেন। প্রথমে তিনি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। আর তাই মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া তার নিকট আসেন, তখন তিনি তাকে পুরো নাজরানে কর্তৃত্বকারীরূপে পেলেন। মোটকথা, খলীফার ভেতর থেকে শত্রু দমনের নীতি খুব কার্যকর হলো। উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী ফিরে আসার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন সৈন্যদল প্রেরণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন।

ঘ। ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের সৈন্যদল

এ দল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশানুযায়ী ওমানবাসী মুরতাদদের দমন করার পর মুহরা অভিযুখে অভিযান পরিচালনা করেন। ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাতশত সদস্যের একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী ছিল। ওমানের বিভিন্ন গোত্র থেকে যেসব লোকদের তিনি তার দলে টেনেছিলেন, এ সংখ্যা ছিল তার অতিরিক্ত। মুহরাতে প্রবেশ করার সময় তিনি মুহরাবাসীকে দু-নেতার অধীনে বিভক্ত দেখতে পান। তাদের একজনের নাম ছিল শিখরীত। তাদের কেন্দ্র ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলে। এ দলটি সংখ্যা ও শক্তির বিচারে দুর্বল ছিল। অপর নেতার নাম ছিল আল-মুসাব্বিহ। তার অবস্থান ছিল উঁচু ভূমির

দিকে। তার সঙ্গে ছিল অধিক সংখ্যার দলটি। ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয় দলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। উপকূলবর্তী নিম্নভূমির দলটি তার আহ্বানে সাড়া দেয়। কিন্তু অন্যজন দল ভারী থাকার কারণে অহংবোধের শিকার হয়ে যায়। সে ইসলামের প্রতি আসার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু শিখরীতকে সঙ্গে নিয়ে তার মোকাবিলা করেন। সুতরাং তারা পরাজিত হয় এবং দলনেতা ও তার বাহিনীর অনেক লোক নিহত হয়। অতঃপর ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু যাদের মধ্যে অবস্থান করতেন তাদের সংঘবদ্ধ করেন। তাদের বিভিন্ন বিষয় দেখভাল করেন এবং একপর্যায়ে তিনি তার পছন্দনীয় মত ও পথের উপর তাদের একত্রিত করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ তারা সকলে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে, ঈমান আনে এবং দ্বীনের উপর স্থির হয়ে যান।

ইতিমধ্যে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট থেকে একটি চিঠি পান। এতে খলীফা তাকে আল-মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সাথে মিলিত হতে আদেশ দেন, যিনি তখন সানআ থেকে তার নিকট আসছিলেন। তারপর মুহাজিরের বাহিনীর সঙ্গে ইকরিমা এবং তার দলবল কিন্দায় হাযরা মাউত্তের দিকে যাত্রা করবেন।

ইকরিমা মুহরা ত্যাগ করে আবয়ান এলাকায় তাঁবু গাড়েন এবং সেখানে মুহাজিরের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ইকরিমা এ মধ্যবর্তী সময়ের চমৎকার ব্যবহার করেন। তিনি নাখা এবং হামের গোত্রের লোকদের সংঘবদ্ধ করেন এবং ইসলামের উপর তাদের মজবুত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত করেন। আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর অনুসারীদেরও তিনি এ সময় নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। দু-জনের দিকে তার লক্ষ্য স্থির ছিল; আমর ইবনে মা'দী কারিব এবং কাইস ইবনে মাকশূহ। এর মধ্যে মাকশূহ ফাইরোজকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে সান'আ থেকে পলায়ন করে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে এবং সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে অপারেশন পরিচালনা করার পায়তারা করছিল। আমর ইবনে মা'দী কারিব কাছাকাছি লাহাজ এলাকায় আসওয়াদের অনুসারীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল।

যখন ইকরিমা এ এলাকায় আগমন করেন, তখন কাইস এবং আমর একসঙ্গে মিলে ইকরিমার বিরুদ্ধে সম্ভবত আক্রমণ করতে পরিকল্পনা

করে। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগেই তারা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে পৌঁছেন, তখন মুসলমানদের মিলিতশক্তি দেখে আমর ভয় পেয়ে যায়। সে দ্রুত এসে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। শীঘ্রই কাইসও তাকে অনুসরণ করে। মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জনকে বন্দী করে খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের তিরস্কার করলেন। তারপর তারা উভয়ে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং তাওবা করে আবার ইসলামে দাখিল হলো। মুসলমানদের শাসক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করল এবং সারাজীবন আনুগত থাকার ওয়াদা করল।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার অনুগত মুসলিম সেনারা লাহাজের মুরতাদদের পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মুরতাদদের অনেকে যুদ্ধও করতে সাহস করেনি; ইকরিমার বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়েই নিজেদের অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

৩। হাযরা মাউত এবং কিন্দার দিকে আল-মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়ার বাহিনীর অগ্রযাত্রা

মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মোট এগারোটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সর্বশেষে মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়ার বাহিনী মদীনা ত্যাগ করে। এ বাহিনীতে মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। শত্রুর ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অনেকেই এ বাহিনীতে যোগদান করেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কা অতিক্রমকালে খালিদ ইবনে আসাদ, মক্কার গভর্নর আস্তাব ইবনে উসাইদের ভাই এ বাহিনীতে যোগ দেন। আবার তাইফ অতিক্রমকালে আব্দুর রহমান ইবনে আবুল আস এবং আরও অনেকে এ বাহিনীর সঙ্গে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হন। আরও যারা পরবর্তীতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, উকাসাহ ইবনে সওর, ফারওয়াহ ইবনে মাইসেক আল-মুরাদী এবং মাসরুক আল-আক্কী অন্যতম।

নাযরান শহরে পৌছে মুহাজির তার বাহিনীকে দু-টি দলে বিভক্ত করেন। প্রথম দলের দায়িত্ব ছিল আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর অনুসারীদের খুঁজে বের করা এবং তাদের ধ্বংস করা। আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর অনুসারীরা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য নাযরান এবং সানআর সীমান্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে আত্মগোপন করেছিল। মুহাজির নিজেই এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন। অপর দলের নেতৃত্বে ছিল মুহাজিরের ভাই, আব্দুল্লাহ। এ দলের দায়িত্ব ছিল তিহামাহ এলাকাকে মুরতাদ সৈন্য মুক্ত করা।

সানআতে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন; তিনি পত্রে পরবর্তী নির্দেশও জানতে চান। একই সময় মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ ইবনে লুবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া ইয়েমেনের বাকি গভর্নররা, যাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োগ দিয়েছিলেন, খলীফার নিকট মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। জবাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি তাদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেন। তবে একটি শর্তারোপ করেন যে, যদি তারা মদীনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাদের অনুপস্থিতিতে যোগ্যব্যক্তিকে নিয়োগ করে আসতে হবে। তখন প্রত্যেক গভর্নরই মদীনায় ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন।

মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট থেকে ইকরিমার বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ লাভ করেন। তারপর ইকরিমার বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে হায়রা মাউতে কিন্দার দিকে যাত্রা করতে বলেন যেন যিয়াদ ইবনে লুবাইদকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয়। তখন যিয়াদ ইবনে লুবাইদের এ সাহায্য খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যিয়াদ ইবনে লুবাইদ, সত্যিকার অর্থে, মারাত্মক বিপদের মধ্যে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাকে হায়রা মাউতে কিন্দার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে একই পদে পুনর্নিয়োগ দেন। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এককথায় অসাধারণ

দৃঢ়তাসম্পন্ন নেতা। তার এই দৃঢ়তার জন্যই হারিসাহ ইবনে সুরাকাহ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তবে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, হারিসাহর এ আচরণের পেছনে ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ ছিল।

সংঘর্ষ শুরু হলো। সচরাচর যেভাবে শুরু হয় আর কি! সামান্য একটি বিষয় নিয়ে এর সূত্রপাত। যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গনীমতের মাল বিতরণের সময় কিন্দার এক যুবককে ভুলে একটি উট প্রদান করেন। ঐ যুবক উটটির পরিবর্তে অন্য আরেকটি উট দিতে অনুরোধ করে। যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ যুবক তখন কিন্দার এক স্থানীয় নেতার কাছে যায় যার নাম ছিল হারিসাহ ইবনে সুরাকাহ এবং তার সাহায্য আশা করে। যুবকের পক্ষ নিয়ে হারিসাহ যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে উটটি পরিবর্তন করে দিতে বলে। কিন্তু যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিবর্তন করে না দেওয়ার ব্যাপারে অনড় থাকে।

হারিসাহ তখন ভীষণ রেগে যায়। হারিসাহ এবং যিয়াদের অনুসারীদের মধ্যে একটি উত্তেজনা কাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে যুদ্ধ শুরু হয়। হারিসাহ এবং তার লোকজন পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে কিন্দার আগের চার রাজাই নিহত হয়।

যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হারিসাহর অনেক অনুসারীদের বন্দী করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের মদীনায়ে প্রেরণ করেন। যা হোক, পশ্চিমধ্যে তারা আশআস ইবনে কাইসের সাক্ষাৎ পায় এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। মূলত গোত্রপ্রীতির কারণে আশআস তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং যত অধিকসংখ্যক সম্ভব নিজের অনুসারীদের নিয়ে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ মুসলমানদের বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলে।^{৭১}

যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দুর্দশার কথা কোনো রকমে মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করতে

^{৭১} আল-কাযিল ফিত-তারিখ (২/৪৯); আস-সাবিতুন আলাল-ইসলাম (পৃ. ৬৬)।

সক্ষম হন। এ দু-জন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশক্রমে ইতিমধ্যে তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তবে যিয়াদের আসন্ন বিপদ জানতে পেয়ে তারা খুব দ্রুত তাদের মিশনে এগুতে থাকে। মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, তারা যদি তাদের বর্তমান গতিতে এগুতে থাকেন, তাহলে হয়তো যিয়াদ ও তার লোকজনকে বাঁচাতে সময়মতো পৌঁছতে পারবেন না। এজন্য তিনি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অর্পণ করে অশ্বারোহীর একটি সুসংগঠিত দল নিয়ে ক্ষিপগতিতে যাত্রা শুরু করেন। সময় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এজন্য মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ সিদ্ধান্ত খুবই ফলপ্রসূ ছিল। তিনি সংঘর্ষ কবলিত এলাকায় সময়মতোই পৌঁছান এবং অবরোধ ভেঙ্গে যিয়াদ ও তার লোকজনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। আর আশআস এবং কিন্দা গোত্রের তার অনুসারীরা রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নজীর নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন মুসলমানদের আক্রমণে অবরোধকারীরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। দুর্গের প্রবেশপথ ছিল তিনটি। তন্মধ্যে যিয়াদ এবং মুহাজির দু-টি পথ পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। আরেকটি পথ ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু আসার আগ পর্যন্ত উন্মুক্তই ছিল। পরে তিনি এ পথের পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এভাবে আশআস ও সঙ্গীদের চারদিক থেকেই অবরোধ করে ফেলা হয়।

মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু কিন্দায় পৌঁছেই সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্দাগোত্রের অনেক উপগোত্র এ এলাকার সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে যারা ইসলামগ্রহণ করতে রাজি হয়নি, মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান সৈন্যদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। ঐ মিশন শেষ হওয়ার পর এখন শুধু কিন্দার প্রধান গোত্রই বাকি ছিল যারা ইতিমধ্যে নজীর দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তাদের বাঁচার কোনো আশা ছিল না। কারণ, মুহাজির এবং যিয়াদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি। আর তাদের মধ্যে অনেক মুহাজির ও আনসার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। অবরোধ ধীরে ধীরে কার্যকর করা হচ্ছিল যাতে কিন্দা গোত্রের সদস্যরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তা-ই হলো। সব ধরনের রসদ সরবরাহ বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে একপর্যায়ে কিন্দার লোকজন তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিষোদগার

শুরু করল। তারা এভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় না মরে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করতে চাইল।

দুর্গের নেতারা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করার শর্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্য আশআসকে বাইরে পাঠাতে রাজি হলো। তারা এ কাজে একজন ভুল মানুষকে নির্বাচন করেছিল যদিও তারা এর পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানত না। অনেক বর্ণনায় এসেছে, আশআস দুর্গ থেকে বের হয়ে সবার জন্য প্রাণভিক্ষা না চেয়ে কেবল গুটিকয়েক লোকের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সম্ভবত সে দুর্গের সকলের জীবনরক্ষার চেষ্টা করেনি অথবা একবারে সকলের জীবনরক্ষা পাবে এ আশা করেনি। যা হোক, মুসলিম নেতারা তার কথায় রাজি হয়। আশআসের তালিকা অনুযায়ী সাত থেকে দশজনের একটি ক্ষুদ্রদলকে নিরাপত্তা দিলে দুর্গের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রায় সাতশত লোক ছিল। ধর্মত্যাগ ও যিযাদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের কারণে সবাইকে হত্যা করা হয়।^{৭২} ঐতিহাসিকগণ তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ইহুদীগোত্র বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্দা শহর থেকে ধর্মত্যাগীরা সমূলে ধ্বংস হয়। তাদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকেনি। ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত সংঘর্ষে বন্দীদের ও গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল নিয়ে মদীনার দিকে রওনা হন। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল আশআস ইবনে কাইস। বন্দিনী মহিলারা তাকে বিদ্রোপ করতে লাগল। তারা তার ব্যাপারে ভীষণ রেগে ছিল। কারণ, মুসলমানদের সঙ্গে দুর্গ থেকে মুক্তির শর্তসমূহ আলোচনার জন্য গেলে সে প্রথম তার জ্ঞানের নিরাপত্তা আদায় করে। বন্দিনী মহিলারা তাকে এত বেশি তিরস্কার করতে থাকে যে, তারা তাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে ডাকতে থাকে।^{৭৩}

মদীনায় পৌছামাত্র আশআসকে খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাজির করা হলো। তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি যা করেছ, এর বিনিময়ে আমার নিকট কীরূপ ব্যবহার আশা কর?’ আশআস বলল, ‘আমি

^{৭২} আল-ইয়েমেন কী সাদরিল-ইসলাম (পৃ. ২৮৬); তারিখ আর-রিক্দা (পৃ. ১৮৬)।

^{৭৩} হারকাতুল-রিক্দা, আল-আতুম (পৃ. ১০৭)।

আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমার শেকল খুলে দেবেন এবং আমার জীবন-সঙ্গিনী আপনার ভগ্নিকে আমার কাছে অর্পণ করবেন। কারণ, আমি তাওবা করেছি এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছি।’ এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভগ্নিকে জীবন-সঙ্গিনী বলার কারণ এই যে, মাস অথবা বছরখানেক আগে সে তার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভগ্নির নাম ছিল উম্মে ফররওয়াহ বিনতে আবু কুহাফা। ঐ সময় সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উম্মে ফাওয়াহর সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেন এবং আবার মদীনায়া ফিরে আসার পর জীকে নিয়ে যেতে বলা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সে উপরে বর্ণিত অঘটন ঘটায়।

আশআসের এ ক্ষমাপ্রার্থনার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।’ তারপর নিজের ভগ্নিকেও তার হাতে সমর্পণ করলেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদার কথা মনে রেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া সে গুরুতর অপরাধ করার পর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছে এবং ইসলামে ফিরে এসেছে। ইরাক বিজয়ের আগ পর্যন্ত আশআস মদীনায়াই অবস্থান করে।^{৭৪}

আরেক বর্ণনায় এসেছে, যখন আশআস আশঙ্কা করল যে, তাকে হয়তো ক্ষমা করা হবে না, তখন সে বলল, ‘আমার ব্যাপারে চিন্তা করুন, আমাকে ছেড়ে দিন, ক্ষমা করুন, আমার ইসলাম গ্রহণকে বিশ্বাস করুন এবং আমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহারই করুন যে রূপ ব্যবহার আমার সমপর্যায়ের ব্যক্তির সঙ্গে করে থাকেন। আমার জীবন-সঙ্গিনী আপনার ভগ্নিকেও আমার সঙ্গে যেতে দিন। আমি অতঃপর আর কোনদিন ইসলামের কোনো প্রকার বিরোধিতা করব না।’ অনেক চিন্তার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজের ভগ্নিকেও তার হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর বললেন, ‘নিজের দেশে চলে যাও। আর কোনদিন যেন তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গুনতে না পাই।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য বন্দীদেরও মুক্ত করে দিলেন (কারণ, তারা তাওবা করে ইসলামে ফিরে এসেছে) এবং যুদ্ধের গণীমতের মাঝে এক পঞ্চমাংশ (যা ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়ে এসেছিলেন) লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।^{৭৫}

শিক্ষা ও উপদেশ

ইয়েমেনের মহিলাগণ

ইয়েমেনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে মহিলাদের দ্বিমুখী আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমত, এসব মহিলারা যারা পবিত্র ও ধার্মিক এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অধিকন্তু তারা মুসলমানদের সার্বভৌমিক নিরাপত্তার জন্য বিশাল হুমকিকে পরাজিত করতে সহায়তা করে। আমি এখানে বিশেষ করে শাহর ইবনে বাদহান রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী এবং এবং ফাইরোজ আল-ফারিসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো বোন আযাদ আল-ফারিসিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহা'র কথা উল্লেখ করছি। তিনি একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং উক্ত পরিস্থিতিতে ইসলামের সেবায় কাজে লাগাতে সক্ষম হন। একজন বন্দিনীকে জোর করে বিয়ে করতে গেলে মুসলমানদের সাহসী কিছু যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা সরাসরি আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর শোবার ঘরে গিয়ে আক্রমণ করে বলে। সেখানে তাকে হত্যা করে মুরতাদদের অব্যাহত শয়তানীর সমাপ্তি টানেন।

আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের খেদমত করার অদম্য ইচ্ছার জন্যই অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকগণ আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা'র এ কাজের পেছনে অজ্ঞানতাবশত অথবা শয়তানী করে দেশাত্মবোধের কথা বলে। ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকেল এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি লেখেন, ‘আসওয়াদের পার্সিয়ান স্ত্রী জানতেন যে, আসওয়াদ বিশ্বাস করত পার্সিয়ানরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। স্বদেশের

লোকজনকে হত্যা করার কারণে তার স্ত্রীর ধমনিতে প্রতিশোধের স্পৃহা বদ্ধমূল ছিল এবং সে আসওয়াদকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করত যে কিনা তার ভালোবাসার পাত্রকে খুন করেছিল। মেয়েলি চাতুর্যের কারণে সে তার এই ঘৃণাকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং ভালো আচরণ করে সে তার উপর আসওয়াদের বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলেছিল।^{৭৬}

এসব কথা চটকদার উপন্যাসের মতোই লাগে যা কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। ড. হাইকেলের কথা শুনে মনে হয়, আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পার্সিয়ান গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন যেন তা এক সম্রাসী আরব লুণ্ঠন করেছে এবং তাকে জোর করে বিয়ে করেছে। বাস্তব কথা হচ্ছে, আরব এবং পার্সিয়ানদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা আসওয়াদকে ঘৃণা করেনি, বরং তিনি ঐ সংঘর্ষের একজন আদর্শ সৈনিক ছিলেন যা কিনা মুসলমান এবং যুরতাদদের মধ্যে সংগঠিত হচ্ছিল। ড. হাইকেল যদি সত্যিকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি পড়ার মতো ধৈর্য অবলম্বন করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে কীভাবে আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা আসওয়াদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণার কারণ বর্ণনা করেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আমার কাছে আসওয়াদের চেয়ে ঘৃণ্য কোনো ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেননি। সে তার জীবদ্দশায় আল্লাহর কোনো হুক পূরণ করেনি এবং এমন কোনো শয়তানী কাজ ছিল না যা সে করেনি।’^{৭৭}

সুতরাং এটা পরিকারভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও ঈমানের কারণেই যুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি আসওয়াদকে ঘৃণা করতেন; কারণ সে ছিল একজন চরম মিথ্যুক এবং ইসলামের শত্রু। অধিকন্তু সে ছিল তার স্বামীর হত্যাকারী। এ হিসেবেও তাকে ঘৃণা করার অবকাশ রয়েছে। তবে কখনোই আরব হওয়ার জন্য তার এই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। ড. হাইকেল আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহার দীনের প্রতি ভালোবাসাকে উচ্চকিত করে তুলে ধরতে পারতেন, কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই তার চরিত্রের প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন।

^{৭৬} আস-সিক্কিআরু বকর (পৃ. ৭৯)।

^{৭৭} আল-কামিল ফিত-তারিখ (২/৩১০)।

আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তার সমসাময়িক সকল মুসলিম নারী, যারা তাদের সর্বস্ব ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যান।

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ : এটি আযাদ রাযিয়াল্লাহু আনহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে এখানে কেবল একজন মহিলা নন, মহিলাদের একটি দল। আমি এখানে ইয়েমেনের একদল যুবতী এবং দুষ্টপ্রকৃতির মহিলাদের কথা বলতে চাচ্ছি যাদের অনেকে ছিল ইহুদী এবং বাকিরা ধর্মত্যাগী। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পেয়ে কয়েক রাত ধরে গান-বাজনা ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকে এবং তাদের শরীকদের সঙ্গে জঘন্য সব অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। উহুদ যুদ্ধে মুশরিক মহিলাদের মতো তারা অশ্লীল গান গেয়ে তারা মুরতাদদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উজ্জীবিত করতে থাকে। এরাই ঐসব মহিলা যারা জাহিলিয়াতের যুগে অশ্লীল কর্মকাণ্ড করতে পছন্দ করত। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের আবির্ভাবের পর অনেকটা বাধ্য হয়েই ইসলামের পবিত্র জীবনে প্রবেশ করেছিল। এ সময়ের পুরোটাই তারা নিজেদের শৃঙ্খলে বন্দী মনে করত। সুতরাং যখনই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পেল, তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং ইসলামের ব্যাপারে তাদের মনের সুপ্ত ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল। হাতে হেনা মেখে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবরকে উদযাপন করছিল।

এ ধরনের মহিলার সংখ্যা ছিল তেইশ থেকে উনত্রিশজন। আরব সমাজের উঁচু শ্রেণি এবং স্থানীয় ইহুদীদের মধ্যে তারা ধর্মত্যাগের প্রচার করতে থাকে। এই দুই শ্রেণিই আরব উপত্যকা থেকে ইসলামের বিনাশ কামনা করছিল। এসব মহিলাদের মধ্যে অন্যতম ছিল হার বিনতে ইয়ামিন। সে এত জঘন্য অশ্লীল চরিত্রের মহিলা ছিল যে, তার নামে একটি আরব প্রবাদবাক্য রচিত হয়, ‘হারই শ্রেষ্ঠ হুর।’

এই মহিলার সংবাদ জানতে পেরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গভর্নর মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি পত্র

প্রেরণ করেন। এ পত্রে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘আমার এ পত্র পেয়েই ঐ মহিলাদের নিকট যাবে...এবং তাদের হাত কেটে দিবে। যদি কেউ তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তবে তাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এ শাস্তির যৌক্তিকতা বোঝাবে। তাকে এটা বোঝাতে হবে যে, সে কত মারাত্মক অপরাধ করছে (মহিলাদের শাস্তি প্রদানে বাধা দিয়ে)। যদি সে ফিরে যায়, তাহলে তার কোনো ক্ষতি কর না। আর যদি বাধা দেয়, তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর...।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন, তা মূলত হাইওয়েতে ছিনতাইকারী এবং যারা দেশ ও জাতির জন্য হুমকী, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলোচ্য মহিলাও মুসলমান সমাজের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠেছিল। তার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন, তবে তা ছিল আরও বিপজ্জনক।

চিঠি পেয়ে মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু নিকটস্থ সব অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদের একত্রিত করে ঐ শয়তান মহিলার দিকে রওনা হলেন। কিন্দা এবং হাযরা মাউত গোত্রের একদল লোক অপরাধী মহিলা এবং মুহাজিরের বাহিনীর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিকট বিষয়টি যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেন। অনেকই তার কথা শুনে পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু কিছু লোক লড়াই করতে উদ্যত হয়। এসব লোকদের খুব দ্রুত পরাজিত করে পাপিষ্ঠ মহিলার হাত-দু’টো কেটে ফেলা হয়। এ ঘটনায় কিছুলোক মৃত্যুবরণ করে এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। আর এভাবে তারা শয়তানী কর্মকাণ্ডের জন্য শাস্তি পায় এবং পরবর্তীদের জন্য একটি উত্তম উদাহরণ তৈরি হয়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারেন যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পেয়ে বিদ্রোপাত্মক গান গেয়ে রাসূলকে অপমান করেছে। তাকে আরও জানান হয় যে, ইতিমধ্যে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাযরা মাউতের গভর্নর মুহাজির ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলার হাত কেটে এবং সামনের দাঁত উপড়িয়ে শাস্তি দিয়েছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আবার চিঠি লেখেন যে, যদিও এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে,

তথাপি তিনি মনে করেন যে, মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু এ শান্তি প্রদানে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন যে, যদি ঐ মহিলা মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে গেছে যা আরও বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর যদি সে অমুসলিম হয় যে কিনা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করছে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সে কেবল মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠার অপরাধে অপরাধী নয়, বরং সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দু'দিক থেকেই সে একজন মারাত্মক অপরাধী। এজন্য তাকে মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহু সে শান্তি দিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়, তার শান্তি হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুদণ্ড।^{৭৮}

হৃদয়গ্রাহী ভাষণসমূহ

তরবারি, বর্শা, তীর—মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই তিনটি অস্ত্রই কেবল মুসলমানদের একমাত্র অবলম্বন ছিল না। অনেক মুসলমান জীবন বাজি রেখে তাদের জিহ্বাকে ব্যবহার করেছেন—অপূর্ব সব বক্তব্য দিয়েছেন। তাদের মনে একটাই আশা ছিল, হয়তো এই উসিলায় অনেক ইসলাম ধর্মত্যাগী ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে স্বধর্মে ফিরে আসবে। মুরতাদরা যেখানে আধিপত্য বিস্তার করছিল, সেখানে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মুরতাদদের বিরুদ্ধে কথা বলা কোনো সহজ বিষয় ছিল না। এতে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তথাপি যারা এ সত্য প্রচারে উন্মুখ ছিল, তারা মনে করত যে, জীবন বাঁচানোর চেয়ে এসব মুরতাদরা আরও বেশি বিপজ্জনক। কারণ মুরতাদরা যদি তাওবা না করে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে নিপতিত হয়ে। আর যেসব মুসলমান এ রকম প্রকাশ্যভাবে ইসলামের সত্য প্রচার করত, তারা চাইত না যে তাদের প্রতিবেশী, দেশের জনগণ এবং আত্মীয়-স্বজন জাহান্নামে যাক।

এক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মিরান ইবনে যী উমাইর আল-হামদানী। তিনি ইয়েমেনের একজন বাদশা ছিলেন। তার অধীনস্থ লোকজন যখন

^{৭৮} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৫৭)।

প্রকাশ্যে মুরতাদ হয়ে গেল এবং চরম বোকাদের একজন জনসম্মুখে ইসলামের বিরুদ্ধে বিমোদগার করল, তখন তিনি তাদের সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য দেন,

হে হামদানের জনগণ! তোমরা কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনি এবং তিনিও কখনও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। তারপরেও তার মাধ্যমে তোমরা উন্নতি ও নিরাপত্তা অর্জন করেছ। তোমরা অভিশপ্ত জাতি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছ (যদি তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে)...তোমাদের আগে অনেকেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার অনেকের আগে তোমরা ইসলামে প্রবেশ করেছ। তোমরা যদি শক্ত করে ইসলামকে অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা—আগে যারা চলে গিয়েছেন—তাদের দলভুক্ত হবে। আর যদি তোমরা ইসলাম ত্যাগ কর, তাহলে তোমাদের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তোমাদের ধরে ফেলবে (তাদের অস্ত্র দিয়ে এবং তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত করবে)।

শ্রোতারা মিরানের সত্যভাষণ শুনে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আবার ফিরে আসে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক আল-আরহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুও একইভাবে তার লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন; তিনি একজন মুহাজির ছিলেন এবং অনেক মহান গুণের জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন। যখন হামদান গোত্রের লোকজন তার চারদিকে জমা হলো, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘হে হামদানের লোকজন! তোমরা অবশ্যই মুহাম্মাদের ইবাদত করনি। বরং তার রবের ইবাদত করেছ যিনি চিরজীব এবং যার কোনো মৃত্যু নেই। তারপরেও তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলে, আর সেটা ছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণেই। মনে রেখ, তিনি তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন...।’ এভাবে তিনি এক দীর্ঘ এবং হৃদয়কাড়া ভাষণ দান করেন।

একইভাবে কিন্দা গোত্রের বনু মুআবিয়াহ বংশের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে শুরাহবিল ইবনে আস-সিমত এবং তার ছেলে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

এটা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেই যখন তার বংশের সবাই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। শুরাহবিল এবং তার ছেলে বক্তব্যে বলেন, ‘একটি মহৎ এবং স্বাধীন জাতির জন্য নিজেদের মতকে পরিবর্তন করা খুবই অশোভনীয় কাজ। বস্তুত মহৎ লোকেরা দুর্বোধ্য বিষয়ে খুবই দৃঢ় থাকে এবং এর থেকে বোধগম্য বিষয়েও মত পরিবর্তন করতে চায় না। তারা এ পরিবর্তনে আশঙ্কা করে যে, হয়তো তাদের উপর অপমান আপত্তি হবে। তাহলে তাদের ব্যাপারে কি হবে যারা ভালো, মহান, সুন্দর এবং সত্য ত্যাগ করে মিথ্যা ও ভণ্ডামিকে স্বাগত জানায়!’

যুগ্মদের কারামত

ইংরেজি ভাষায় একটি শব্দ রয়েছে যা দিয়ে এমন কোনো ঘটনা বিবৃত করা হয় যাতে মানুষের কোনো হাত নেই এবং তা সরাসরি মহান আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়; সেই শব্দটি হচ্ছে ‘মিরাকেল’ (Miracle)। কিন্তু আরবীতে এ শব্দটি এ ধরনের ঘটনা বর্ণনায় যথেষ্ট হয়ে ওঠে না। কারণ, এটি দু-টি ব্যতিক্রমধর্মী ‘আশ্চর্যজনক ঘটনাবলিকে’ আলাদা করতে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে আরবীতে দু-টি শব্দ ব্যবহৃত হয়; মুজাজ্জা এবং কারামত। প্রথম শব্দটি কেবল নবী-রাসূলদের বেলায় ঘটে। যদি আল্লাহর ইচ্ছায় নবীদের মাধ্যমে মানুষের বোধগম্যের বাইরে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, তাহলে সেটা তার সত্যবাদিতার নিদর্শন। আর যদি এ রকম কোনো ঘটনা কোনো নেককার বান্দার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তাহলে তাতে নবুওয়াত প্রমাণিত হয় না, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর করুণা বর্ষণ করে তার ঈমানকে বৃদ্ধি করেন, তার নেক আমলের জন্য পুরস্কৃত করেন ইত্যাদি। এ ধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনাকে কারামত বলা হয়। সুতরাং কারামত ‘মুজাজ্জা’ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা।

যা হোক, আল-আসওয়াদ আল-আনাসীর সময় একটি কারামত সংঘটিত হয়। ইয়েমেনে আসওয়াদ যখন উল্লেখযোগ্য অনুসারী তৈরি করতে সক্ষম হয়, তখন সে আবু মুসলিম আল-খাওলানী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠায়। যখন আবু মুসলিম এসে হাজির হন, তখন তাকে আসওয়াদ

রাগত্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’ আবু মুসলিম জবাব দিলেন, ‘আমি শুনতে পাচ্ছি না।’ আসওয়াদ আবার জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?’ এবার আবু মুসলিম জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ।’ আসওয়াদ বারবার এই দু-টি প্রশ্ন করে এবং আবু মুসলিম প্রতিবারই একই জবাব দেন। আসওয়াদ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আবু মুসলিমকে উত্তপ্ত আগুনের কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়।

কিছু লোক এ দৃশ্য দেখার জন্য জড় হয়েছিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আগুন আবু মুসলিমের সামান্যতম কোনো ক্ষতি কিংবা পোড়াতে সক্ষম হয়নি। কেউ কেউ আসওয়াদকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে উপদেশ দিল, ‘এই ব্যক্তিকে এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও। যদি সে এখানে থাকে তাহলে লোকজন তোমার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।’ আসওয়াদ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আবু মুসলিমকে ইয়েমেন থেকে চলে যেতে আদেশ দেয়।

আবু মুসলিম রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার দিকে রওনা হন। তবে তিনি মদীনায় পৌঁছার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে খলীফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আবু মুসলিম রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের দরজায় বাহনকে বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আগন্তুককে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি কোথেকে এসেছ?’ আবু মুসলিম বিনীতভাবে জবাব দিলেন, ‘আমি ইয়েমেন অধিবাসী।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসলিমের ঘটনা শুনেছেন, কিন্তু তাকে কখনও দেখেননি। এজন্য তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ঐ লোকের কি অবস্থা হয়েছিল যাকে মিথ্যুক আসওয়াদ আগুনে পুড়ে মারতে চেয়েছিল?’ আবু মুসলিম জবাব দিলেন, ‘ঐ লোকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সওব।’ তিনি কুনিয়াত ব্যবহার করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধীশক্তি ছিল অনেক বেশি এবং মানুষকে ভালো বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতেন। এজন্য তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,

‘আল্লাহর কসম করে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ঐ মানুষটি কি তুমি?’ আবু মুসলিম মিথ্যা বলতে পারলেন না। তিনি খুব সাধারণভাবে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কেঁদে ফেললেন। তারপর তাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং নিজের মাঝখানে বসালেন। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যু দেননি, উম্মতে মুহাম্মাদির ঐ ব্যক্তিকে না দেখিয়ে যার সঙ্গে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মতো আচরণ করা হয়েছে।’^{৭৯}

আবু মুসলিম আল্লাহর নাযিলকৃত সব বিধি-বিধান মেনে চলতেন; তিনি আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসতেন; তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করতেন; এবং তিনি জাগতিক সকল বিষয়ের ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেছিলেন। এসব চমৎকার সব নেক গুণের জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে এই আশ্চর্যজনক কারামতে ভূষিত করেন যা কিনা তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বেলায় সংঘটিত করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

الْآنَ اُولِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٨﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٠٩﴾ لَهُمْ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٠﴾

মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তাশ্রিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে—তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনও হের-ফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।^{৮০}

আবু বকর রা.-এর ধৈর্য এবং বিনয়

কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেবল রক্তক্ষয় হয়েছে এবং অনেক লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সত্যিকার

^{৭৯} আসাদুল-গাবা (৬/৩০৪); আল-ইসতিয়াব (৪/১৭৫৮)।

^{৮০} সূরা আল-ইউনুস, ১০:৬২-৬৪।

পর্ব হচ্ছে শান্তি এবং পুনর্মিলন, যা কিনা যুদ্ধ শেষে শত্রুর মন-মেজাজ জয় করার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আরব অঞ্চল থেকে ধর্মত্যাগীদের সমূলে বিনাশ করা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর বিবাদ-বিসংবাদ ছড়িয়েছে যা অপ্রত্যাশিত ছিল না—কিন্তু একবার তা নির্মূল হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এটা নিশ্চিত করা জরুরি ছিল যে, তা যেন আবার মাথাচারা দিয়ে না উঠতে পারে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থেই তার সকল কর্মকাণ্ডে একজন বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ছিলেন। এজন্য যখন মুরতাদদের অশুভ শক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল, তখন তিনি সেটাকে দ্রুত এবং শক্তহাতে দমন করেছেন। আবার একই সময় যখন দয়া, অনুগ্রহ এবং ধৈর্য ও নমনীয়তার প্রয়োজন হয়েছে, তখন তিনি এসব গুণ প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করেননি, বরং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামে ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এসব গুণের প্রয়োজনও ছিল। এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। কারণ, যদিও আরবরা ভাষা এবং সংস্কৃতিতে এক জাতি ছিল, কিন্তু বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত ছিল এবং তাদের নিকট যে কোনো কিছু থেকে গোত্রগত আদর্শের মূল্য ছিল অনেক বেশি।

আরব উপত্যকার বিভিন্ন গোত্রপতিদের অন্তর নরম করার জন্য যখন তারা ইসলামে ফিরে আসে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করেছেন যা দু-টি উদ্দেশ্য লাভের জন্য জরুরি ছিল: মুরতাদদের মুসলিম জাতির শক্তি, সাহস এবং দৃঢ়তা দেখানো এবং মুরতাদদের পরিকার জানিয়ে দেওয়া যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাদের উচিত হয়নি এবং ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক। যা হোক, যখন বিভিন্ন গোত্রপতিরা ইসলামের ছায়াতলে আবার ফিরে এল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শক্তির পরিবর্তে ক্ষমা, আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ধৈর্য এবং কঠোরতার পরিবর্তে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

গোত্রের সর্দারদের শাস্ত করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিজ নিজ গোত্রের সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ

দিয়েছিলেন। বস্তুত তাদের আনুগত্য এবং নেতা হিসেবে অন্যের উপর
 প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থেই ব্যবহৃত
 হয়েছে।^{১১} যেসব গোত্রের সর্দাররা ধর্মত্যাগ করেছিল, তাদের মধ্যে
 অনেকের গুরুত্বপূর্ণ সব যোগ্যতা ছিল। এসব যোগ্যতাকে সঠিকভাবে
 ব্যবহার করা সম্ভব হলে মুসলিম জাতির অনেক উপকার সাধিত হতো।
 উদাহরণস্বরূপ, আমর ইবনে মা'দীকারিব এবং কাইস ইবনে ইয়াগহুস
 আল-মুরাদীর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এ দু-জন তাদের গোত্রের
 নিকট কেবল প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়ই ছিল না, রণক্ষেত্রেও তারা প্রচণ্ড
 সাহসী এবং দৃঢ় ছিল। ইসলাম থেকে দূরে না সরিয়ে আবু বকর
 রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম ও
 কুফরের মধ্যে দোদুল্যমান থাকার কোনো মানে হয় না এবং ইসলামের
 প্রতি একনিষ্ঠতাই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার মূল চাবিকাঠি।
 আমর ইবনে মা'দীকারিবকে বন্দী করে মদীনায় আনা হলে আবু বকর
 রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি প্রত্যহ
 হয়তো বন্দী হও অথবা পরাজিত হও। আর যদি তুমি এই দ্বীনে ইসলামের
 সাহায্য করতে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান
 করতেন।' আমর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি সত্য বলেছেন। আমি
 এবারে এমনভাবে ইসলামগ্রহণ করব যে, জীবনে আর কখনও ত্যাগ করব
 না।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আমরকে মুক্ত করে দেন যা ছিল
 একটি বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত এবং ইসলামের জন্য খুব উপকারী। আমর রহ. তার
 এ ওয়াদার উপর দৃঢ় ছিলেন এবং আর কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করেননি;
 আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি এমন একজন ভালো এবং নেককার
 মুসলমানে রূপান্তরিত হয়েছিলেন যে কিনা ইসলামের উন্নতিতে সাহায্য-
 সহযোগিতা করেছিলেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ
 বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

নিজের কৃতকর্মের জন্য কায়েসও খুব অনুতপ্ত ছিল। আবু বকর
 রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকেও ক্ষমা এবং মুক্ত করে দেন। কায়েস এবং আমর
 উভয়ের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে নমনীয়তা প্রদর্শন
 করেছিলেন, তার প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়েনি, বরং তাদের

^{১১} তারিখ আদ-দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম (পৃ. ২৫৬)।

গোত্রের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যেই তা প্রভাব ফেলে। গোত্রের লোকেরা তাদের নেতাদের প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুগ্রহ ও নমনীয়তা দেখে এ কথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতে সমর্থ হয় যে, ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন পরাজিত করেছেন, তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের অন্তঃকরণও জয় করেছিলেন এবং ইসলামের বিশালত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তারা পরবর্তীতে মুসলমানদের পক্ষে নতুন ভূখণ্ড বিজয়ের অভিযানে সামনের কাতারে থেকে যুদ্ধ করেছেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই নতুন বিজিত ভূখণ্ডের জনগণের অন্তঃকরণও জয় করার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের ইসলামে ছায়ায় সামিল করেছেন।^{৮২}

ইকরিমা রা.-এর প্রতি আবু বকর রা.-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বনু হানিফার এলাকায় প্রেরণ করেন। মুসাইলামার সামরিকশক্তির কথা বিবেচনা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর চিন্তা করলেন। এজন্য তিনি শুরাহবিল ইবনে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ইকরিমার বাহিনীর সাথে মিলিত হতে আদেশ দিলেন। বনু হানিফার এলাকায় প্রবেশ করার পর ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু শুরাহবিলের বাহিনী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। মুসাইলামার সামরিকশক্তি সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা পুরোপুরি সঠিক ছিল। ফলে ইকরিমার বাহিনী মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং মুসলমানদের অনেকে নিহত হয়।

পরবর্তী কালে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এবং তিনি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা জানিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পত্র প্রেরণ করেন; চিঠির ভাষায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পশ্চাতপসরণ করতে চান এবং আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে

^{৮২} তারিখ আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম (পৃ. ২৫৬)।

অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করতে আগ্রহী। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চিঠির জবাবে তাকে পশ্চাতপসরণ করতে নিষেধ করেন : ‘পশ্চাতে ফিরে এস না। তাহলে লোকেরা (মুসলিম সামরিক বাহিনী) দুর্বল হয়ে পড়বে (মানসিকভাবে)।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আসন্ন বিভিন্ন অভিযানের বিস্তারিত পরিকল্পনা লিখে পাঠান। তিনি বলেন যে, তাকে হুযাইফা এবং আযাফাহর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে হয়ে। তাদের সঙ্গে নিয়ে উম্মান এবং মাহরাহর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সবশেষে মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়ার বাহিনীর সঙ্গে ইয়েমেন এবং হাযরা মাউতে মিলিত হতে হবে।^{৮৩} সংক্ষেপে এই ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠির ভাষ্য।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, ধর্মত্যাগী গোত্রের প্রতি সেনাবাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দু-টি বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এখান থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি ধর্মত্যাগী গোত্রের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানতেন। আবার ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন অতিরিক্ত সৈন্য না আসা পর্যন্ত পশ্চাতপসরণ করতে চাইলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। এখানেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সামরিক দীর্ঘশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, তিনি সৈন্যদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। ভালো অথবা খারাপ মনোবল—উভয়েই যুদ্ধের ফলাফলে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। যদি ইকরিমার বাহিনী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পশ্চাতে ফিরে যেত, আর তখন নতুন বাহিনী যারা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এসে মিলিত হত, তারপর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, নিশ্চিতভাবেই দলের প্রতিটি সদস্যদের মনে দুর্বলতা, ভয়-ভীতি কাজ করত—বিশেষ করে ইকরিমার বাহিনীর অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং মুসাইলামার সামরিক শক্তিমত্তার কথা জানতে পেরে।^{৮৪}

^{৮৩} আল-ফাযিল ফিত-তারিখ (২/৩৪); আল-বিসায়া ওয়াদ-মিহায়া (৬/৩৩৪)।

^{৮৪} আত-তারিখ আল-ইসলামী, আল-হুমাইদী (৯/৮৩)।

গভর্নরদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কাউকে কোনো এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করতেন, তিনি তাকে আরাম-আয়েশে সহজ জীবনযাপন করার জন্য প্রেরণ করতেন না। বরং তিনি তাকে অনেক কঠিন কাজ দিতেন যা তার দায়িত্ব সচেতনতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলত। আধুনিক সমাজে নেতা হওয়া মানে অন্যদের থেকে তাকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ প্রদান করা। আর নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন দায়িত্ব সচেতনতা, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ—এসব যোগ্যতাই তিনি সকল গভর্নর থেকে আশা করতেন এবং নিজের থেকেও আরও বেশি আশা করতেন। এজন্য দেখা যায় যে, তিনি বেশিরভাগ রাত নির্ধুম কাটাতেন যেন তার প্রজারা শান্তিতে ঘুমাতে পারে; নিজে কঠোর পরিশ্রম করতেন যেন তার প্রজারা বিশ্রাম নিতে পারে; এবং নিজের স্বাধীনতা এবং সময়কে বিসর্জন দিয়েছিলেন যেন প্রজারা শান্ত এবং স্থির জীবন লাভ করতে পারে।

ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার গভর্নরদের থেকেও একই জিনিস আশা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেন থেকে মদীনায়ে ফিরে এলেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ঘরে স্বাগত জানালেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'এখন (গভর্নর হিসেবে) তুমি যা করেছ, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধর।'

এটা হঠাৎ সংঘটিত হওয়া কোনো ঘটনা নয়। যখনই কোনো গভর্নর মদীনার বাইরের কোনো এলাকায় দায়িত্ব পালন শেষে ফিরে আসতেন, তখনই তিনি তাকে এভাবে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য জিজ্ঞেস করতেন। মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, 'আমি কি দু'বার জিজ্ঞেসিত হব—একবার আল্লাহর নিকট, আরেকবার আপনার নিকট? আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো কোনো পদ গ্রহণ করব না।'^{৮৫}

মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরবর্তীতে ইয়েমেনের অবস্থা

মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ইয়েমেনবাসী ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। অধিকন্তু, গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে দ্বীনি অনুভূতি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের কারণ হয়ে ওঠে। মুসলিম শাসক এই নতুন অনুভূতিতে সবাইকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হন এবং ভৌগোলিক সীমারেখার উপর নির্ভর করে দেশকে বিভিন্ন জেলায় ভাগ করেন। উল্লেখ্য, এ বিভক্তিতে গোত্রগত অবস্থানের কোনো ভূমিকা বিবেচনা করা হয়নি। এভাবে ইয়েমেনকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করা হয় : সান'আ, আল-জুনদ এবং হাযারা মাউত।

দেশের লোকজনকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গোত্রের ভূমিকা একেবারে শেষ না হয়ে গেলেও অনেক কমে আসে। নেতাদের তাদের গোত্রগত পরিচয়ের পরিবর্তে যোগ্যতা ও দ্বীনি অবস্থা বিবেচনা করে নির্বাচন করা হতো। রাজনীতি কিংবা নীতি-নির্ধারণে গোত্রগত মর্যাদা কিংবা অবস্থানের কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে সামগ্রিকভাবে মদীনায় মুসলিম শাসকের অধীনে সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র দল নির্বাচনে গোত্রের ভূমিকা তখনও অবশিষ্ট ছিল। গোত্রে একজনের মর্যাদা, গোত্রগত সম্প্রীতি এবং সম্পদ—এসবের কোনো কিছুই আলোচ্য বিষয় ছিল না। তাকওয়া, পরহেজগারী এবং নেক আমল—এসবই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল।

ইয়েমেন থেকে সব ধরনের পৌত্তলিকতার মূল উৎপাটন করা হয়েছিল। সকলের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, নবুওয়্যাত কোনো সাধারণ বিষয় নয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই খাতামুন নবী মানে তার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সুতরাং এখন থেকে যে কেউ নবী দাবি করবে, সে অবশ্যই একজন ডগু এবং তাকে ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটাই একমাত্র শিক্ষা নয় যা ইয়েমেনবাসী লাভ করেছিল। রক্তপাত, দুঃখ-কষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রম করে ধর্মত্যাগী হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর তারা খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কিছু জিনিস কখনও পরস্পরে মেশে না—ঈমান ও লোভ মিশতে পারে না এবং ইসলাম ও জাহিলিয়াত একসঙ্গে থাকতে পারে না। তারা আরও যা শিখেছিল তা হলো, অতীত ভুলগুলোর মাশুল দিতে হবে।

তাদের উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

আন্তরিকতা, দৃঢ় মনোবল এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অনপন্যে ইচ্ছা নিয়ে তারা বিদেশের ভূখণ্ড বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। ইসলামের জন্য নতুন ভূখণ্ড বিজয়ে অতীতে মুরতাদ হওয়া থেকে ফিরে আসা মুসলমানরা যদি সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে, তাহলে তাদের সমান অথবা বেশি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ঐসব মুসলমান যারা কখনই ধর্মত্যাগ করেননি এবং ইসলামের উপর আজীবন অবিচল ছিলেন। এ রকম ব্যক্তি ছিলেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুল-কিলা আল হিময়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু, মাসউদ আল-আক্কী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হুমাইরী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা বিজিত ভূখণ্ডে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদের মধ্যে হাশক আব্দুল হামীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সাজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আরায রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং গুরাহবিল ইবনে আস-সিমত আল-কিন্দী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনের ভেতর এবং বাইরে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইয়েমেন থেকে মুসলিম সামরিক বাহিনী বের হয়ে অনেক নতুন নতুন ভূমি বিজয় করেছে এবং অনেক ত্যাগস্বীকার করে প্রচণ্ড মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে ইরাক ও মিশরে নতুন শহরের গোড়াপত্তন করেছে। ইয়েমেনের অধিবাসীরা তাদের গভর্নরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিল এবং সামগ্রিকভাবে মদীনার শাসকের উপর তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একইভাবে আশ্বস্ত ছিল। এই বিশ্বাস ও আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে ইয়েমেনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভাব বিস্তার করে এবং ইয়েমেনের অধিবাসীরা মুসলিম জাতির মধ্যে উন্নতি এবং মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।^{১৬}

^{১৬} আল-ইয়েমেন কী সাদরিজ-ইসলাম (পৃ. ২৯১)।

দুই। তুলাইহা আল-আসাদী

তুলাইহা আল-আসাদী ছিল তৃতীয় ব্যক্তি যে কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশার শেষ দিকে নবুওয়াত দাবি করে। তার পুরো নাম তুলাইহা ইবনে খাওয়ালীদ ইবনে নাওফল ইবনে নাদলাহ আল-আসাদী। নবম হিজরীতে (প্রতিনিধির বছর) আসাদী গোত্রের লোকজনের সঙ্গে তুলাইহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে আসে। আসাদী গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আন্তরিকভাবে ভাব-বিনিময় করে এবং তাকে বলে, ‘আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিতে এসেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল যদিও আপনাকে আমাদের গোত্রে প্রেরণ করা হয়নি...।’ তারা এ কথা আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেনি, বরং তাদের প্রকাশভঙ্গি ছিল যেন তারা রাসূলকে অনুগ্রহ করছে! তাদের এই অশোভন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল করলেন,

يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করছ মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।^{১৭}

মদীনা থেকে নিজের এলাকায় ফিরে তুলাইহা শুধু ধর্মত্যাগই করেনি, বরং নিজেকে নবী দাবি করে। নবী দাবি করে সে বুঝতে পারে যে, শীঘ্রই তাকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। এজন্য সে সুমাইরাহতে সামরিক চৌকি স্থাপন করে। সুমাইরাহ ছিল বনু আসাদ এলাকার অন্তর্ভুক্ত একটি শহর।

আল্লাহ তা‘আলা তুলাইহার মাধ্যমে বনু আসাদ গোত্রের লোকজনের ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। একদিন তারা সম্পূর্ণভাবে পানিশূন্য হয়ে

যায়। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। অনেকে চরমভাবে পিপাসার্ত হয়ে ওঠে। তুলাইহা তাদের একটি ধাঁধা বলল। সে দাবি করল, এ ধাঁধার উত্তর অনুযায়ী কাজ করলে তারা পানির সন্ধান পাবে। তখন সবাই এ ধাঁধার উত্তরে কাজ শুরু করে এবং ব্যর্থ হয়। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা লক্ষ্য করল যে, ধাঁধার নির্দেশ অনুযায়ী তারা একটি পানির উৎসের কাছে চলে এসেছে। এ ঘটনার পর আসাদ গোত্রের সাধারণ জনগণ এবং অন্যান্য বেদুইনরা যারা নিকটেই বসবাস করত, তুলাইহার খপ্পরে পড়ে যায় এবং স্বেচ্ছায় তার অনুসারী হয়ে যায়।

নিজেকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক দাবি করে তুলাইহা তার অনুসারীদের নামাযে সিজদা করতে নিষেধ করত। সে দাবি করত যে, আসমান থেকে তার কাছে অহী নাযিল হয় এবং এটা প্রমাণ করার জন্য সে ছন্দপূর্ণ শ্লোক রচনা করত। যদিও এসব শ্লোকে অজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনা মূর্তমান ছিল, কিন্তু গোত্রপ্রীতির কারণে তার অন্ধভক্তরা তা সত্য বলে মেনে নিত।

তুলাইহা এতটাই ভ্রান্ত ছিল যে, সে মনে করতে লাগল তার শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। সম্ভবত তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কিংবা এর চেয়ে বেশি কিছুর জন্যই তার পতন ত্বরান্বিত হয়। তুলাইহার মিথ্যা নবুওয়াতের দাবির কথা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিরার ইবনে আযওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। যিরারের বাহিনীর চেয়ে তুলাইহার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। যদিও সে ভ্রান্ত ছিল, তথাপি সে আসাদ এবং গাতফান গোত্রের বিরাটসংখ্যক অনুসারী জোগাড় করতে সমর্থ হয়।^{৮৮}

বিখ্যাত এনসাইক্লোপেডিয়া যারিয়াতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়াহ এর মধ্যে তুলাইহা সম্পর্কে একটি নিবন্ধে লেখা রয়েছে : বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সে কবিতা রচনা করত এবং লোকদের নিকট খুতবা (বক্তব্য) দিত...বিভিন্ন যুদ্ধে। মনে হয়, সে ছিল গোত্রের একজন প্রতিভূর বাস্তব চরিত্র এবং ইসলাম পূর্ব যুগের নেতা। নিচের সবগুলো গুণই তার মধ্যে

বিদ্যমান ছিল : সে ছিল গণক, কবি, বাগ্মী এবং একজন সাহসী যোদ্ধা।^{১৯} এ নিবন্ধে লেখক তুলাইহার প্রতি তার ভালোবাসাকে লুকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। উল্লেখিত এনসাইক্লোপেডিয়ার লেখকরা ইসলামের নামে অপব্যাখ্যা অথবা অপবাদ দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্তেকালের পরও তুলাইহার অধীনে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তখনও সে তার মিথ্যার প্রচার অব্যাহত রেখেছিল। খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরব উপত্যকায় বিভিন্ন এলাকায় নব্য যুরতাদদের দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এর মধ্যে একটি বাহিনীকে তুলাইহা ও তার অনুসারীদের প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘আমি তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘খালিদ আল্লাহর কতই না ভালো বান্দা এবং গোত্রের কতই না ভালো ভ্রাতা। সে আল্লাহর একটি তরবারি, যা আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন।’^{২০}

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন যিল-কিসসা থেকে রওনা হবেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা দিলেন যে, তিনি যেন অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ে খাইবারের সীমান্ত-এলাকায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘোষণার পেছনে কারণ ছিল যে, ঐ অঞ্চলে বসবাসরত বেদুইনদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেওয়া।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথমে তুলাইহা আল-আসাদীর এবং তারপর বনু তামীমের দিকে যেতে নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে তুলাইহা উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। বনু আসাদ ও গাতফান গোত্রের সাহায্যও নিশ্চিত করেছে। কিছুকাল পরেই

^{১৯} দাইরাতুল-মা‘আরিফ আল-ইসলামিয়াহ (পৃ. ৭৮)।

^{২০} মুসনাদে আহমাদ (১/১৭৩)।

বনু আবস এবং যিবাইন গোত্র এসে তুলাইহার অনুসারীদের সারিতে যোগদান করে। তারপরেও তুলাইহা জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি; বরং আরও বেশি অনুসারী সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সে তাঈ গোত্রের বনু যাদিলাহ এবং গউস বংশের লোকদের তার দলে যোগদানের আহ্বান জানাল।

এভাবে তাঈ গোত্র, যা কিনা বিখ্যাত সাহাবী আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্র, তুলাইহার মিথ্যা ওয়াদার ধোঁকায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল; বস্তুত তারা তুলাইহার আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল এবং অনেকে তাঈ এলাকা ছেড়ে তুলাইহার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছিল। তাঈ অধিবাসীদের জন্য লক্ষণ ভালো ছিল না, তবে তাদের সকলে একইসাথে বিপথগামী হয়নি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে মূলত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণের পূর্বেই আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি তাদের ধর্মত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গন্তব্যে পৌঁছেই তার গোত্রের লোকজনকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার অনুরোধ করেন^{১১} এবং তাদের আবার ইসলামের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। প্রথমে তারা আদীর অনুরোধে সাড়া দিতে অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু কথা শোনে এবং তাদের অন্তঃকরণ নরম হয়। ঐ সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী সেখানে পৌঁছে; তার অধীনে একজন আনসার সাহাবী ছিলেন যার নাম সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শামমাস রাযিয়াল্লাহু আনহু।

শত্রুপক্ষের অবস্থিতি সম্বন্ধে জানার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জনকে আগে প্রেরণ করলেন; সাবিত ইবনে আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উকাশা ইবনে মেহসান রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা পশ্চিমধ্যে তুলাইহার

^{১১} তারতীব ওয়া-তাহযীব কিতাব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খলীফা আবু বকর, ড. মুহাম্মাদ ইবনে শামিল আস-সাগমী (পৃ. ১০১)।

ভ্রাতা হিবালকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে ফেলেন। দ্রুত এ সংবাদ তুলাইহার নিকট গিয়ে পৌঁছে।

আর যা-ই হোক, তুলাইহা কাপুরুষ ছিল না। সে দ্রুত ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার আরেক ভাই সালামাসহ রওনা হয়। তারা যখন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পায়, তখন তাদের দ্বৈত লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ করে। তুলাইহা উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে শহীদ করে ফেলে। আর সালামাও তার প্রতিপক্ষ সাবিত ইবনে আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে। তুলাইহা এবং তার ভাই সালামা যখন ঘটনার স্থান থেকে অনেক দূরে, তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ জায়গায় পৌঁছে তার মৃত ভাইদের লাশ দেখতে পান। এ রকম দু-জন মহান ব্যক্তিদের হারিয়ে পুরো বাহিনীতে শোকের ছায়া নেমে আসে—আল্লাহ তাদের জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রথমে তাঈর অধিবাসীদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। হয় তিনি জানতেন যে, তাঈর বেশরভাগ লোক ধর্মত্যাগ করেছে অথবা তিনি এটা কেবল ধারণা করেছিলেন। তবে তার জন্য প্রতিটি গোত্রে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন ছিল এটা জানার জন্য যে, আসলে কারা ধর্মত্যাগী আর কারা ইসলামের উপর অটল রয়েছে। তাছাড়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে প্রথমে তাঈর অধিবাসীদের নিকট যেতে। তাঈ পৌছার আগেই আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করলেন। এই দু'জনের মধ্যে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। আর আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল তার গোত্রের লোকজনকে বুঝিয়ে ইসলামের উপর অটল রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন। এজন্য গোত্রের লোকজনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সতর্কভাবে কথা বলার প্রয়োজন ছিল।

আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি আমাকে তিন দিনের জন্য সময় দিন। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। যারা ইতিমধ্যে তুলাইহার

সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চলে গেছে, তারা তাদের ফিরিয়ে আনতে চায়। আর তারা যদি ফিরে আসে, তাহলে সবাই মিলে আপনাকে প্রকাশ্যে অনুসরণ করবে। কারণ, তারা যদি প্রকাশ্যে এখন আপনাকে অনুসরণ করে, তাহলে যারা তুলাইহার নিবট গমন করেছে, তাদের তুলাইহা হয়তো হত্যা করে ফেলবে। আশা করি এই সমাধান তড়িঘড়ি করে তাদের আক্রমণ করে জাহান্নামে পাঠানোর চেয়ে আপনার নিকট অধিক প্রিয় হবে।' আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে চমৎকার যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি তাদের ধর্মত্যাগী মনে করে আক্রমণ করে বসে, তাহলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আর যদি কিছুদিন অপেক্ষা করে, তাহলে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের পথে ফিরে আসবে এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করবে।

আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথা রেখেছিলেন। তিন দিন পর তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ফিরে এলেন। একা নন, বরং সঙ্গে পাঁচশত মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে এলেন। সবাই খালিদের বাহিনীতে নাম লেখাল। অতিরিক্ত পাঁচশত যোদ্ধা নিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু যাদিলা গোত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। এটি তাঈ গোত্রেরই একটি শাখা। আবার আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধ না করার জন্য পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'হে খালিদ, আমাকে কিছু সময় দিন। আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। সম্ভবত আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন যেমন তিনি আল-গউস গোত্রকে রক্ষা করেছেন (তাঈ গোত্রের আরেকটি শাখা গউস, যারা এই কিছুদিন পূর্বে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছে)।' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে অনুমতি দিলেন। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু যাদিলা গোত্রের লোকদের নিকট গেলেন এবং তাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, ইসলামে প্রত্যাবর্তনই তাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল। ফলে এ গোত্রের এক হাজার যোদ্ধা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে যোগদান করে। সত্যিকার অর্থেই আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গোত্রের সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মূলত এটা ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ এবং তারপর আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেষ্টা যাতে তাঈ গোত্রের মুরতাদ হওয়া থেকে এবং তার ক্ষতিকর পরিণতি (অনন্তকালের জন্য জাহান্নাম) থেকে

মুক্তি পায়। আল্লাহ তা'আলা তার উপর এবং সকল সাহাবীদের উপর রাজি হয়ে যান।

ক। বযাখার যুদ্ধ এবং বনু আসাদের ধ্বংস

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে আযা এবং সালমা এলাকায় পৌঁছে সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করলেন এবং সেখান থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। যখন তিনি তার বাহিনীসহ আবার অগ্রসর হলেন, তখন তুলাইহার বাহিনীর সঙ্গে বযাখা এলাকায় সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হলেন। রণক্ষেত্রে শুধু এই দু-টি বাহিনীই উপস্থিত ছিল না, বরং আরও অনেক বেদুইন গোত্রও ছিল। তবে তারা সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে আসেনি। তারা এসেছিল দর্শক হয়ে। তাদের মতে এ সময় যে কোনো পক্ষের পক্ষাবলম্বন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য তারা সংঘর্ষ চলাকালীন সময় অপেক্ষা করে বিজিতদের পক্ষাবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিল।

তুলাইহা তার গোত্রের অনুসারীদের নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তার সঙ্গে আরও অনেক গোত্র এবং দল ছিল যারা তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বুন ফুযারা গোত্রের সাতশত সৈন্যের সমন্বয়ে এ রকম একটি দল উয়াইনা ইবনে হিসনের নেতৃত্বে দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত হয়।

যখন দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল, তখন তুলাইহা তার বাহিনীর পেছনে অবস্থান নিল এবং নিজেকে কবুল দিয়ে জড়িয়ে রাখল। সে দাবি করল যে, তার সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং সে অহীর জন্য অপেক্ষারত থাকবে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হলো। উয়াইনা প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল এবং বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে তুলাইহার নিকট গেল (যে তখনও কবলে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে) এবং জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে কি জিবরাইল এসেছে?' তুলাইহা বলল, 'না।' উয়াইনা আবার কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে তুলাইহার নিকট ফিরে একই প্রশ্ন করল। তুলাইহা না-বোধক জবাব দিল। তৃতীয়বার উয়াইনা একই প্রশ্ন করল, 'জিবরাইল কি এসেছে?' তুলাইহা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।' উয়াইনা বলল, 'তিনি কী বললেন?' তুলাইহা

এমন এক অজ্ঞতাসুলভ জবাব দিল যাতে উয়াইনার বুঝতে বাকি থাকে না যে, তুলাইহা একজন ভণ্ড এবং তার নবুওয়াতের দাবি একেবারে মিথ্যা। উয়াইনার অন্তরের এই পরিবর্তন তুলাইহার জন্য কোনো সুসংবাদ ছিল না। কারণ, সে সঙ্গে সঙ্গে তার সাতশত সৈন্যদের ডেকে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার আদেশ দিল। তুলাইহার সৈন্য সংখ্যা কমে গেল, কিন্তু তার দুঃখের এটাই শেষ নয়, পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটতে লাগল— দলের পর দল এবং সেনার পর সেনা রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। তুলাইহার সৈন্যদের মধ্যে গুণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। তারা দিগ্বিদিক পালাতে লাগল। সবাই নিজের জ্ঞান বাঁচতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তুলাইহা পূর্ব প্রস্তুতকৃত একটি ঘোড়ায় সওয়ার হলো এবং স্ত্রী নাওয়ারকে একটি উটের পিঠে উঠিয়ে সিরিয়া অভিমুখে পালিয়ে গেল। এদিকে মুসলমান সেনাবাহিনী তুলাইহার অনুসারীদের ধাওয়া করল এবং যাদের গেল, হত্যা করল।^{৯২}

যুদ্ধের ফলাফল এবং কীভাবে তুলাইহার বাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, এ খবর পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটি প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন। এ চিঠিতে লেখা ছিল : ‘আল্লাহ যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা যেন তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তোমার কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করবে; কেননা, তুমি কাজ সম্পাদনে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে, নমনীয় হবে না। তাদের মধ্যে যেসব মুশরিক মুসলমানদের হত্যা করেছে, তাদের হত্যা করবে এবং বন্দীদের মধ্যে যারা আল্লাহর শত্রুতা বা বিরোধিতা করেছে এবং এটাকেই কল্যাণকর মনে করেছে, তাদের হত্যা করবে।’

খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এক মাস বযাখায় অবস্থান করেন। তিনি এবং তার লোকজন শত্রুসেনাদের ধরার জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এটি কেবল সাম্প্রতিক যুদ্ধে শহীদ হওয়া মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই নয়, বরং এতদিন পর্যন্ত যেসব মুসলমান মুরতাদদের হাতে নির্যাতিত, নিগৃহীত অথবা হত্যার স্বীকার হয়েছিলেন, তাদেরও প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। মোটকথা,

মুরতাদদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয়েছে যেন ভবিষ্যতে কেউ আর ধর্মত্যাগের কথা চিন্তাও না করতে পারে, তারা যেন তাদের মধ্যে বসবাসকারী কোনো খাঁটি মুসলমানকে নির্যাতন না করে অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস না পায়। মুরতাদদের যথেষ্ট সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। তারা ইসলামে ফিরে আসতে অস্বীকার করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা তাদের হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এছাড়াও তারা ছিল জঘন্য যুদ্ধাপরাধী। এসব কারণে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অভিযুক্তদের কাউকে অগ্নিদগ্ধ করেন, কাউকে পাথর মেরে হত্যা করেন, কাউকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করেন। এ শাস্তির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য ভণ্ড নবীর অনুসারী ও ধর্মত্যাগীদের অন্তরে ভয় ঢুকে যায়।

খ। আবু বকর রা.-এর সঙ্গে আসাদ এবং গাতফান গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

তুলাইহার মূল অনুসারীরা ছিল আসাদ এবং গাতফান গোত্রের সদস্য। তাদের মধ্যে একটি দল সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের দু-টি বিষয়ের যে কোনো একটি বেছে নিতে বলেন—হয় তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে পার, অথবা আত্মসমর্পণ করে লাঞ্ছনাদায়ক শর্তসমূহ মেনে নিতে পার। তারা বলল, ‘হে রাসূলুল্লাহর খলীফা! চূড়ান্ত যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা আমরা জানি (এ যুদ্ধের স্বাদ তো আমরা পেয়েই গেছি), কিন্তু লাঞ্ছনাদায়ক শর্তসমূহ কী?’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমাদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ ও শক্তি সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আর তোমাদের বানানো হবে উটের রাখাল। আল্লাহ দেখবেন যে, তার নবীর খলীফা ও মুমিনগণ তোমাদের অক্ষম করে দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু নিয়েছ তা আমাদের ফেরত দেবে। আর আমরা যা কিছু নিয়েছি, তা তোমাদের ফেরত দেব না। তোমরা দেখবে যে, আমাদের যারা নিহত হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে। আর তোমাদের যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে। আমাদের নিহতদের বদলা দেওয়া হবে, তোমাদের নিহতদের কোনো

বদলা নেই।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ‘আপনার কথা—আমাদের নিহতদের বদলা নেয়া হবে—এর কারণ হলো, আমাদের লোকেরা আল্লাহর নির্দেশমতো নিহত হয়েছে যাদের রক্তপণ বা দিয়াত হয় না।’ উমর এ কথা বলে বিরত থাকলেন এবং দ্বিতীয়বার বললেন, ‘আপনার সিদ্ধান্ত কতই না উত্তম!’^{৯৩}

গ। উম্মে যুমাল

তুলাইহার অনেক পরাজিত অনুসারীরা নতুন কিছু কিংবা নতুন কোনো নেতার সন্ধানে ছিল। তারা জনৈকা মহিলার শরণাপন্ন হয়। মহিলাটির নাম ছিল উম্মে যুমাল। তার পুরো নাম সালমা বিনতে মালিক ইবনে হুযাইফা। সে যাকার এলাকায় বসবাস করত। এটি হাউবের নিকটবর্তী একটি শহর যার পাশ দিয়ে বসরা থেকে মদীনার পথ অতিক্রম করেছে। সালমা ছিল একজন বিখ্যাত এবং সুপরিচিত মহিলা নেত্রী। সে শুরুতে তার মায়ের জন্যই খ্যাতি অর্জন করে। তার মা উম্মে কুরফা গোত্রীয় মর্যাদা ও অধিকসংখ্যক সন্তানের কারণে ছিল প্রবাদতুল্য।

সালমা তার নতুন উদ্ধাদের খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। এতে তারাও উত্তেজিত হলো। ইতিমধ্যে সুলাইম, তাঈ, হাওয়াযিন ও আসাদ গোত্রের আরও লোক এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। তারা তখন একটি বিরাট বাহিনীতে পরিণত হলো এবং উক্ত মহিলার প্রতিপত্তিও তাতে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তার এ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী। তার বাহিনীর খবর পেয়েই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। উভয় দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ী হয়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মহিলা এবং সে যে উটের উপর সওয়ার ছিল সেটিকেও হত্যা করেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয় বার্তা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন।^{৯৪}

^{৯৩} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২/৩২৩)।

^{৯৪} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২/৩২৩)।

শিক্ষা ও উপদেশ

আল্লাহর প্রতি আবু বকর রা.-এর বিশ্বস্ততা এবং তার অবিশ্বাস্য সামরিক পরিকল্পনা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্বগোষ্ঠীয় লোকদের নিকট যাও এবং তুলাইহার অনুসারী হওয়া থেকে বিরত রাখ। তারা যদি তার অনুসারী হয়ে যায়, এটা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই যে কথায়—'এটা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে'—তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তখনও কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তিনি যেন ফলাফল জানতেন : আল্লাহ তার নিবেদিত বান্দাদের সাহায্য করবেন এবং মুসলিম বাহিনী সহজেই তুলাইহা ও তাঈ গোত্র থেকে তার অনুসারীদের পরাজিত করবে।

অন্যদিকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাঈ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু করতে বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সমরবিদ হিসেবে অবিশ্বাস্য দক্ষতার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য, তাঈ, মদীনা থেকে অনেক দূরের একটি এলাকা, তুলাইহা এবং তার অনুসারীরা যেখানে সমবেত হয়েছিল, সেখান থেকেও দূরে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে তুলাইহা ও তার অনুসারীদের প্রথমে আক্রমণ করলেই সুবিধা হতো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। খালিদের বাহিনীকে আরও এক পদক্ষেপ এগিয়ে রেখেছেন যাতে তাঈ অধিবাসীদের তুলাইহার বাহিনীতে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখা যায়, অথবা যারা ইতিমধ্যে তুলাইহার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে তাদের তুলাইহাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা। তারপর তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং গোত্রের অন্যান্য লোকজনকে খালিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে ফিরিয়ে রাখা। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর আহ্বানে তাঈ অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, এটা বিবেচনায় না আনলেও প্রথমে তাঈ গমন করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার বাহিনী তুলাইহার সৈন্যসংখ্যা কমাতে অথবা দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তুলাইহার বাহিনী থেকে অনেক দূরে মদীনায় অবস্থান করেই নানাভাবে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছেন। উদহারণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি সৈন্যসহ খাইবারের দিকে রওনা হচ্ছেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঈ এলাকায় খালিদের বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তার এই ঘোষণা শীঘ্রই দ্রুত শত্রুদের মাঝে ছড়িয়ে যাবেএবং তিনি এটাই চেয়েছিলেন যেন তুলাইহার সৈন্যদের মধ্যে এবং যারা তখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল (মুসলমান বাহিনী অথবা তুলাইহা—কার পক্ষাবলম্বন করবে), তাদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেয়া যায়।

সম্ভবত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই যুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন সঠিক সেনাপতি নির্বাচন করার মাধ্যমে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ‘যুদ্ধের মানুষ’—একজন সৈনিক হিসেবে, একজন সেনাপতি হিসেবে এবং একজন সমরবিদ হিসেবেও। যদি মুসলমানরা দ্রুত এবং একতরফা বিজয় অর্জন করতে চাইত, তাহলে তাদের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চৌকস নেতৃত্ব এবং তার সমর অভিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আশ্চর্যজনকভাবে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যাতে তারা খুব সহজেই এক ভয়ংকর এবং উল্লেখযোগ্য সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন।^{৯৫}

বম্বাখার যুদ্ধ শেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খুবই অর্থবহ একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এ চিঠিতে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিজয়-শুভেচ্ছা জানান এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন : ‘আল্লাহ যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা যেন তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তোমার কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করবে; কেননা, তুমি কাজ সম্পাদনে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে, নমনীয় হবে না। তাদের মধ্যে যেসব যুগ্মরিক মুসলমানদের হত্যা করেছে, তাদের হত্যা করবে।’

^{৯৫} আভ-ভারিখ আল-ইসলামী, আল-হুমাইদী (৯/৬০-৬৩)।

চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং চিঠিটি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দুআ দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—এটা এমন একটি বিষয় যা একজন সেনাপতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার একটি ভুল পদক্ষেপ অথবা নৈরত্যাত্মিক আচরণ মানুষকে কষ্ট দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটা মৃত্যু এবং জখমের কারণ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই ইসলামের অনুশাসন মেনেই যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তার সৈন্যদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, কোনো মহিলা অথবা শিশুকে হত্যা করবেন না, শত্রুর মৃত দেহকে বিকৃত করবেন না ইত্যাদি।

ধর্মত্যাগীরা ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের থেকে ব্যতিক্রম। তারা সামান্যতম কোনো অনুগ্রহের যোগ্য নয়। তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে দুনিয়ার মোহে হেদায়েতের পরিবর্তে মূর্খতাকেই বেছে নিয়েছে। আরও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, তারা বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ‘অরক্ষিত’ মুসলিম রাজ্যের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট। ‘অরক্ষিত’ কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। তারা রোমানদের মতো মুসলমানদের শত্রু ছিল না; তারা ছিল আসলে বিশ্বাসঘাতক—যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে তা ভঙ্গ করেছে। এজন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদ সৈন্যদের দমনে নমনীয় হতে নিষেধ করেছেন। তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করার পেছনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিল দু-টি : প্রথমত, মুরতাদদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দেয়া; এবং দ্বিতীয়ত, এ ঘটনার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা। কারণ, তখনও অনেক গোত্র তাদের বিশ্বাসে দোদুল্যমান ছিল। তারা ঈমান এবং কুফরের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। এ চিঠি থেকে দেখা যায় যে, যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নমনীয়তা এবং উদারতার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত, তথাপি যখন কঠোরতার প্রয়োজন হয়েছে তিনি তা প্রকাশ

করতে কার্পণ্য করেননি এবং যখন অনুগ্রহ করার প্রয়োজন হয়েছে, তিনি তখন অনুগ্রহ করাকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন।

আবার যখন আসাদ এবং গাতফান গোত্র থেকে একটি প্রতিনিধিদল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতে আসে, তখন তিনি ঠিকই যুদ্ধের গতিকে দূরদর্শী নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিচালিত করেছেন। তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে পরিকার ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। তিনি প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন যে, তারা যেহেতু সময়মতো তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেনি বা অনুতপ্ত হয়নি, সুতরাং তাদের প্রতি কোনো ছাড় দেয়া হবে না। এখন তারা আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ মেনে নিতে পারে অথবা মুসলমানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই দৃঢ় পদক্ষেপ পুরো আরব উপত্যকায় পরিকার এক বার্তা প্রেরণ করে—মুসলমানরা সন্ধিচুক্তির উপর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে চায় না কিংবা এমনিতে কালক্ষেপণ করতে অনাগ্রহী, বরং তারা বিরামহীনভাবে যুদ্ধ করতে আগ্রহী যতক্ষণ না আরব উপত্যকা থেকে ধর্মত্যাগীদের সমূলে বিনাশ ঘটে।

মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি-সাহস না থাকায় আসাদ ও গাতফান গোত্রের প্রতিনিধিরা পরাজয় স্বীকার করে সন্ধির শর্তসমূহ মেনে দেয়। তারা তাদের ঘোড়া ও অস্ত্র জমা দেয়, এবং তাওবা না করে ও মুসলিম জাতির প্রতি নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ না করে আবার হাতে অস্ত্র নেয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আবার ধর্মত্যাগে উৎসাহী না হতে হাতে অস্ত্র না নেয়াই দলীল হয়ে ওঠে।^{১৬}

আদী ইবনে হাতিম রা.

আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থেই তার গোত্রের লোকদের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। তাকে খুবই সুক্ষ্মভাবে কাজ করতে হয়েছে যখন তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার গোত্রের লোকদের সম্পর্কে কথা বলছিলেন—একদিকে গোত্রের লোকদের ইসলামে ফিরিয়ে আনার

ব্যাপারে চেষ্টা করা এবং অন্যদিকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আক্রমণ ত্বরান্বিত করা থেকে ফিরিয়ে রাখা। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন। কিন্তু গোত্রের লোকজনকে বোঝানোর জন্য তিনি তাদের স্তরে নেমে কথা বলেছেন। তিনি তাদের বুঝিয়েছেন যে, পার্শ্ব দিক বিবেচনা করলেও তাদের জন্য ইসলামে ফিরে আসা লাভজনক। তিনি আরও বলেছেন, মুসলমান বাহিনী অবশ্যই তাদের পরাজিত করবে, তাদের লোকজনকে হত্যা করবে এবং মহিলাদের বন্দী করবে। তিনি এ রকম বলেছিলেন কারণ, তিনি অনুভব করছিলেন যে, তার গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করছে। তিনি যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তারাও কিছু কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল। তাদের মধ্যে যারা তুলাইহার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তারা ফিরে আসলেই কেবল সবাই প্রকাশ্যে ইসলামে ফিরে আসার ঘোষণা দেবে। তারা ধারণা করেছিল যে, যদি তুলাইহা তাদের বংশের একাংশের ইসলামে ফিরে আসার সংবাদ পায়, তাহলে সে তার বাহিনীতে যোগ দেয়া তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের হয় হত্যা করবে অথবা জিম্মী করে ফেলবে।

এখন আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তার স্বগোত্রীয় লোকজনের উপর আক্রমণ করা থেকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিরত রাখা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এটা ছিল একটি কঠিন কাজ। কারণ, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন স্বাধীনচেতা এবং দুর্দমনীয় নেতা হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। যখন যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসত, তখন তিনি নরম অন্তঃকরণের চেয়ে বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন করার জন্যই পরিচিত ছিলেন। এজন্য আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যথার্থভাবেই সম্বোধন করেন, তার সামনে যুক্তি পেশ করেন যে, সামরিক দিক বিবেচনা করে তিন দিন অপেক্ষা করাই অধিক কল্যাণকর। কারণ, আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়াদা করেন যে, তিন দিন পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তিনি তার গোত্রের পাঁচ শত মুজাহিদ নিয়ে ফিরে আসবেন। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর যৌক্তিক ব্যাখ্যায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হন। সত্যি সত্যিই তিন দিন পর আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু গাতফান গোত্র থেকে পাঁচশত মুজাহিদ নিয়ে হাজির হন। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের দু-টি শাখা ছিল—বনু

গাতফান এবং বনু যাদিলা। এ ঘটনার কিছু পরেই আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু যাদিলা গোত্রের লোকজনের জন্যও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সময় এবং সুযোগ চান। তিনি তাদের বুঝিয়ে ইসলামে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন এবং তাদের মধ্য থেকে এক হাজার মুজাহিদ খালিদের বাহিনীতে যোগদান করে। সুতরাং কূটনীতি এবং আন্তরিক ইচ্ছার কারণে তিনি তার গোত্রের লোকজনকে কেবল ইসলামে ফিরিয়ে আনতেই সক্ষম হননি, বরং অতিরিক্ত ১৫০০ মুজাহিদ খালিদের বাহিনীতে যোগ করেছেন। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের লোকজনও খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। তারা অলস কালক্ষেপণ করে কোন পক্ষ বিজয়ী হয় তা দেখতে পারত। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৫০০ যোদ্ধাকে মুসলিম বাহিনীতে शामिल করেছে।

তথাপি, আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের লোকজন খুব সতর্ক ছিল এবং তাদের মিত্র বনু আসাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আগ্রহী ছিল না। তাদের মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কাইস গোত্রের লোকজনের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে। কারণ, তারাও ছিল ধর্মত্যাগী। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনুরোধে সম্মত হয়ে বলেন, ‘আল্লাহর কসম, দু-টি শত্রুপক্ষের চেয়ে কাইস বাহিনী দুর্বল নয়। সুতরাং দু’দলের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ কর।’ অন্যদিকে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার লোকজনের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, ‘আমার নিকটাত্মীয় এবং আমার স্বগোত্রের কেউ যদি ইসলামধর্ম ত্যাগ করত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতাম। তাহলে কেন আমি বনু আসাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি হব না, যদিও তারা আমাদের মিত্র? আল্লাহর কসম! আমি এমনটি করব না।’

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও নমনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অন্য কোন কিছু থেকে তিনি কেবল ফলাফলই আশা করছিলেন। অধিকন্তু তাঈয়ের লোকজন যা বলেছে তা তার নিকট যৌক্তিক মনে হয়েছে : যেহেতু বনু কাইস এবং বনু আসাদ উভয়েই ইসলামের শত্রু এবং তাঈয়ের লোকজন বনু আসাদের মিত্র ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী (যারা কেবলই ইসলামে ফিরে এসেছে), এজন্য আশা করা যায়, তারা আগ্রহের

সঙ্গে বনু কাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এং খালিদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তাই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘অবশ্যই বনু কাইস এবং বনু আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমার সাথীরা যে মত প্রদান করেছে, তার বিরুদ্ধাচরণ কর না। সুতরাং এ দু-দলের মধ্যে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ কর এবং তোমার সাথীরা যে পক্ষের বিরুদ্ধে অধিক উৎসাহ ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগ্রহী, তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথীদের নেতৃত্ব দাও।’^{১৭}

একদিক থেকে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে সঠিক ছিলেন। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঈমানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যারাই ইসলাম ত্যাগ করবে, এমনকি তার নিকটাত্মীয়ও যদি হয়, তিনি তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও সঠিক ছিলেন, আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুর তুলনায় ঈমানের দিক দিয়ে তার গোত্রের লোকজন এত মজবুত ছিল না। এজন্য তাদের মিত্রদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে তাদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না যেখানে এর ভিন্ন সমাধান রয়েছে—তাদের বনু কাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বগোত্রের লোকজনকে ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য আদী ইবনে হাতীম রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই চেষ্টা কেবল তাঈ গোত্রকেই উপকৃত করেনি, বরং এটা পুরো মুসলমান সমাজের জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠেছে। তাঈ গোত্রটি ছিল পুরো আরব উপত্যকার মধ্যে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাঈ নেতাদের অন্যরা সমীহ করে চলত। আর তাদের আশেপাশের গোত্রের লোকেরা সব সময় তাঈদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখত এবং মিত্রতে পরিণত হতো। সুতরাং তাঈ লোকদের অন্তর জয় করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থে শত্রুদের মনে মারাত্মক আঘাত করতে পেরেছিলেন—যার প্রভাবে তুলাইহার সৈন্যদের মনোবল ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। অন্যান্য মুরতাদ অধ্যুষিত এলাকার লোকজনের মধ্যেও একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং এর গতি পরিষ্কারভাবেই মুসলমানদের পক্ষে চলে এল। মুসলমানগণ জানতেন যে, আরব উপত্যকার মুরতাদদের পরাজিত করা মুসলমানদের জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার। অন্যদিকে ধর্মত্যাগীরা তাদের সব সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলল যা তারা কিছুদিন পূর্বেও অপরাজেয় মনে করত। এজন্য মুসলমানরা তুলাইহার বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত এবং সুনির্দিষ্ট বিজয় অর্জন করে। মুসলিম বাহিনীর শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ধাওয়া করে কিছু বন্দী করে এবং কিছু হত্যা করে। তুলাইহা ভালো করেই জানত যে, পরাজয় অতি নিকটে। এজন্য আগেই সে পলায়নের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল। যখন পরাজয় সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে দ্রুত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল। যা হোক, তার অনুসারীরা তার মতো ভাগ্যবান ছিল না। তাদের বেশিরভাগ নিহত হলো। এই যুদ্ধে যদিও কেবল তুলাইহা ও তার অনুসারীরা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু এটা সমগ্র আরব অঞ্চলেই সকল মুরতাদদের মনে মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক আঘাত হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। তাদের হাতে আর সামান্য কয়েকটি দিনই বাকি ছিল এবং সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছিল যে, খুব দ্রুতই তাদের অবস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।^{৯৮}

তুলাইহার সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহ

তুলাইহার সেনাবাহিনীর পতনের পেছনে অনেকগুলো কারণ একসঙ্গে প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ১। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করছিল যা তাদের নিকট নিজের জীবনের চেয়েও বেশি দামি ছিল। অন্যদিকে তুলাইহার সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী লাভের আশায় (যেমন, লোভ এবং গোত্রগত আনুগত্য ও মিত্রতা রক্ষার প্রেরণা) যুদ্ধ করছিল। মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, নিদেনপক্ষে শহীদ হওয়ার মর্যাদালাভের আশায় ছিল। আল্লাহর পথে মৃত্যুতে আগ্রহী হওয়ার কারণে তারা ছিল ভয়হীন—আর যাদের

^{৯৮} আল-হারব আন-নাফসিয়া মিন-মানযুর ইসলামী, আহমাদ সাওকেল (২/১৪৩, ১৪৪)।

কোনো ভয় থাকে না, তারা যুদ্ধে খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। শত্রুরাও এটা বুঝতে পেরেছিল। এজন্য দেখা যায় যে, তুলাইহার সৈন্যরা রণক্ষেত্র থেকে যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তুলাইহা তাদের দিকে চিৎকার জিজ্ঞেস করেছে, কেন তারা পালাচ্ছে। তাদের একজন জবাবে বলেছে, ‘আমরা আশা করেছি আমার আগে আরেকজন মারা যাক; অন্যদিকে আমরা এমন সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম তারা সবাই মৃত্যুর জন্য মরিয়া ছিল (এবং শহীদ হওয়ার আশায়) অন্য আরেকজন মৃত্যুবরণ করার আগেই।’^{৯৯} তথাপি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সৈন্যদের দৃঢ় মানসিকতার কথা জানানোর জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ছোট বার্তা পাঠিয়েছিলেন : ‘আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ভালোবাসে যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাস।’^{১০০}

২। এ সময় তাঈ গোত্রের জনগণ ইসলামের পতাকাতলে ফিরে আসায় যুদ্ধে শক্তির ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন হয়েছিল। যদিও তাঈর লোকেরা বনু আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি, তথাপি তারা ইসলামের পতাকাতলে থাকায় তুলাইহার সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল।

৩। সাবিত ইবনে আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উকাশা ইবনে মেহসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে মুসলমানদের মনে আরও বেশি উত্তেজনা কাজ করছিল। তার তুলাইহার সৈন্যদের উচিত শিক্ষা দিতে মরিয়া হয়ে ছিল।

৪। তাঈ গোত্রের যোদ্ধাদের বনু আসাদের পরিবর্তে বনু কাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীর মনোবল ও শক্তি-সামর্থ্যকে बहुগুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং দ্রুত ও একতরফা বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

বযাখার যুদ্ধের প্রভাব

বযাখার যুদ্ধের একটি সকল পরিণতি হচ্ছে, বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাটসংখ্যক আরব ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ,

^{৯৯} তারিখ আল-খামসিন, দাইয়ার বাকরী (২/২০৭); হারাকাতুর-রিদা, আল-আতুম (পৃ. ২৮৯)।

^{১০০} হারাকাতুর-রিদা (পৃ. ২৮৯)।

বয়াখার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনু আমির গোত্রের লোকজন বলে, ‘আমরা ঐ ধর্মেই আবার প্রবেশ করেছি যে ধর্ম থেকে সম্প্রতি বের হয়ে গিয়েছিলাম।’ বনু আমির গোত্রের মতো বনু আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন, সুলাইম এবং ভাসি গোত্রের লোকজন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বাইআত গ্রহণ করে। যা হোক, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাইআত গ্রহণ করেননি; না, আগে তাদের যুদ্ধাপরাধীদের মুসলমানদের নিকট সোপর্দ করতে হবে—তারা শুধু ধর্মত্যাগীই ছিল না, বরং তাদের মধ্যে বসবাসকারী নিরীহ মুসলমানদের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং হত্যা করেছে। যখন এসব অপরাধীদের ধরা সম্ভব হয়েছে অথবা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, তিনি তখন তাদের একই পদ্ধতিতে (যেভাবে তারা মুসলমানদের হত্যা করেছে) শাস্তি দিয়েছেন : তিনি কাউকে অগ্নি দক্ষ করেন, কাউকে পাথর মেরে হত্যা করেন, কাউকে কূপে নিক্ষেপ করেন, কাউকে তীর মেরে হত্যা করেন এবং কাউকে উঁচু পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করেন।

বারাকা ইবনে হুবাইরাসহ অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন : ‘ধর্ম ত্যাগ করার পর মুসলমানদের ধ্বংসের চক্রান্ত শেষে বনু আমির গোত্র আবার ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, আমি তাদের ক্ষমা করিনি এবং যারা সন্ধিতে আবদ্ধ হতে চেয়েছে, যতক্ষণ না তারা যুদ্ধাপরাধীদের (যারা মুসলমানদের আক্রমণ এবং হত্যা করেছে) হস্তান্তর করেছে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গেও কোনো চুক্তি করিনি। আমি বারাকা এবং তার সঙ্গীদের আপনার নিকট প্রেরণ করলাম।’^{১০১}

বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল বনু ফুযারা গোত্রের উয়াইনা ইবনে হাসান। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে শেকল দিয়ে শক্ত করে বাঁধেন এবং তার ঘাড়ের সঙ্গে হাত বেঁধে দেন—ভীষণ কষ্টকর এবং অপমানজনক শাস্তি এবং এভাবেই তাকে মদীনা পাঠানো

^{১০১} তারিখ আত-তাবারী (৪/৮২)।

হয়। এটাই তার জন্য অপমানজনক শাস্তির শেষ ছিল না, মদীনা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মদীনার শিশু ও বালকরা কিল-ঘুঘি মারতে থাকে এবং বলতে থাকে, ‘হে আল্লাহর দুশমন! তুমি-ই কি ইসলাম ত্যাগ করেছ?’ উয়াইনা উত্তরে বলতে থাকে, ‘আল্লাহর কসম! আমি তো কখনো ঈমানই আনিনি।’ অবশেষে তাকে খলীফার দরবারে হাজির করা হয়। উয়াইনা বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ করে খলীফা তার সঙ্গে অনেক কোমল এবং ক্ষমাসুলভ আচরণ করছেন। প্রথমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শেকল খুলে দিতে বলেন এবং তারপর অনেক নমনীয়তার সঙ্গে তাকে তাওবা করার জন্য উৎসাহ দেন। উয়াইনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আস্থানে বিমোহিত হন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অতীত সকল কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে উয়াইনা আর কখনো ইসলাম ত্যাগ করেননি, বরং একজন আদর্শ মুসলমানে পরিণত হন।^{১০২}

আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতসব চক্রান্ত ও ক্ষতিসাধন করার পরও আল্লাহ তা‘আলা উয়াইনা ইবনে হাসানকে হেদায়েত নসীব করেন। তিনি কালব গোত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গেই বসবাস করতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তেকাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। বনু আসাদ, গাতফান এবং আমির গোত্র ইসলামে দাখিল হলে তিনিও ইসলামগ্রহণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা আগমন করেন। ফেরার পথে মদীনার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার কথা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানানো হয়। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তাকে দিয়ে আমার কাজ কী! তাকে যেতে দাও। আল্লাহ তাকে হেদায়েত নসীব করেছেন।’^{১০৩}

মুসলমানদের মধ্যে তুলাইহার অবস্থান ওয়াহশী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলে যায়। আবিসিনিয়ার এই ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ

^{১০২} আস-সিকীক আওদালুল-খুলাফা (পৃ. ৮৭)।

^{১০৩} আত-তারিখ আল-ইসলামী (৯/৫৯)।

করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অতীতের এ ঘটনার জন্য তার মধ্যে তীব্র অনুশোচনা কাজ করত। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তার মুখোমুখি হননি। একই ঘটনা ঘটেছে তুলাইহা'র ক্ষেত্রেও। সবকিছু দেখে মনে হয় তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনিও একই কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখোমুখি হওয়া হতে বিরত থেকেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইজ্তেকালের পর তুলাইহা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গমন করেন। তখন সবাই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বাইআত গ্রহণ করছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে চিনতে পেরে বলেন, 'তুমি উকাশা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কখনো ভালোবাসব না।' তুলাইহা জবাবে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কেন ঐ দু-জনের ব্যাপারে চিন্তিত যাদের আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন (শহীদ করেছেন), কিন্তু তিনি আমাকে তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি (তারা আমার কারণে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমি তাদের হাতে নিহত হলে কাকের হয়ে মৃত্যুবরণ করতাম। সুতরাং সবকিছু ভালোই হয়েছে)।' তুলাইহা তার গোত্রের নিকট ফিরে যায় এবং পরে ইরাকে গমন করে।^{১০৪} পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে কেউ আর কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেনি। সবকিছুই তার আন্তরিক মুসলমান হওয়ার পক্ষে সাক্ষী দেয়। তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন যেখানে তার অতীতকর্মের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত হয়েছে।

পূর্বে ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে আবু বকর রা.-এর আচরণ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন এবং একইসাথে তাদের সঙ্গে আচরণে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। একদিকে তিনি তাদের ক্ষমা করে সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহ দিয়েছেন। অপরদিকে তিনি তাদের মুসলমানদের নেতা বানানো থেকে বিরত থাকতেন এবং ইরাক ও সিরিয়া অভিযানে তাদের যুদ্ধে শরীক হতে নিষেধ করেছেন।

^{১০৪} আত-তারিখ আল-ইসলামী (৯/৫৯); আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/৮১)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দু-টি উপায় ছিল : তিনি পূর্বে ধর্মত্যাগীদের বিশ্বাস করতে পারতেন এবং ফলশ্রুতিতে সাধারণ মুসলমানদের ঝুঁকিতে ফেলতেন। কারণ, যারা একবার ধর্মের সঙ্গে বেঈমানী করেছে, তাদের পক্ষে তা আবার করার আশঙ্কা ছিল। অথবা, তিনি সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করতে পারতেন এবং পূর্বে ধর্মত্যাগীদের যে কোনো নেতৃত্বের আসন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারতেন যাতে তারা মনে কষ্ট পেত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছেন। বিশাল জনগোষ্ঠির স্বার্থকে ক্ষুদ্রদলের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাতে আবার এ কথা বোঝা যায় না যে, তিনি তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে অবমূল্যায়ন করেছেন, বরং তিনি কেবল সতর্কতা অলম্বন করেছেন। এতে সব যুগের মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে : গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন একজনকে নিয়োগ দিতে হবে যে মুসলমান হওয়ার পর থেকে ঈমানে অবিচল রয়েছে এবং কখনই তার বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।

ফাজাআর ঘটনা

ফাজাআর প্রকৃত নাম ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদ ইয়ালাইল ইবনে উমাইর ইবনে খুফাফ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে সে ছিল বনু সুলাইম গোত্রের লোক। ফাজাআ চরম অপমান এবং কষ্টে মৃত্যুবরণ করে। তাকে মদীনার 'বাকী' নামক স্থানে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

শয়তানী কর্মকাণ্ডের সরাসরি প্রতিফল হিসেবে তার এ রকম কঠিন মৃত্যু হয়েছিল। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সে আলোচনায় আসে। এ সময় সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে এসে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়—সত্যিকার অর্থে সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতারিত করছিল। সে খলীফার নিকট একদল সৈন্য চায়, যাদের নিয়ে সে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে জানায়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথা বিশ্বাস করেন এবং একদল সৈন্য তার দায়িত্বে দিয়ে দেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে সম্মুখে মুসলমান-

মুরতাদ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করে তাদের মালপত্র লুট করতে থাকে। খলীফা এ সংবাদ শুনেই তাদের পশ্চাতে আরেক দল সৈন্যকে ধরে আনার জন্য প্রেরণ করেন। শীঘ্রই সে ধরা পড়ে এবং তাকে বন্দী করে মদীনায়ে আনা হয়। যে তাকে বন্দী করে সে ছিল তারই গোত্রের একজন সদস্য। তার নাম তুরাইফা ইবনে হাযিজ।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ‘বাকী’ নামক স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেখানে তার দুই হাত পিঠের সঙ্গে বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এ অবস্থায় সে মারা যায়। আগুনে পুড়ে মারার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, সন্মাসী কর্মকাণ্ডের সময় একজন অথবা অনেককে সে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল।^{১০৫}

তিন। সাজাহ, বনু তামীম এবং মালিক ইবনে নুওয়াইরা আল-ইয়ারবুঈ

রিদ্দার সময়ে তামীম গোত্রের লোকজন (নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে) তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ইসলাম ত্যাগ করে এবং যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আরেক দল খলীফার নিকট যাকাত প্রেরণ করে। আর তৃতীয় দল অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয় সে অপেক্ষায় থাকে। এমনি অবস্থায় সাজাহ বিনতে হারিস সেখানে আগমন করে। সে ছিল তলিব গোত্রের এক খ্রিস্টান মহিলা। সে নিজেকে নবী বলে দাবি করে।

তার দলে প্রধানত তার গোত্রের লোকেরাই ছিল। তবে অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক এসে তার সাথে মিলিত হয়েছিল। খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করতে তারা বন্ধপরিকর হয়। সাজাহ বনু তামীম এলাকায় গিয়ে লোকজনকে নিজের দাবির দিকে আহ্বান করে। জনগণের মধ্যে তার এ আহ্বানে বেশ সাড়া পড়ে। যারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাদের মধ্যে মালিক ইবনে নুওয়াইরা আত-তামীমী, উতারিদ ইবনে হাজিব ছাড়াও বনু তামীমের নেতৃস্থানীয় একদল লোকও ছিল।

^{১০৫} হারাকাতুর-রিদ্দা, আল-আত্বম (পৃ. ১৮৫)।

তবে বনু তামীমের কিছু লোক তার ডাকে সাড়া দেয়নি। গোত্রের এ বিভক্তিতে নিজেদের মধ্যে লড়াই প্রায় আসন্ন হয়ে ওঠে। যা হোক, পরস্পরে যুদ্ধ না করার জন্য তারা একটি অস্থায়ী সমঝোতায় উপনীত হয়। অস্থায়ী বলার কারণ এই যে, শীঘ্রই মালিক ইবনে নুওয়াইরা সাজাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রশংসা-কীর্তন করে মদীনা আক্রমণের পরিবর্তে বনু ইয়ারবু গোত্রের উপর হামলা করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বনু ইয়ারবু বনু তামীমের একটি শাখাগোত্র যারা সাজাহর অনুসরণ করতে অস্বীকার করে।

সাজাহ ছিল রক্তপিপাসু নেত্রী। তাকে এ ব্যাপারে বেশি বোঝাতে হয়নি। তার সৈন্যরা বনু ইয়ারবু গোত্রকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে বনু তামীমের অনুসারীরা সাজাহকে ইয়ামামার উদ্দেশে রওনা হতে রাজি করার। ভণ্ড নবী মুসাইলামা ইবনে হাবীব আল-কাযযাব এর হাত থেকে ইয়ামামাকে দখল করাই ছিল তার এ সফরের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বনু ইয়ারবু গোত্রের সঙ্গে পরাজয়বরণ করে সাজাহ মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। এজন্য বনু তামীমের উপদেষ্টাদের পরামর্শে সে সহজ শিকারে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

মুসাইলামাও ছিল একজন ভণ্ড নবী এবং তার অনেক অনুসারী ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ ছিল বনু হানীফা গোত্রের। সুতরাং সাজাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে আরেক ভণ্ড নবী ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। যদি সে এই যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে সে বিশাল এক সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হতে পারবে।

সাজাহ এবং তার বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে মুসাইলামা তার নিজ দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কারণ, সে তখন সুমামা ইবনে উসালের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। আর ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল সৈন্য দ্বারা মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করছিল। এ সময় মুসলিম সৈন্যগণ মুসাইলামার অধীনস্থ কোনো এক শহরে অবতরণ করে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। ইতিমধ্যে আরেকটি বাহিনী তাকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করেছে যা ছিল পুরোপুরি মুসাইলামার ধারণার বাইরে।

যেহেতু মুসাইলামা ছিল ভণ্ড নবী, যে কিনা ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে লালায়িত এবং ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণই ছিল তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, এজন্য তার শত্রুপক্ষ মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে সাজাহ ছিল ব্যতিক্রম। সে মুসাইলামার অন্তর জয় করে ফেলে এবং তার সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছার ব্যাপারে সে আশাবাদী হয়ে ওঠে। সুতরাং মুসাইলামা সাজাহর নিকট লোক পাঠিয়ে সন্ধির আহ্বান জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, সে তাকে কুরাইশদের থেকে দখলকৃত জমির অর্ধেকাংশ ছেড়ে দেবে। তারপর চল্লিশজন লোকের এক দলসহ মুসাইলামা সাজাহর নিকট গেল এবং একটি তাঁবুর মধ্যে উভয়ে একান্তে বৈঠক করল। মুসাইলামা তাকে অর্ধেক জমি প্রদানের প্রস্তাব দিলে সে তা মেনে নেয়। তারপর সে বলে, ‘আচ্ছা, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, কী বল? তাহলে আমার গোত্র এবং তোমার গোত্র মিলে গোটা আরবকে অধীনস্থ করে ফেলব?’ সাজাহ বলল, ‘হ্যাঁ, রাজি আছি।’ তারা একসঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত করে যার যার গোত্রে ফিরে গেল।

সাজাহর অনুসারীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘মুসাইলামা তোমাকে মোহরানা হিসেবে কী দিয়েছে?’ সে বলল, ‘কিছুই দেয়নি।’ গোত্রের লোকেরা বলল, ‘সেও তোমার মতো আরেক কদর্য ব্যক্তি—বিনা মোহরে তোমাকে বিয়ে করেছে।’ সাজাহ তখনই মোহরানা দাবি করে মুসাইলামার নিকট সংবাদ পাঠাল। মুসাইলামা জবাবে সাজাহকে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে বলল এবং সাজাহ তার পক্ষ থেকে শাবাত ইবনে রিবঈকে পাঠাল।

মুসাইলামা শাবাতকে বলল, ‘তুমি তোমার গোত্রে গিয়ে এই ঘোষণা করে দাও যে, মুহাম্মাদ তোমাদের উপর যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম করেছিলেন, তার থেকে দুই ওয়াক্ত নামায আল্লাহর রাসূল (?) মুসাইলামা ইবনে হাবিব কমিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ফজর ও ইশা দুই ওয়াক্ত—এটা সাজাহর মোহর।’ সাজাহ এত বোকা ছিল না। সে এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বরং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইয়ামামর সন্নিহিতে আসার সংবাদ পেয়ে সে তার নিজ দেশে ফিরে যায়। তবে এর আগে সে মুসাইলামা থেকে অর্ধেক জমির খারাজ গ্রহণ করে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের শীঘ্রই ধ্বংস করবে এবং তারও

একই পরিণতিবরণ করতে হবে বুঝতে পেরে সে ক্ষমতার লিন্সা ত্যাগ করে এবং বনু তাগলিবে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে অবস্থান করতে থাকে। অবশেষে মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করেন।^{১০৬}

ইয়ামামা থেকে নিজ দেশে ফিরে আসার পর নিজের ভূমিকার জন্য মালিক ইবনে নুওয়াইরা সাজাহর নিকট দুঃখ প্রকাশ করে। ঐ সময় সে এবং তার অনুসারীরা আল-বাতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এটা ছিল নাযদে বনু আসাদের সীমানায়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অবস্থানের খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালাতে মনস্থ করে। কিন্তু আনসারগণ এতে দ্বিমত পোষণ করে। তারা বললেন, 'খলীফা আমাদের যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা সম্পন্ন করেছি।' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটা এমন একটি বিষয় যা করা প্রয়োজন এবং এমন একটি সুযোগ, যার সদ্যবহার করা উচিত।' যে সুযোগের কথা তিনি বলছিলেন, তা হলো, বনু তামীমের অরক্ষিত অবস্থা। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তিনি তাদের তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করবেন না। কিন্তু বাতাহ অভিযানের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছেন যা বাস্তবায়ন করবেন।

দু'দিন চলার পর আনসারদের দূত এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপেক্ষা করতে বলেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করেন এবং পরে আনসারগণ গিয়ে তার সাথে মিলিত হন।

বাতাহতে লোকদের নেতা ছিল মালিক ইবনে নুওয়াইরা। বাতাহ পৌছে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চতুর্দিকে সৈন্যদের ছোট ছোট দল প্রেরণ করে লোকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেন। বনু তামীমের নেতৃবর্গ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং যাকাত প্রদান করল।

অবশ্য মালিক ইবনে নুওয়াইরার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল এবং লোকজন থেকে দূরে অবস্থান করছিল। খালিদের

সৈন্যরা তাকে এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বন্দী করল। পরে বন্দীদের ব্যাপারে সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিল। সুতরাং কাতাদা হারিস ইবনে রিবজি আনসারী বললেন যে, তাদের তিনি নামায আদায় করতে দেখেছেন। অন্যরা বলল যে, তারা আযানও দেয়নি, নামাযও আদায় করেনি।

তারপর যা হয়েছে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, মালিক এবং তার সঙ্গীরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বন্দীশালায় রাত কাটিয়েছে। এ সময় খালিদের ঘোষণাকারী ঘোষণা দিল যে, বন্দীদের গরম কর। কিন্তু পাহারাদাররা মনে করলে যে, এতে তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা বন্দীদের হত্যা তবে ফেলল। আরেক বর্ণনায় এসেছে, যিরার ইবনে আযওয়ার মালিক ইবনে নুওয়াইরকে হত্যা করেন।

বন্দীদের হত্যা করা এবং ঘোষণাকারী ও সৈন্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সংবাদ অবগত হয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে আসেন। তিনি বললেন, ‘আল্লাহ যখন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তা যথার্থই করেন।’ কিছু লোক মনে করেন, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে বাড়াবাড়ি করেছেন এবং এ হত্যাকাণ্ডের কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

আরেক বর্ণনা মতে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মালিক ইবনে নুওয়াইরকে ডেকে এনে সাজাহর মতাবলম্বন এবং যাকাত প্রদানে বিরত থাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ‘তোমার কি জানা নেই যে, যাকাতের বিধান সালাতের বিধানের সাথে মিলিয়ে একত্রে দেয়া হয়েছে?’ মালিক বলল, ‘তোমাদের সাথী (নবী) তো এ রকমই মনে করেন।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তিনি আমাদের সাথী, তোমার সাথী (নবী) নন কি?’ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ঘোষণা করেন, ‘হে যিরার! এর গর্দান উড়িয়ে দাও।’ তারপর মালিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়।

যা হোক, পুরো ঘটনা নিয়ে আবু কাতাদা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে কথা বলেন এবং এ নিয়ে দু’জনের তর্ক-বিতর্কও হয়। সুতরাং আবু

কাতাদা খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে অভিযোগ পেশ করেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সীমাতিক্রম করেছেন এবং অযৌক্তিকভাবে একদল লোককে হত্যা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু কাতাদার পক্ষ নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘খালিদকে অপসারণ করুন।’ মালিকের ভাই, মুতামমিম ইবনে নুওয়াইরা, এসেও খালিদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। কিন্তু এসব যুক্তি-তর্ক শুনেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং মনে করেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিক কাজই করেছেন। তিনি খালিদের কাজকে এই কথা বলে অনুমোদন দেন, যে তরবারিকে স্বয়ং আল্লাহ কাফিরদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন, আমি তাকে কোষবদ্ধ করতে পারি না।’ তথাপি মুতামমিমকে সম্বুট করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে মালিক ইবনে নুওয়াইরার রক্তপণ আদায় করে দেন।^{১০৭}

শিক্ষা ও উপদেশ

১। বনু তামীমের সকল সদস্যই মুরতাদ ছিল না

কিছু কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবে পুরো বনু তামীম গোত্রই ধর্মত্যাগ করেছিল বলে চিত্রায়িত করা চেষ্টা করেছেন। এটা সম্পূর্ণই মিথ্যা। বনু তামীম একটি বিশাল গোত্র যার অনেক শাখা অথবা উপগোত্র ছিল। এটুকু বলা যথেষ্ট যে, বনু তামীমের প্রত্যেক সদস্য, প্রতিটি উপগোত্র এবং সকল গোত্রপতি ধর্মত্যাগ করেনি। এমনকি সামগ্রিকভাবে বনু তামীমের কিছু অংশ মুরতাদ হওয়ার পরও এ গোত্রে ইসলামের অবস্থান ছিল খুব মজবুত এবং কার্যকরী। সাজাহর অনুসারী হওয়ার পর মালিক ইবনে নুওয়াইরা তার গোত্রের মুসলমানদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট মনে করত। তারপর যখন সে সাজাহকে বনু তামীম গোত্রের ইসলামের উপর অবিচল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজি করাল, তখন সাজাহ এবং তার সৈন্যরা মালিক ইবনে নুওয়াইরার বাহিনীর সাহায্যে এক অপমানজনক পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়—যা তাদের মদীনা

^{১০৭} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩২৭)।

আক্রমণ করতে নিরুৎসাহিত করে। তখন তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের সন্ধানে থাকে এবং এজন্য তারা ইয়ামামাকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। সাজাহ ও তার বাহিনী, এমনকি মালিকের বাহিনীর সাহায্য-সহযোগিতায়ও যে একতরফা পরাজয়বরণ করে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বনু তামীমে মুরতাদদের চেয়ে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল।

কিছু বর্ণনায় সাজাহ, মালিক এবং তাদের অনুসারীদের প্রতিরোধে আর-রুবাব উপগোত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উল্লেখ করা হয়েছে। বনু তামীমের মুসলমানদের হাতে পরাজয়বরণ করে তারা আর-রুবাব উপগোত্রের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এ বর্ণনায় বনু তামীমের সর্দার কাইস ইবনে আসিম কীভাবে মদীনায় যাকাত প্রেরণ করেছিলেন, তাও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, বনু তামীমের কিছু অংশ মুরতাদ হয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগই ইসলামের উপর অবিচল ছিল।

২। খালিদ রা. এবং মালিক নুওয়াইরাকে হত্যা

মালিক ইবনে নুওয়াইরার মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক আলোচনা এবং মতবিরোধ রয়েছে। এ মতবিরোধের কারণ একটি প্রশ্ন : তাকে কি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, নাকি ন্যায়সঙ্গত কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল? সে কি কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে, নাকি মুসলমান হিসেবে? বেশিরভাগ মতবিরোধ পরস্পরবিরোধী বর্ণনা এবং সূত্রের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

ড. আলী আল-আতুম তার হারাকাতুর-রিদা নামক কিতাবে মালিক ইবনে নুওয়াইরার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। শায়েখ মুহাম্মাদ আত-তাহির তার নাকদ ইলমী লি-কিতাব আল-ইসলাম ওয়া-উসুল আল-হুকুম কিতাবে মালিকের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়েছে। আবার শায়েখ মুহাম্মাদ জাহির আল-কাওসারী তার মাকালাত আল-কুদুরী কিতাবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে দলীল দিয়েছেন এবং মালিক ইবনে নুওয়াইরার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

আরও অনেক কিতাব এই বিষয়ে লেখা হয়েছে। আমি সবচেয়ে বেশি আশ্বস্ত হয়েছি ড. আলী আল-আতুমের যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং তার মতামত পড়ে। আমি মনে করি, তিনি কিতাবটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন এবং অনেক উঁচু পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি প্রমাণিক দলীলের উপর নির্ভর করেছেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তিনি কেবল মালিকের মৃত্যুদিবসের আলোচনা করেননি, বরং তার জীবনবৃত্তান্ত, অতীত কর্মকাণ্ড এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিত্র সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেছেন।

ড. আল-আতুম সঠিকভাবেই শেষ মন্তব্য পেশ করেছেন যে, ঔদ্ধত্যের কারণেই মালিককে এমন পরিণতিবরণ করতে হয়েছে। আর কী কারণে সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসতে দেরি করেছে, যেখানে বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআতগ্রহণ করেছিল? কী কারণে সে তার লোকজনকে যাকাত দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল? সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এটা জানা যায় যে, মালিক ছিল প্রচণ্ডভাবে ক্ষমতালোভী এবং তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা খলীফার প্রতি অনুগত ছিল, সে তাদের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিল।

মালিকের কথা এবং কাজই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যথেষ্ট। সে সাজাহর পক্ষ অবলম্বন করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে যে ছিল একজন ডগু নবীর দাবিদার। আর যখন তার গোত্রের লোকেরা যাকাতের জন্য উট জমা করেছে, সে সেগুলো খলীফার নিকট না পাঠিয়ে তার লোকজনের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। বস্তুত, সে প্রকাশ্যেই খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যাকাত পাঠাতে নিষেধ করেছে। অধিকন্তু সে তার মুসলমান আত্মীয়-স্বজনদের উপদেশ গ্রহণেও চরম অনীহা প্রকাশ করেছে। তারা তাকে ইসলামে দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরের ঘটনাগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, মালিক ইসলামের চেয়ে কুফরের দিকেই ধাবিত ছিল।

অনেকে বলতে পারেন যে, শেষ অবস্থাই বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্তও সে তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর

সঙ্গে তার কথোপকথনে (যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘তোমাদের সাথী’ বলে সম্বোধন করেছে, ‘আমাদের সাথী’ বলেনি। এ থেকে পরিষ্কার যে, ইসলাম কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

যদি মালিকের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে, শেষ সময়ে সে নামায পড়েছে, তবু এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তার নামায নয়, বরং সে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তখন আরব অঞ্চলগুলোতে অনেক গোত্রই নামায পড়ত। তবুও তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণে তাদের মুরতাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে (ইসলামের যে কোনো একটি স্তম্ভকে অস্বীকার করা মানে পাঁচটি স্তম্ভকেই অস্বীকার করা)।

ইবনে সালাম তার তাবাকাত ফুহুল আশ-শুআরা কিতাবে লেখেন, ‘এ বিষয়ে সবাই একমত যে, খালিদ ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে মালিকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছে যেখানে মালিক নামায পড়াকে মেনে নিয়েছে কিন্তু যাকাত সম্পর্কে আজ্ঞে-বাজ্ঞে কথা বলেছে।’^{১০৮} আর ইমাম নববী তার শারহু সহীহ মুসলিম কিতাবে লেখেন, ‘মুরতাদদের মধ্যে অনেকে যাকাত দিতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু তাদের নেতারা তা দিতে বাধা দিয়েছে। বনু ইয়ারবু গোত্রের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছিল : এর সদস্যরা যাকাতের জন্য মাল জমা করে খলীফার নিকট পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু মালিক ইবনে নুওয়াইরা তাদের তা দিতে নিষেধ করেছে এবং এর পরিবর্তে সে তাদের মধ্যে যাকাতের মাল বণ্টন করে দিয়েছে।’^{১০৯}

৩। উম্মে তামীমের সঙ্গে খালিদ রা.-এর বিয়ে

উম্মে তামীমের পুরো নাম লাইলা বিনতে সিনান আল-মিনহাল। সে ছিল মালিক ইবনে নুওয়াইরার স্ত্রী। মালিককে হত্যা করা হলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন।

^{১০৮} তাবাকাত ফুহুল আশ-শুআরা, টীকা এবং ব্যাখ্যা, মাহমুদ শাকির (পৃ. ১৭২)।

^{১০৯} শরাহ আন-নববী আলা সহীহ মুসলিম (১/২০৩)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে উম্মে তামীমের সঙ্গে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে কোনো বিতর্কিত বিষয় ছিল না; এমনকি পরের কয়েক শতাব্দীতেও ছিল না। ইদানিং তাদের বিয়ের ব্যাপারে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়েছে এবং যারা এ কাজ করেছে, তারা স্পষ্টতই ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এবং তাদের যুক্তির পেছনে প্রমাণিক কোনো দলীলও নেই। তারা দাবি করে যে, বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মে তামীমকে বিয়ে করেন। কারণ, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা তার প্রেমাসক্ত ছিলেন; তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিয়ে একটি অভিনয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের এই দাবির পেছনে কোনো প্রমাণ নেই এবং এ থেকে রাসূলের একজন প্রিয় সাহাবীর নামে কলঙ্ক লেপন করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। সত্যিকার অর্থে, প্রমাণিক দলীলের ভিত্তিতে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শরীয়ত অনুযায়ীই উম্মে তামীমকে বিয়ে করেছিলেন। এজন্য তখন কেউ এ বিয়ের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি।

উপরোল্লিখিত দাবিটি অনেকগুলো কারণে বিরোধপূর্ণ এবং অপ্রমাণিত। প্রথমত, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মে তামীমকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণেই মালিক ইবনে নুওয়াইরাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, মালিক মুরতাদ হওয়ার কারণে উম্মে তামীমের সঙ্গে তার বিয়ে এমনিতেই ভেঙে গিয়েছিল; তারা ঘনিষ্ঠ কোনো কার্যকারণের ক্ষেত্রে পরস্পরের জন্য আগন্তুকে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয়ত, মুরতাদদের স্ত্রীসহ অন্যান্য মহিলা আত্মীয়-স্বজনকে শত্রুবেষ্টিত এলাকায় বন্দী করা হয়েছিল। তাদের হত্যা করা হয়নি, বরং দাসী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল যা ইমাম আস-শারাখসারি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উম্মে তামীম বন্দী হয়ে দাসীদের তালিকাভুক্ত ছিলেন যাকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জন্য পছন্দ করে নেন। তারপর ইদতকাল শেষে তিনি তাকে বিয়ে করেন। এ ঘটনা শরীয়ত এবং ইসলামী যুদ্ধের আইন অনুযায়ীই বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

শায়েখ আহমাদ শাকির রহ. বলেন যে, যখন কোনো নারীকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করা হতো, তখন তার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা হতো না; পরবর্তী মাসিক পিরিয়ড শেষ হওয়া পর্যন্ত কেবল

অপেক্ষা করা হতো। কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি দাসী হতো, তখন সে তার মনিবের জন্য নীতিগতভাবে জায়েয ছিল না। তবে বাচ্চা প্রসব করার পর ঐ দাসী মনিবের জন্য দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উপযোগী হতো। অন্যথায়, মহিলা দাসীর মাসিককাল পার হলেই শরীয়ত অনুযায়ী সে মনিবের জন্য জায়েয হতো।

সুতরাং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সমালোচনার কোনো ভিত্তি নেই। যারা কেবল তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেন, তারাই উম্মে তামীমের সঙ্গে তার বিয়েকে সমালোচনা করেছেন এবং তারা তার বিয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করে দাবি করে যে, মালিক একজন মুসলমান ছিল এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মে তামীমকে বিয়ে করার জন্য মালিককে হত্যা করেছে।^{১১০}

কুচক্রীরা আরও দাবি করে যে, উম্মে তামীমকে বন্দী করার পর এত দ্রুত খালিদ তাকে বিয়ে করে যা আরব শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, আল-আক্কাদ লেখেন, ‘খালিদ মালিককে হত্যা করে এবং মালিকের স্ত্রীকে যুদ্ধের পটভূমিতেই বিয়ে করে, এতে এত বেশি তাড়াহুড়ো করা হয় যা ইসলামপূর্ব এবং পরে আরব সংস্কৃতির পরিপন্থী; এ তাড়াহুড়ো বিয়ের ঘটনাটি শুধু মুসলমানদের সংস্কৃতিরই পরিপন্থী নয়, বরং এটা শরীয়তেরও হুকুমের বিপরীত।’^{১১১}

আক্কাদ অবশ্যই বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেননি। তার এ মন্তব্য সত্যবর্জিত এবং ইসলামপূর্ব ও পরে যুদ্ধ সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটা থেকেও অনেক দূরে। ইসলামপূর্ব যুগে এ রকম অহরহই ঘটত। আরবরা যুদ্ধে জয়লাভ করেই নারী বন্দীদের বিয়ে করত। মূলত তারা এ কাজে গর্ববোধ করত। এ কারণে ইসলামপূর্ব যুগে দাসীদের গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়ায় আরবদের পরিবার ছিল অনেক বড়।

আর শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আক্কাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল মারাত্মক ভুল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যা করেছিলেন, তা শুধু শরীয়ত

^{১১০} হারাকাভুর-রিদা (পৃ. ২৩০)।

^{১১১} আবকারিয়াতুস-সিদ্দীক (পৃ. ৭০)।

কর্তৃক অনুমোদিতই ছিল না, বরং তার চেয়ে অনেক উত্তম মানুষও একই কাজ করেছিলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনা করার পূর্বে আকাদের উচিত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পুনর্বার দেখে নেওয়া। মুরাইসি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল-হারিস আল-মুসতালাকিয়্যাকে বিয়ে করেন। বনু মুসতালিক গোত্রের জুওয়াইরিয়্যা এ যুদ্ধে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু অর্থ দিয়ে তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এখন এ বিয়ের কারণে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রীর স্বগোষ্ঠীয় লোকজনকে দাস-দাসী হিসেবে রাখতে চাননি। এজন্য তারা বনু-মুসতালিক গোত্রের একশ বন্দীকে মুক্ত করে দেন। এ বিয়ের অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই জুওয়াইরিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা আল-হারিস আল-দিরার মুসলমান হন^{১২} এবং তার স্বগোষ্ঠীয় লোকজনও তাকে অনুসরণ করেন।

আরেকটি ঘটনায় খাইবার যুদ্ধের সমাপ্তির পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী বংশোদ্ভূত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বিয়ে করেন। তিনি খাইবারে অথবা ফেরার পথে বাসর রাত উদযাপন করেন।^{১৩} যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উম্মতের জন্য সর্বক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ, সুতরাং এটা পরীক্ষার যে, উম্মে তামীমের সঙ্গে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে ছিল দোষমুক্ত।^{১৪}

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, যদি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা অন্য যে কেউ কোনো ভুল করে, সেটাকে আমরা অবশ্যই কোনো অগ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই চিহ্নিত করব। এখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকেল-এর মন্তব্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্ভবত তিনি ভালো নিয়তেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, কিন্তু যেসব খোঁড়া যুক্তি দেখিয়েছেন তা সম্পূর্ণ

^{১২} সিরাহ ইবনে হিশাম (২/২৯০, ২৯৫)।

^{১৩} সিরাহ ইবনে হিশাম (২/৩৩৯)।

^{১৪} হারাকাতুর-রিদা (পৃ. ২৩৭)।

অগ্রহণযোগ্য এবং এর পরিণতিও বিপজ্জনক। ড. হাইকেল লেখেন, ‘কী যায় আসে যদি একজন পুরুষ একজন নারীকে আরবের সংস্কৃতির বাইরে বিয়ে করে? এবং কী এমন ক্ষতি যদি সে তার ইদতকাল শেষ হওয়ার আগেই মিলিত হয়? এটা কোনো বিষয় নাকি যদি তা একজন বিজয়ী সেনাপতি সম্পন্ন করে যে কিনা সব বন্দী দাসীদেরই গ্রহণ করতে পারে? আর যদি আমরা শরীয়তের কথা বলি, তাহলে তা খালিদের মতো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে এ রকম বিখ্যাত একজন মানুষকে এ কারণে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে যা পুরো মুসলমান জাতির জন্য কষ্টকর এবং বিপজ্জনক।’^{১১৫}

এটা প্রতীয়মান হয় যে, যেমনটি শায়েখ আহমাদ শাকির উল্লেখ করেছেন, নেপলিয়ন এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান নেতা ও রাজাদের ব্যাপারে যে রকম লেখা হয়েছে, তা থেকেই ড. হাইকেল প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ, কিছু পাশ্চাত্যের লেখকদের মতে এ রকম বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তির আইনের উর্ধ্বে। অবশ্যই এটা ইসলামের নীতি নয়। সুতরাং ড. হাইকেল যা লিখেছেন, তা একইসঙ্গে অগ্রহণযোগ্য এবং ভ্রান্ত। ইসলামের গুরু দিকে মুসলমানগণের সঙ্গে কোনোভাবেই পাশ্চাত্যের রাজা-বাদশাদের তুলনা হতে পারে না; বরং ইসলামের নীতির প্রতি সাধারণ জনগণের চেয়ে তাদের আরও বেশি জবাবদিহিতা ছিল। সংক্ষেপে যদি কেউ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে কথা বলতে চান, তাহলে সেটা অবশ্যই সম্মানজনক কাজ; তবে তার প্রক্রিয়া এবং যৌক্তিক উপস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে অবশ্যই প্রমাণিক দলীল এবং ইসলামের মূলনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ড. হাইকেলের মতামত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ।^{১১৬}

৪। সেনাপতিদের প্রতি আবু বকর রা.-এর নমনীয়তা

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মুসলমানরা যখন নামাযের জন্য আযান দেয়, তখন বন্দীরা, যার মধ্যে

^{১১৫} আস-সিদ্দীক আবু বকর রা. (পৃ. ১৪০৯)।

^{১১৬} হারাকাতুর-রিফা (পৃ. ২৩২)।

মালিক ইবনে নুওয়াইরাও ছিল, আযান দেয়; এজন্য খালিদের কিছু সৈন্য মনে করেছিলেন যে, এ কারণে বন্দীদের হত্যা করা ঠিক হয়নি। এ রকম একজন সৈন্য ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সঠিকভাবে না হলেও সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; তিনি মনে করেছেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মালিক ইবনে নুওয়াইরাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সীমা অতিক্রম করেছেন। তারপর আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ত্যাগ করে খলীফার নিকট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেশ করার জন্য মদীনার দিকে রওনা হন।

আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় পৌঁছে খালিদের কাজের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব আহত হন এবং দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। তবে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাজেই বেশি আহত হয়েছিলেন। সর্বোপরি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি; তিনি এবং তার লোকেরা শত্রুবেষ্টিত এলাকায় অবস্থান করছিলেন এবং তখন পরিস্থিতিতেই যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। সুতরাং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন যে, এ রকম এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সেনাপতিকে ত্যাগ করা আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কিছুতেই ঠিক হয়নি। এজন্য আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে তার পূর্বের সহযোগীদের সঙ্গে যোগদান করতে বলেন।^{১৭} যুদ্ধের সময় সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং সামরিক কমান্ডারদের প্রতি অনুগত থাকা খুব জরুরি।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু কাতাদার অভিযোগকে অবহেলা করেননি। তিনি আবু কাতাদার অভিযোগ শুনেছেন, বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বর্ণনাও শুনেছেন। তারপর

^{১৭} হারাকাতুর-রিক্বা (পৃ. ২৩১)।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি ভিত্তিহীন এবং এ ব্যাপারে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্দোষ। উল্লেখ্য যে, আবু বর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদের সব কর্মকাণ্ডের, মালিক ইবনে নুওয়াইরা যাকাত দিতে অস্বীকার করা থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত, অনুমোদন দিয়েছিলেন।

ঘটনার ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কথা শুনেছেন, তার নিকট এ বিষয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রমাণিক দলীল পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সবশেষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরোপুরিভাবেই নির্দোষ।

সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অবস্থান বিবেচনা করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে সুলতকেই অনুসরণ করেছেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ-বিগ্রহে যেসব কাজ করেছেন, কখনও প্রতিহিংসাবশত, আবার কখনও অজ্ঞানতাবশত, সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও অস্বস্তিবোধ করেননি; মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বপদে বহাল রেখেছেন এবং পদচ্যুত করেননি। সীমা অতিক্রম করলে খালিদের অনুশোচনাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করতেন। সামগ্রিকভাবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য প্রখ্যাত সাহাবীদের মতো এত বেশি হয়তো জ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু সমরনেতা হিসেবে দুর্দান্ত, অতুলনীয়। বস্তুত তিনি মুসলিম জাতির জন্য এক বিরাট সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تُؤْذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّنْ سَيُوفِ اللَّهِ، صَبَّهَ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ

খালিদের ক্ষতি করো না। সে আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি যা অবিশ্বাসীদের জন্য কোষমুক্ত করা হয়েছে।^{১৮}

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আচরণের একটি নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। একজন নেতাকে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হয়; তিনি একতরফাভাবে নরম এবং নমনীয় হবেন না, আবার তিনি একতরফাভাবে কঠিন এবং রূঢ়ও হবেন না; বরং তার মধ্যে এই দু-টি গুণেরই ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থিতি থাকবে। সমস্যা হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রকৃতিগতভাবেই নমনীয় স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তারপরেও তিনি যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি তার চরিত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে কঠোরতাও যোগ করেন—এজন্যই তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে এত শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেহেতু দৃঢ়তা ও নমনীয়তা—উভয় চরিত্রের ভারসাম্যপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি যোগ্য লোকদের সাহায্য নিয়েছেন। যদি একজন নেতা নরম প্রকৃতির হয় এবং এক শক্ত প্রকৃতির লোক তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাহলে সঠিক ভারসাম্যে পৌঁছা সম্ভব। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, আর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

বিপরীত দিকও সত্য। যদি একজন নেতা কঠিন প্রকৃতির হন, তাহলে একজন নরম প্রকৃতির উপদেষ্টা তাকে ভারসাম্যে পৌঁছাতে সহায়তা করতে পারেন। এ কারণেই খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা ইবনে আল-জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা আস-সাকানী রাযিয়াল্লাহু আনহু, আন-নুমান ইবনে মুকরিন রাযিয়াল্লাহু আনহু, সাঈদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং এ রকম আরও সাহাবীদের উপর নির্ভর করেছিলেন যারা ইবাদতকারী হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন এবং যাদের জীবনাচরণ ছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীত। খলীফা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পূর্বের চেয়ে অধিক নমনীয় ও সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সঠিক ভারসাম্যে পৌঁছার কারণেই তিনি এই বিশেষণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন—‘মু'মিনদের নেতা’।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে তিনি অব্যাহতভাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সার্ভিসকে কাজে লাগিয়েছেন—কেবল মুরতাদদের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইরাক ও সিরিয়া অভিযানেও। আবু বকর

রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রয়োজন ছিল। যদি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো ভুলও করে থাকেন, তাহলে তার সম্পর্কে ভালো চিন্তা করে তাকে ক্ষমার জন্য কোন ওয়র তালাশ করতেন; নতুবা তাকে শুধরে দিতেন এবং তিরস্কার করতেন; তবে তিনি তাকে কখনও পদচ্যুত করতে চাননি। তাকে সেনাপতির পদে বহাল রাখার পরিণতি তাকে পদচ্যুত করা থেকে অনেক উপকারী; সত্যিকার অর্থে তার মতো যোগ্য কেউ ছিল না।

সংক্ষেপে, একজন নেতা যদি নমনীয় হন, তাহলে তার সভাসদবৃন্দ এবং উপদেষ্টাগণকে কঠিন হতে হবে এবং নেতা যদি কঠিন হয়, তাহলে সভাসদবৃন্দ এবং উপদেষ্টাগণকে নরম হতে হবে—সবকিছুতেই ভারসাম্যে পৌঁছার জন্য। এ কারণেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতি হিসেবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রেখেছেন এবং ঐ একই কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পর তাকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেছেন এবং তার পরিবর্তে আরও নমনীয় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দিয়েছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়ের দৃঢ়চেতা মনোবলের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত প্রতিফল হয়তো ভালো হতো না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়ে একইভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে সচেষ্ট ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে একাই ছিলেন পরিপূর্ণ ভারসাম্যের প্রতীক, প্রয়োজন সাপেক্ষে নরম অথবা কঠোর। এজন্য তিনি নিজের জন্য বলেছেন,

أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَةِ

আমি রহমতের নবী; আমি হত্যার নবী (যুদ্ধে)।^{১১৯}

৫। ওমান এবং বাহরাইনে ধর্মত্যাগীদের তৎপরতা

ওমানের লোকজন মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের ইসলামের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর

^{১১৯} মুসনাদে আহমাদ, (৪/৩৯৫, ৪০৪, ৪০৭)।

ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু দিনের জন্য ওমানে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাকালের পর আরব অন্যান্য অঞ্চলের মতো ওমানের লোকজনও একই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাকালের কিছুদিনের মধ্যেই মুকুটধারী লাকীত ইবনে মালিক আস-আযদী নামক এক ব্যক্তি ওমানে আত্মপ্রকাশ করে। সেও নবুওয়াতের দাবি করেছিল। ওমানের মূর্খরা তার অনুসারী হয়। অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে এবং ওমানের দু-জন প্রসিদ্ধ নেতা জায়ফার ও আব্বাদকে উচ্ছেদ করে পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেয়। জায়ফার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট লোক পাঠিয়ে অত্র এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানায়।

এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের দু-টি দল প্রেরণ করেন। এর মধ্যে একদলের সেনাপতি ছিলেন হুজাইফা ইবনে মিহসান হিমযারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যটির আরফাজা আল-বারিকী আল-আযদী রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের নির্দেশ দিলেন যে, একত্রে ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উভয়ে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধ শুরু করবে ওমান থেকে। ওমানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে হুজাইফা, আর মাহরানের অভিযানে সেনাপতি হবেন আরফাজা। এদিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ওমানে গিয়ে হুজাইফা ও আরফাজার সাথে মিলিত হবার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি হুজাইফা ও আরফাজার প্রতি চিঠি প্রেরণ করে তাদের ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতকে প্রাধান্য দিতে বলেন।

ওমানের সন্নিহিতে পৌঁছে হুজাইফা এবং আরফাজা জায়ফারকে তাদের আগমন সংবাদ দেন। জায়ফারের কাছে এ সংবাদ সময়মতো পৌঁছে। তবে লাকীত ইবনে মালিকও মুসলিম সেনাদের আগমনের খবর জেনে যায়। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে মুরতাদ লাকীত তার সৈন্যবাহিনীকে 'দাবা' নামক স্থানে জমায়েত করে। দাবা সে দেশের প্রধান শহর ও বড় বাজার।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করে লাকীত রণক্ষেত্রে দলের সব নারী, শিশু ও ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়। এদের বাহিনীর পশ্চাতে রেখে দেয়া হয়েছিল সৈন্যদের উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দিতে যা একসময় ছিল খুবই কার্যকরী এবং বিপজ্জনক। কারণ, এটাতে নারী ও শিশুদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যা হোক, লাকীত ভালো করেই জানত যে, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। হয় সে জিতবে এবং ক্ষমতা লাভ করবে, অথবা হারবে, আর কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। সংক্ষেপে এটা ছিল তার জীবন-মরণ লড়াই।

ইতিমধ্যে জায়ফার, আবআদ এবং তাদের অনুসারীরা সাহার নামক স্থানে সৈন্য সমবেত করে এবং খুব দ্রুতই তারা হুজাইফা ও আরফাজার সৈন্যবাহিনীর দেখা পান।

এরপরই মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে লাকীত বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এমনকি তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উপক্রম হয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহর দয়া ও সাহায্য তাদের প্রতি নেমে আসে। বনু নাজিয়া ও বনু আবেদ কাইস তাদের আমীরদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর স্বপক্ষে শরীক হয়ে পড়েন। তারা এসে যোগদান করার পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুশরিকরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে প্রায় দশ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করাসহ তাদের ধন-সম্পদসহ বাজারের সমুদয় দ্রব্যাদি করায়ত্ত করে নেন। গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আরফাজার নেতৃত্বে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়।^{১২০}

এ যুদ্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদের বিজয়ে ভূমিকা রাখে। প্রথমত, ওমানের অধিকাংশ অধিবাসী লাকীতকে অনুসরণ না করে ইসলামের উপর অটল ছিল এবং জায়ফার ও আব্বাদের নেতৃত্বে লড়াই করেছে। দ্বিতীয়ত, জায়ফার, আব্বাদ ও তাদের অনুসারীরা দীর্ঘ সময়

ধরে একই এলাকায় নিরাপদে অবস্থান করতে পেরেছেন যতক্ষণ না মুসলিম বাহিনী দৃশ্যপটে এসে হাজির হয়েছে। তৃতীয়ত, বনু নাজিয়া ও বনু আবেদ কাইস মুসলমানদের সাহায্যে একদম উপযুক্ত সময়ে এসে যোগদান করে যা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয়ের পরিবর্তে মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিকার ও চরম বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।^{১২১}

বাহরাইনে মুরতাদদের তৎপরতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব ভূখণ্ডের বাইরে বিভিন্ন দেশে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নেতা এবং রাজা-বাদশাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত পাঠিয়েছেন। এভাবে তিনি আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন। বেশিরভাগ শাসকরাই ইসলামগ্রহণ করেনি। তবে বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাবী আল-আবাদী আগ্রহসহকারে আলা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ইসলামগ্রহণ করেন। পরে তার স্বদেশের লোকজনও ইসলামগ্রহণ করে। মুনযির শাসক হিসেবে বাহরাইনে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর আহ্বানে শাসক মুনযিরের প্রতিক্রিয়া ছিল খুব হৃদয়গ্রাহী এবং যৌক্তিক : ‘আমি আমার রাজত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, রাজা হওয়ার কারণে আমি শুধু এই দুনিয়ায় উপকৃত হব, কিন্তু আখেরাতে এ রাজত্ব কোন কাজে আসবে না। সুতরাং ইসলামগ্রহণ করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই যা কিনা আমাকে এই দুনিয়ায় এবং মৃত্যুর পরও আমাকে শান্তি দেবে। গতকাল (যখন আমি প্রথম ইসলামের কথা শুনি) আমি যারা ইসলামগ্রহণ করেছিল, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি এবং আজ যারা গ্রহণ করছে না, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হচ্ছি।’^{১২২}

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল-মুনযির রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তেকালের পরই বাহরাইনের পরিস্থিতি বদলে যায়।

^{১২১} প্রাপ্ত।

^{১২২} আ-তারতীব আল-ইদারিয়া (১/১৯)।

বাহরাইনবাসী মুরতাদ হয়ে যায়। বিভ্রান্ত ও দান্তিক মুনযির ইবনে নুমান আল-যাক্কর শাসক নিযুক্ত হয়।^{১২৩}

বাহরাইনবাসী সবাই মুরতাদ হয়নি। যারা ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন, তারা বাহরাইনে ইসলাম, শান্তি এবং ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন রাসূলের সাহাবী জারুদ ইবনে মু'আল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন।

জারুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে স্বদেশের লোকজনকে ইসলামে দিকে আহ্বান করেন। তারা সবাই তার ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্তেকালের অব্যাহতির পরেই সবাই ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। আব্দুল কাইস গোত্রের সদস্যরা একে অন্যকে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে মারা যেতেন না।' সুতরাং তারা মুরতাদ হয়ে যায়। জারুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের এই অবস্থার কথা জেনে সবাইকে সমবেত করেন। তারপর সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলেন, 'হে আব্দুল কাইসের বংশধররা! আমি তোমাদের একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, জানা থাকলে উত্তর দেবে, জানা না থাকলে উত্তর দেবে না। তোমরা জান না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আল্লাহ আরও নবী পাঠিয়েছিলেন?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাকে দেখেছ, না জেনেছ?' তারা বলল, 'তার সম্পর্কে জেনেছি।' তিনি বললেন, 'তারা কি করেছিলেন?' তারা বলল, 'মারা গিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'তারা যেমন মারা গিয়েছেন, তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মারা গিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' তারা বলল, 'আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনিই

আমাদের নেতা।' এভাবে তারা মন পরিবর্তন করে ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশ্যই এটি জারুদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য একটি স্বরণীয় ঘটনা, যিনি দেখিয়েছেন—জ্ঞান এবং হেকমত দিয়ে অন্যের মন ও মানসিকতায় প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। সত্যিকার অর্থে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যেমন জীবনধারণের জন্য পানি অপরিহার্য।

বাহরাইনে জাওয়াসা শহরের অধিবাসীরা ইসলামের উপর অবিচল থাকেন। সুতরাং বাহরাইনের মুরতাদরা তাদের শহরকে অবরোধ করে এবং রসদ-সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়ে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। অবরোধের ফলশ্রুতিতে জাওয়াসা অধিবাসীরা মারাত্মক ক্ষুধার কষ্টে ভুগতে থাকে। শীঘ্রই আল্লাহ তাদের মুক্তির পথ বের দেন। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের পরীক্ষায় ফেলেছিলেন এবং এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যদিও অনেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রায় মৃত্যুমুখে ছিলেন। এ কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের মনোবল ছিল শক্ত। কারণ, তারা ঈমানে দৃঢ় ছিলেন এবং আল্লাহর উপর তাদের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন নির্ভরতা ছিল।^{১২৪}

তাদের কষ্টের শেষ হয় যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনী এ এলাকায় আগমন করে। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বাহরাইনের নিকটবর্তী হলে সুমামা ইবনে উসাল বিরাট এক বাহিনীসহ তার সঙ্গে যোগ দেন। তাছাড়া জারুদ ইবনে আল-মু'আল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহুও বনু আব্দুল কাইস গোত্রের উল্লেখযোগ্য সৈন্য নিয়ে তার বাহিনীতে যোগ দেন। এ বিরাটসংখ্যক সৈন্য বাহিনী নিয়ে আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করেন। মুরতাদদের উৎখাতে আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বড় রকমের সহায়তা করেন কাইস ইবনে আসিম আন-নাকরী, আফিফ ইবনে আল-মুনযির এবং আল-মুসান্না ইবনে হারিসা আস-শাইবানী।^{১২৫}

^{১২৪} আত-তারিখ আল-ইসলামী, আল-হুমাইদী (৯/৯৮)।

^{১২৫} আস-সাবিতুনা আল্লাহ ইসলাম (পৃ. ৬৩)।

৬। আলা ইবনে হাযরামী রা.-এর কারামত

আধুনিক মুসলমানদের নিকট আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হয়তো বেশি পরিচিত সাহাবী নন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। এমনকি অনেক উঁচু জ্ঞানের অধিকারী সাহাবীদের মধ্যে তাকেও একজন স্কলার মনে করা হত এবং তার চেয়েও বেশি—তিনি একজন আবিদ ছিলেন। তবে সম্ভবত আরেকটি কারণে আলা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সবেচেয়ে বেশি সম্মান করা হতো : তিনি এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে আল্লাহর এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তিনি কোনো দুআ করলেই আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল করে নিতেন।

বাহরাইনের এই অভিযানে তার দুআর কারামত প্রকাশ পায়। শত্রুর ভূখণ্ডে আসার পথে আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনী এমন এক ক্ষতির সম্মুখীন হন যাতে সবার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। কারণ, তিনি মরুভূমির পথে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন। লোকজন তখনও ঠিকমতো বসতে পারেনি। এরই মধ্যে যেসব উটের উপর সৈন্যদের খাদ্য, পানীয় ও তাঁবু বোঝাই ছিল, সে উটগুলো সবই পালিয়ে যায়। পরিধেয় কাপড় ছাড়া আর কিছুই তাদের সাথে ছিল না।

ঘটনা হয়েছিল রাতে। সুতরাং একটি উটও তারা ধরতে পারলেন না। সবাই আশা হারিয়ে ফেললেন। গ্রাম ও শহর থেকে অনেক দূরে, সৈন্যরা জানতেন যে, এটা কেবল সময়ের ব্যাপার, মরুভূমির উত্তাপ এবং পানির অভাবে তারা শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তাদের ঘিরে ধরল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তারা তাদের শেষ ইচ্ছা এবং অভিব্যক্তি একে অন্যকে ব্যক্ত করতে লাগলেন।

আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দলের লোকদের এত বিষণ্ণ চেহারা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সবাইকে তার নিকট সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাদের বললেন, ‘হে লোকসকল, আপনারা কি মুসলমান নন? আপনারা কি আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হয়ে আসেননি? আপনারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী নন?’ তারা সবাই বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, এখন আপনারা যে

অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় আল্লাহ কাউকে লাক্ষিত করবেন না।' তারপর ফজরের আযান দেয়া হলো।

তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর দু-হাত উঁচিয়ে দুআ করতে লাগলেন। অন্যরা সবাই তাই করল। ইতিমধ্যে সূর্য উদিত হলো। উপস্থিত সবাই দেখল সূর্যের কিরণ ঝকঝকিয়ে উঠছে। আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবিষ্টচিত্তে দুআর মধ্যে ডুবে আছেন। তারপর হঠাৎ করে আল্লাহ তাদের পার্শ্বে পরিকার পানির বিরাট কুয়ো সৃষ্টি করে দেন। তারপর আলা এবং তার সাথীরা সবাই কুয়োর কাছে গিয়ে পানি পান করলেন ও গোসল করলেন। বেলা যখন আরও বৃদ্ধি পেল তখন তাদের উটগুলো বিভিন্ন পথ বেয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। উটের পিঠে রাখা সমস্ত মালামাল পাওয়া গেল, একটি সুতো পর্যন্ত খোয়া যায়নি। উটগুলো সেখান থেকে একবার দু'বার করে পানি পান করল। এটা ছিল আল্লাহর এক নিদর্শন যা তিনি মুসলিম বাহিনীকে দেখান। সবাই আল্লাহর শোকর আদায় করল এবং মিশন সম্পন্ন করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলো।

মুরতাদদের পরাজয়

আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার লোকজন শত্রুবাহিনীর সন্নিহিতে এসে পৌছেন। উভয় বাহিনী একই এলাকায় কাছাকাছি রাত্রিযাপন করে। গভীর রাতে আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু হঠাৎ মুরতাদ বাহিনীর মধ্যে চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি লোকদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে, সে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারবে?' আব্দুল্লাহ ইবনে হাযাফ দণ্ডায়মান হলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, তারা মদ পান করে মাতাল হয়ে আছে এবং তাদের চেতনা লোপ পেয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে হাযাফ ফিরে এসে মুসলমানদের মুরতাদদের উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপানোৎসব সম্পর্কে সব কথা জানালেন। এ খবর শোনামাত্রই আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু সসৈন্যে তাদের উপর আক্রমণ চালালেন এবং বিপুলসংখ্যক লোককে হত্যা করলেন। অল্পসংখ্যক লোকই পালিয়ে যেতে

সক্ষম হয়। মুসলিম সৈন্যরা শত্রুদের সমুদয় সম্পদ ও পশুপাল দখল করে নেন। ফলে বিপুল পরিমাণ গণীমত তাদের করায়ত্ত হয়।

এ সময় শত্রুবাহিনীর একজন নেতা হাতম ইবনে যরীআ নিদ্রিত ছিল। মুসলমানরা তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করলে সে ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ঘোড়ায় আরোহণ করলেও তার পা রাখার রিকাব ছিঁড়ে যায়। সে বলল, ‘কেউ কি আছে আমার জিনটা ঠিক করে দেবে?’ এক মুসলমান সৈন্য তখন এগিয়ে এসে বলল, ‘আমিই ঠিক করে দেব, আপনার পা উঁচু করুন।’ যখন সে পা উঁচু করল, তখন মুসলমান সৈন্যটি তলোয়ারের আঘাতে তার পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফলে হাতম মাটিতে পড়ে গেল। সে আর এক পা নিয়ে বেঁচে থাকতে আগ্রহী ছিল না, এজন্য মুসলমান সৈন্যের প্রতি সে অনুরোধ জানাল, ‘দয়া করে আমাকে এখন মেরে ফেল।’ মুসলিম সৈন্যটি তাকে বলল, ‘আমি তা করব না।’ এই বলে সৈন্যটি চলে গেল। তারপর থেকে যে কেউ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডেকে বলে যে, আমাকে হত্যা করে দাও, কিন্তু কেউ তাতে রাজি হলো না। এক পর্যায়ে ঐ পথ দিয়ে কাইস ইবনে আসিম যাওয়ার সময় তাকে ডেকে সে বলল, ‘আমি হাতম। আমাকে হত্যা করে দাও।’ তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। কিন্তু তার পা কতিত দেখে লজ্জিত হয়ে তিনি বললেন, ‘আফসোস! আমি যদি এ অবস্থা জানতাম, তাহলে একে ধরতাম না।’

তারপর মুসলমানরা পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং পথে-ঘাটে যেখানেই যাকে পেলেন সেখানেই তাদের হত্যা করলেন। যারা পলায়ন করে বেঁচে যেতে সক্ষম হয়, তারা সকলে কিংবা অধিকাংশ লোক সমুদ্রকূলে ‘দারীন’ নামক স্থানে গিয়ে নৌকায় মালামালসহ আরোহণ করে। এ সময় আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু গণীমতের মালামাল বণ্টনে ব্যস্ত ছিলেন। বণ্টনকার্য শেষ হলে তিনি মুসলিম বাহিনীকে বললেন, ‘চল, আমরা দারীনে যাই। সেখানে শত্রু আছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।’ সবাই এতে সম্মত হলেন এবং দ্রুত যাত্রা করলেন।

আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার লোকজন দারীনে পৌঁছে দেখলেন, তাদের নৌকা বহুদূর চলে গেছে। আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে,

ঐ সময় যদি নৌকায় আরোহণ করে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতেন, তাহলে তাদের সময়মতো নাগালে পাওয়া সম্ভব হতো না। আর তাছাড়া সেখানে কোনো নৌকাও ছিল না। তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রের বুকে ঘোড়া ছোটালেন:

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِشِينَ، يَا حَكِيمُ يَا كَرِيمُ، يَا أَحَدُ يَاصِدُّ، يَا حَيُّ
يَا مُحْيِي، يَا قَيُّمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّنَا

হে মহান দয়াময়, হে প্রাজ্ঞ সত্তা, হে করুণাময়, হে একক, অনন্য, হে স্বয়ংসম্পন্ন, হে চিরজীব, হে জীবনদাতা, হে চিরস্থায়ী, হে মহা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, হে আমাদের রব।^{১২৬}

সৈন্যদেরও তিনি এই দু'আ পড়ে সমুদ্রে বাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। সকলেই তার নির্দেশমতো কাজ করল।

আল্লাহর হুকুমে সবাই উপসাগর পাড়ি দিলেন। তাদের মনে হলো, নরম বালুর উপর অল্প পানি। বালুর মধ্যে উটের ক্ষুর আটকায় না এবং পানিও এত কম যে, তা ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে না। যে পথ তারা অতিক্রম করেছেন সে পথ নৌকায় পার হতে এক দিন ও এক রাত সময় লাগে। অথচ মুসলিম বাহিনীর ওপার গিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করে গণীমতের মাল নিয়ে এপারে প্রত্যাবর্তন করতে সর্বমোট সময় লাগে মাত্র এক দিন। এ সমুদ্রাভিযানে মুসলমানদের কোনো কিছুই খোয়া যায়নি। নিরাপদে ফিরে এসে আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রাপ্ত গণীমতের দ্রব্যাদি সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। সৈন্যসংখ্যা অনেক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিজন অশ্বারোহী ছয় হাজার এবং প্রতিজন পদাতিক দুই হাজার (দিরহাম অথবা দিনার) করে ভাগ পান। তারপর আলা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সমস্ত সংবাদ লিখে পাঠান এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

এ অধ্যায়ে আলা ইবনে হায়রামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দু-টি কারামত উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কারামতসমূহের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল 'হাজার'

এলাকার অধিবাসী এক খ্রিস্টান পাদরি। তিনি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সফরে ছিলেন। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করার পর তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কেন আপনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন?’ তিনি জবাবে বললেন, ‘আমি যেসব নিদর্শন দেখতে পেয়েছি, এরপরও যদি ইসলামগ্রহণ না করতাম, তাহলে আমার আশঙ্কা ছিল যে, আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন।’ তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমে পরিণত হন এবং সাহাবীগণ তার নিকট থেকে তার কাহিনী শুনতেন।^{১২৭}

মুরতাদদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাহরাইনে আবার ইসলামী আইন, ন্যায়বিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আরব অঞ্চলগুলোতে মুরতাদদের উত্থানের পেছনে তাদের পার্সিয়ান মিত্রদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মূলত, পার্সিয়ানদের সৈন্য সরবরাহ ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া মুরতাদরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে পারত না। এ এলাকায় মুসলমানদের শত্রুর সংখ্যা ছিল প্রায় বারো হাজার। এর মধ্যে নয় হাজার পার্সিয়ান যোদ্ধা এবং মাত্র তিন হাজার আরব যোদ্ধা।^{১২৮} অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল চার হাজার।

মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাহরাইনে মুরতাদদের পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে তিনি আলা রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছেন। তিনি বাহরাইনের উত্তর দিক থেকে অভিযান পরিচালনা করে কাতেফ, হাজার এবং সবশেষে দজলা নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ পথে বিভিন্ন চৌকিতে পাহারারত পার্সিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত করেন। এসব পার্সিয়ান সৈন্যরা বাহরাইনে তাদের মিত্র মুরতাদদের সাহায্যে প্রেরিত হয়েছিল।

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জেনে বাহরাইনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইরাকে

^{১২৭} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৬/৩৩৪)।

^{১২৮} ফতহু ইবনে আসাম (পৃ. ৪৭); আস-সাবিতুনা আল্লাল ইসলাম (পৃ. ৬৪)।

তার দাওয়াতী কর্মকাণ্ড (ইসলামের প্রচার-প্রসার) অব্যাহত রাখতে বললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসান্নার প্রাপ্তিতে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেটাকে ইরাকের জনগণকে কুফরের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সম্ভবত, সর্বশেষ এবং চরম পদক্ষেপ হবে অত্র এলাকায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী প্রেরণ।^{১২৯}

^{১২৯} আবু বকর আস-সিদ্দীক, খালিদ আল-জিনাবী এবং নাযযার আল-হাদিসী (পৃ. ৪৪)।



চতুর্থ অধ্যায়

মুসাইলামা আল-কায্যাব এবং বনু হানীফা গোত্র

প্রথম। অতীত জীবন

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসাইলামা সম্ভবত মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তার সশস্ত্র ভক্ত ছিল অনেক। যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে অভিশপ্ত মুসাইলামা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, ভণ্ডামি এবং কুকর্মে মাত্রাতিরিক্তভাবে লিপ্ত ছিল। আর মুসাইলামার মৃত্যুর পর আরবী প্রবাদ বাক্য হিসেবে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, ‘মুসাইলামার চেয়েও মিথ্যুক’।

তার পুরো নাম মুসাইলামা ইবনে সুমামাহ ইবনে কাবির ইবনে হাবীব আল-হানাকী আবু শামাহ এবং সে ছিল বনু হানীফা গোত্রের সদস্য। ইয়ামামাতে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। ইয়ামামার যে গ্রামে তার জন্ম, সেটা এখন জুবাইলাহ নামে পরিচিত এবং সেটা উআইনাহর নিকটবর্তী একটি এলাকা। ইসলামপূর্ব যুগে মুসাইলামা নিজের জন্য উপাধি গ্রহণ করে ‘আর-রহমান’ এবং পরবর্তীতে তাকে ‘ইয়ামামার রহমান’ নামে অভিহিত করা হতো।^{১৩০}

যুবক বয়সে সে আরবের বাইরে দূর-দূরান্তে বিভিন্ন দেশে সফর করেছে। মানুষকে মোহাবিষ্ট করার বিদ্যা অর্জনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ করে যাদুবিদ্যা, যাদুটোনা, দুষ্ট নজর, ভাগ্য গণনা এবং এ রকম আরও

^{১৩০} হুরুব আর-রিদাহ ওয়া বিনা আদ-দাওলাহ, আহমাদ সাঈদ (পৃ. ১৩৩)।

শয়তানী কর্মকাণ্ড তার নিকট প্রিয় ছিল। একটি পাখির উপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে দর্শকের চোখে পাখিটির ডানা ভেঙে দেখাতে পারত যদিও সত্যিকার অর্থে পাখিটির ডানা অক্ষতই থাকত।

মুসাইলামা প্রথমে যখন নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও মক্কায় ছিলেন। সম্ভবত মুসাইলামা তার দাবিকে বেশি প্রচার-প্রসার করেনি, বরং সীমিত রেখেছিল। যাহোক, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে মক্কায় তার পক্ষ থেকে কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানার জন্য লোক পাঠায়। যখন তারা কুরআনের আয়াত শ্রবণ করে তা গিয়ে মুসাইলামার কাছে বর্ণনা করে, তখন মুসাইলামা এসব আয়াত তিলাওয়াত করে নিজের বলে প্রচার করতে থাকে।^{১৩১}

নবম হিজরীতে পুরো আরব উপত্যকায় ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বনু হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করার আশ্রয় প্রকাশ করে। এই দলের সঙ্গে মুসাইলামাও ছিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে মুসাইলামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা করে এবং কথা বলে। ইবনে ইসহাক তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ কথাবার্তা বর্ণনা করেননি। তবে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটে পড়ে থাকা একটি খেজুর ডালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন,

لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْعَسِيبَ مَا أُعْطَيْتُكَ

তুমি যদি আমার হাতের এই শুকনা খেজুর ডালটিও চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না।

তাদের এই কথাবার্তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসাইলামা নবুওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সঙ্গী বানাতে অথবা তার স্থলাভিষিক্ত করে দিতে অনুরোধ করে।

^{১৩১} আল-বাদ ওয়াত-তারিখ, আল-মাকদাসী; হারকাতুর রিদ্দাহ (পৃ. ৭১)।

অন্য আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, মুসাইলামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা করেনি। বরং সে পশ্চাতে থেকে হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের রসদ সরবরাহ এবং তাদের বাহন দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককে যে হাদিয়া দিয়েছিলেন, একই পরিমাণ হাদিয়া মুসাইলামার জন্যও বরাদ্দ করছিলেন। মুসলাইমার জন্য হাদিয়া বরাদ্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সে-ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নয়।’ সে যেহেতু তাদের মালামাল দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন।

বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তন

বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদল ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তন করার পরেই মুসাইলামা নিজেকে প্রকাশ্যে নবী হিসেবে ঘোষণা করে; সে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নবুওয়াতের অংশীদার দাবি করে। তার এ কথার ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ বাণী,

إِنَّهُ لَيُسْ بِشْرِكُمْ

সে-ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি কোনোভাবেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, মুসাইলামা তার গোত্রের সবচেয়ে উত্তম মানুষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকে এটাই বেশি বোঝা যায় যে, প্রতিনিধিদলের সবাই নিকৃষ্ট। সুতরাং রাসূলের কথার অর্থ হতে পারে যে, মুসাইলামা তাদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট নয়, বরং তাদের মতোই নিকৃষ্ট। পরবর্তীতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে। বনু হানীফার বেশিরভাগ মানুষই নিকৃষ্ট। তারপরেও মুসাইলামা ছিল তাদের নেতা এবং তারা তার সঙ্গে শয়তানী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করত।

নিজেকে নবী দাবি করার পর থেকে মুসাইলামা লোকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করত, কাব্যিক আয়াত বানাত এবং তার ইচ্ছা অনুসারে আইন প্রণয়ন করত। কুরআন তার উপর নাযিল হয়েছে বলে দাবি করত;

এটা প্রমাণ করার জন্য সে স্বরচিত কবিতাকে আয়াত হিসেবে উপস্থাপন করত। তার এ রকম কিছু আয়াত ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায় এবং এগুলো স্থূল, হাস্যকর ও অর্থহীন আজোবাজে উক্তিভে ভরা। তার একটি তথাকথিত ওহীতে তুচ্ছ ও মামুলি শব্দে ব্যাঙের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। যতই সে কুরআনের নাস্তানিক ও অলঙ্কারিত ভাষার নকল করার চেষ্টা করত, ততই সে নিজেকে তৃতীয় শ্রেণির কবিতার রচয়িতা হিসেবে প্রকাশ করত। তথাপি তার গোত্রের লোকেরা তাকে অবিশ্বাস করলেও গোত্রপ্রীতির কারণে তার অনুসরণ করত।

ইবনে কাসির রহ. বর্ণনা করেন যে, জাহিলী যুগে আমর ইবনুল আস একবার এক প্রতিনিধিদল নিয়ে মুসাইলামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। মুসাইলামা জানত যে, আমর ইবনুল আস কুরাইশ বংশের সন্তান। এজন্য সে তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘এই সময়ে তোমাদের নবীর উপর কী ধরনের বাণী নাযিল হচ্ছে?’ আমর ইবনুল আস বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা তার উপর সূরা আসর নাযিল করেছেন।’ মুসাইলামা বলল, ‘আমার উপরও অনুরূপ কালাম নাযিল হয়েছে। এ কথা বলে সে তার বানানো তুচ্ছ কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। মুসাইলামার আবৃত্তি শেষ হলে আমর ইবনুল আস (যিনি তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি অবশ্যই জান যে আমি জানি, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।’^{১৩২} এ ঘটনার দিকে ইশারা করে ইবনে কাসির রহ. বলেন যে, মুসাইলামার কবিতা এত জঘন্য মানের ছিল যে, তার মতো অবিশ্বাসী এবং রাসূলের চরম শত্রুর কাছ থেকেও সে কোনো সমর্থন পায়নি।^{১৩৩} আবু বকর বাকিল্লানী বলেন যে, যদিও ইতিহাসগ্রন্থে মুসাইলামার কিছু আবোল তাবোল অর্থহীন কবিতা স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পড়ার উপযোগী নয়। এগুলো কেবল হাসির খোরাক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যাতে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। আশ্চর্যের কারণ হলো, এসব তুচ্ছ ও অবাস্তব কথাবার্তা দিয়ে সে বিরাটসংখ্যক মানুষকে বিপদগামী করেছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কত বোকা ও অজ্ঞ লোক পৃথিবীতে রয়েছে!^{১৩৪}

^{১৩২} তাকসীর ইবনে কাসির (৪/৫৪৭)।

^{১৩৩} প্রাণ্ডু।

^{১৩৪} ইজাযুল কুরআন, ব্যাখ্যা : সাঈদ সাকর (পৃ. ১৫৬)।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট মুসাইলামার পত্র

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় মুসাইলামা তার কাজ-কর্মে ও কথাবার্তায় আরও বেশি লাগামহীন হয়ে ওঠে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করে যাতে সে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নবুওয়াতের অংশীদার সাব্যস্ত করে। আমার ইবনে যারুদ হানারফী মুসাইলামার পক্ষে চিঠিটি লেখে এবং উবাদা ইবনে হারিস হানারফী, যে ইবনুন নাওয়াহা নামে পরিচিত ছিল, চিঠিটি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসে। নিচে চিঠিটির পাঠ উল্লেখ করা হলো :

এই চিঠি আল্লাহর রাসূল (?) মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট। পর সমাচার এই যে, নবুওয়াতী বিষয়ে আমাকে আপনার শরীক করা হয়েছে। সুতরাং দেশের অর্ধেক আমাদের অধীনে, বাকি অর্ধেক থাকবে কুরাইশের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু কুরাইশ জাতি ন্যায়বিচার করছে না।

এর প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চমৎকার জবাব লেখেন এবং সেটি রাসূলের পক্ষ থেকে উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু লিপিবদ্ধ করেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ ،
أَمَّا بَعْدَ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

আল্লাহর নামে, যিনি পরম দয়াময় ও করুণাময়। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মিথ্যুক মুসাইলামার নিকট। শান্তি বর্ষিত হোক ঐ ব্যক্তির উপরে যে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে। পরসংবাদ এই যে, রাজ্যের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, তাকেই এর ক্ষমতা প্রদান করেন। তবে পরকালের শুভ ফল কেবল মুম্বাকীদের জন্যই নির্ধারিত।

মুসাইলামা তার চিঠিটি দু-জন লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করেছিল। একজনের নাম ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছি। তার ডাকনাম ছিল ইবনুন নাওয়াহা। চিঠিটি পড়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা দু-জন কী বলো?' তারা জবাব দিল, 'মুসাইলামা যা বলে, আমরাও তা-ই বলি।' এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَمَّا وَاللَّهِ لَا أَتَى الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرْبَتِ أَعْنَاقِكُمْ

আল্লাহর কসম! যদি দূতদের হত্যার বিধান থাকত, তাহলে আমি তোমাদের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলতাম।

হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী যা.-এর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনি কেবল সেগুলোকেই সম্মান ও কদর করতেন, তা নয়। বরং তিনি প্রচলিত আন্তর্জাতিক বিধানকেও সম্মান করতেন। ঐ সময় বিদেশি বার্তাবাহক কিংবা রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাইলামার দূতদের হত্যা করেননি। তারা দু'জনেই ইসলামের সাথে এমন জঘন্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তাদের তখনই এবং সেখানেই হত্যা করা অনিবার্য ছিল। অন্যদিকে মুসাইলামার কাছে চুক্তি, সন্ধি কিংবা আন্তর্জাতিক বিধানের কোনো মূল্য ছিল না। এজন্যই যে কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব মুসাইলামার নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছেন, সেটা ঝুঁকিপূর্ণ না হয়ে পারে না।

কাজটি ছিল বিপজ্জনক। উম্মে আম্মারাহ বিনতে কা'ব মাযিনিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহার ছেলে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বেচ্ছায় মুসাইলামার কাছে রাসূলের চিঠি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছিলেন। রাসূলের চিঠি পেয়ে তার পড়ার পর মুসাইলামা হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?' হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর মুসাইলামা তাকে আবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' হাবীব

রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি বধির এবং (তোমার কথা) শুনতে পাচ্ছি না।’ মুসাইলামা কয়েকবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল এবং হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথার জবাব দিতে অস্বীকার করল। এতে মুসাইলামা খুব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং প্রতিবার হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলে সে তার দেহ থেকে একটি একটি করে অঙ্গ কেটে ফেলতে থাকে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চরম প্রতারণা ও ভণ্ডের হাতে শহীদ হওয়া আগ পর্যন্ত হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানে দৃঢ় এবং শান্ত থাকেন। আল্লাহ তা’আলা হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সকল সাহাবীর উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

আর-রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়া হানাকী

মুসাইলামা খুব দ্রুত তার গোত্রের সব সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বনু হানীফার সবাই প্রকৃতগতভাবে শয়তানি কর্মকাণ্ডে ঝুঁকেছিল এবং এ কাজে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন নেতার অপেক্ষায় ছিল। এ গোত্রের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সম্ভবত মুসাইলামা নয়, বরং এমন এক ব্যক্তি যার নাম রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়া।

ভালোভাবেই রাজ্জালের কাহিনী শুরু হয়েছিল। সে মদীনায়ে গিয়ে ইসলাম কবুল করে, কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এমনকি কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থও করে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামামাতে গিয়ে লোকজনকে ভণ্ড নবী মুসাইলামার অনুসরণ থেকে বিরত রাখার জন্য ইসলামের প্রচার-প্রসার করতে বলেন, তখন তার চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন সূচিত হয়। সে ইয়ামামাতে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের পুরো উল্টো কাজ করে। সে লোকজনকে বলে যে, সে মদীনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাণী নিয়ে এসেছে। সে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাইলামাকে তার নবুওয়াতের অংশীদার করে নিয়েছে। এ রকম চরম নিকৃষ্ট মিথ্যা বলার দ্বারা সে বিপুলসংখ্যক লোককে মুসাইলামার ভক্ত বানাতে সমর্থ হয় যা স্বয়ং মুসাইলামার পক্ষেও সম্ভব হয়নি।^{১৩৫}

রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়াযর মধ্যে যে কুফর ও শয়তানী মনোভাবের সৃষ্টি হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশাতেই এর ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একবার আমি আরও কতিপয় লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ছিলাম। ঐ মজলিসে রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়ায ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّ فِيكُمْ لَرَجُلًا ضَرُسُهُ فِي النَّارِ أَكْظَمُ مِنْ أُخْدٍ

(এখানে উপস্থিত) তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে যার মাড়ির এক একটি দাঁত জাহান্নামের মধ্যে উহুদ পর্বতের চেয়েও বড় বড় হবে।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর বলেন, ‘ঐ মজলিসের সদস্যরা সবাই একে একে মারা গেল। বেঁচে থাকলাম কেবল আমি ও রাজ্জাল। আমি উক্ত হাদীসের জন্য সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। অবশেষে রাজ্জাল মুসাইলামার পক্ষ অবলম্বন করে এবং তার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়। এদিক থেকে মুসাইলামার ফিতনা অপেক্ষা রাজ্জালের ফিতনা আরও ভয়াবহ।’^{১৩৬}

দ্বিতীয়। বনু হানীফা গোত্রের মুসলমান

যদি কেউ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার নিকট মনে হবে যে, বনু হানীফা গোত্রের সবাই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, বেশিরভাগ ইতিহাসগ্রন্থই ইয়ামামায় মুরতাদদের গতিবিধি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছে। তবে সেখানে অবস্থানরত ইসলামের উপর অটল-অবিচল কিছু দৃঢ়প্রত্যয়ী মুসলমানদের কথা খুব কমই আলোচিত হয়েছে।

মূলকথা হলো, বনু হানীফার বেশিরভাগ মানুষই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমান তখনও ঈমানে দৃঢ় ছিলেন যদিও এর

বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া মুশকিল। কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বনু হানীফার কিছুসংখ্যক মুসলমান ঈমানে কেবল দৃঢ়ই ছিলেন না, বরং মুরতাদদের পরাজয়েও বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন।^{১৩৭}

যদি এটা পাঠকের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিচের ঘটনাটি থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, কী কঠিন পরিস্থিতিতে তারা মুসাইলামাকে নবী মানা থেকে বিরত ছিল। এ রকম একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সুমামাহ ইবনে উখাল রাযিয়াল্লাহু আনহু। সবার উচিত তাকে মুসলমানদের হিরো হিসেবে স্মরণ করা। তিনি বনু হানীফা গোত্রের একজন সর্দার ছিলেন এবং মুসাইলামার ব্যাপারে তার বিরোধিতা অনেকেরই জানা ছিল। গোত্রে তার উচ্চ মর্যাদা এবং প্রকাশ্যে মুসাইলামার বিরুদ্ধে কথা বলায় খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু হানীফা আক্রমণে এগিয়ে আসছে শুনে বনু হানীফা গোত্রের অন্যান্য মুসলমান সদস্য তার নিকট পরামর্শের জন্য গমন করে।

সুমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিজ্ঞ এবং সাহসী। তিনি প্রকাশ্যে মুসাইলামার অনুসারীদের তিরস্কার করতেন। তিনি তাদের বলতেন, ‘তোমাদের উপর দুর্ভোগ! হে হানীফার বংশধর! আমি যা বলি তা শোন, তাহলে হয়তো তোমরা হেদায়েত পাবে। আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে হয়তো তোমরা তোমাদের ব্যাপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তার নবুওয়াতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর জেনে রাখ, মুসাইলামা চরম মিথ্যুক। তার কথা এবং বক্তব্যে প্রতারণা হয় না। তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন শ্রবণ করেছ। আল্লাহ বলেন,

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلُوفِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

হা-মীম। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর

শান্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।
তারই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।^{১৩৮}

সুমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, ‘এখন এ আয়াতের সঙ্গে গোমূর্খ মুসাইলামার কথাকে তুলনা কর। কথাগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর, অবহেলা করো না। আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রাতেই রওনা হয়ে যাচ্ছি এবং আমি তার কাছে নিরাপত্তা চাইব— আমার জন্য, আমার সম্পদ, আমার স্ত্রী এবং আমার ছেলে-মেয়ের জন্য নিরাপত্তা।’ আল-কিলাঈ-এর মতে সুমামাহ এ কথাও বলেন যে, ‘এ জামানায় মুহাম্মাদই নবী এবং তারপরে আর নবী নেই।’ আল-কিলাঈ আরও বর্ণনা করেন, সুমামাহ ভণ্ড নবী মুসাইলামার তথাকথিত কিছু আয়াত (?) আবৃত্তি করে তার অসারতা প্রমাণ করেন।^{১৩৯}

যারা তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিল, তারা বলল, ‘আমরা তোমার সঙ্গে আছি, হে আবু আমির! সত্য জানার জন্য আমরা তোমাকে চাই।’ সুমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথানুসারে কয়েকজন অনুসারীদের নিয়ে সেই রাতেই খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতে গিয়ে হাজির হন। সুমামাহ তার নিকট নিরাপত্তা চান। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য এবং তার সঙ্গীদের জন্য নিরাপত্তার ওয়াদা করেন।^{১৪০}

আরেক বর্ণনায় মুসাইলামার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে সুমামাহর সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়। এখানেই সুমামাহর কাজ থেমে থাকেনি। তিনি তার সঙ্গীসহ বাহরাইনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে আল-আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে থেকে লড়েছেন। ঐ লড়াইতে অনেক বিজয়গাঁথা সুমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামের পাশে স্থান পেয়েছে।^{১৪১}

বনু হানীফার আরেকজন ইসলামের উপর দৃঢ়পদ ছিলেন। তার নাম মা’মার ইবনে কিলাব রুম্মানী রহ.। মা’মার রহ. ইয়ামামাতে সুমামাহ

^{১৩৮} সূরা গাফির, ৪০:১-৩।

^{১৩৯} হুতুব আর-রিদ্দা, আল-কিলারী (পৃ. ১১৭)।

^{১৪০} আস-সাবিতুন আলান ইসলাম (পৃ. ৫২)।

^{১৪১} আস-সাবিতুন আলান ইসলাম (পৃ. ৫৪)।

রাযিয়াল্লাহু আনহুর পড়শি ছিলেন। মা'মার রহ.-ও প্রকাশ্যে মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের ইসলামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। মা'মার রহ. নিজেও মুসলিম বাহিনীতে এসে যোগ দেন এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে বনু হানীফার মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

ইবনে আমর ইয়াশকুরী নামে এক ব্যক্তি মুসাইলামার অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে তিনি তার ঈমানের এ অবস্থানকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনি তার পুরোনো বন্ধু কুখ্যাত রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়ার অত্যাচারের ভয়ে ভীত ছিলেন। ইবনে আমর একটি কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় তিনি তার ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং ইসলাম পরিত্যাগ না করার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। মুসাইলামা এ কবিতা এবং এর রচয়িতার ব্যাপারে জানতে পেরে ইবনে আমরকে গ্রেফতার কিংবা হত্যার আদেশ দেয়। কিন্তু এতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মুসাইলামার সৈন্যরা ইবনে আমরের বাড়িতে হানা দিলেও তারা তাকে সেখানে পায়নি। ইতিমধ্যে ইবনে আমর মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে সমর্থ হন। তারপর তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং ইয়ামামার বিভিন্ন দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করেন।^{১৪২} ইসলামের উপর দৃঢ় থাকার ব্যাপারে বনু হানীফা গোত্রের আমির ইবনে মাসলামাহ এবং তার বংশের লোকেরাও প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।^{১৪৩}

মুসাইলামাকে পরাজিত করার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু হানীফা গোত্রের মুসলমানদের সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করেন। তিনি মুতাররিদ ইবনে নুমানকে গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। সুমামাহ এবং আমির ইবনে মাসলামাহ উভয়ের চাচাতো ভাই ছিলেন এই মুতাররিদ রহ.।^{১৪৪}

^{১৪২} হুরুব আর-রিদা, আল-কিলারী (পৃ. ১০৪-১০৬)।

^{১৪৩} আস-সাযিতুন আল্লাল ইসলাম (পৃ. ৫৭)।

^{১৪৪} আস-সাযিতুন আল্লাল ইসলাম (পৃ. ৫৮)।

তৃতীয়। সৈন্যবহর নিয়ে খালিদ রা.-এর ইয়ামামার দিকে যাত্রা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই বলে নির্দেশ পাঠান যে, আসাদ, গাফফান এবং মালিক ইবনে নুওয়ায়রাকে দমন করার পর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইয়ামামার দিকে রওনা হতে হবে। খলীফা এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বার্তাবাহক ছিলেন সারিক আল-ফায়রী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, ‘আমি বযাখা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে খালিদের নিকট একটি চিঠি পৌঁছে দেয়ার আদেশ দেন। চিঠিতে লেখা ছিল : ‘পরসংবাদ এই যে, দূত তোমার চিঠি নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তোমাতে বযাখা গোত্রের উপর বিজয় দান করেছেন এবং আসাদ ও গাফফান গোত্রের সঙ্গে তোমার বীরত্বের কথাও জেনেছি। অধিকন্তু তুমি ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হচ্ছ বলে জানিয়েছ। আমিই তোমাকে ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিয়েছি। সুতরাং সেটি সম্পন্ন কর। কেবল আল্লাহকে ভয় করবে, তার কোনো শরীক নেই। তোমার সঙ্গী মুসলমানদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে; তাদের সঙ্গে পিতৃসুলভ ব্যবহার করবে...বনু হানীফা গোত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ভালো করে মনে রাখবে, আল্লাহ যেন তোমাকে ভবিষ্যতে বনু হানীফা গোত্রের মতো জঘন্য লোকদের সান্নিধ্যে থেকে হেফাজত করেন। তারা সবাই তোমার শত্রু এবং তাদের এলাকা অনেক বিস্তৃত। গতব্যে পৌঁছে নিজে নিজে অতীতের সব যুদ্ধের কথা মনে করবে। তোমার ডানে এবং বামে একজন করে প্রহরী নিযুক্ত কর। আরেকজনকে তোমার ঘোড়ার দায়িত্ব অর্পণ কর। বিজ্ঞ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর। তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবে। শত্রুরা সারিবদ্ধ হয়ে সম্মুখ সমরে দাঁড়ালে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু কর। তবে এর আগে নিজেদের শত্রুর জন্য অস্ত্র বানাও : একটি তীরের জন্য তীর, একটি ঢালের জন্য ঢাল এবং একটি তরবারির জন্য তারবারি। তাদের যুদ্ধবন্দীদের তরবারি দিয়ে হত্যা কর। তাদের মধ্যে হত্যার বিভীষিকা ছড়িয়ে দাও এবং (যারা মুসলমানদের আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করেছে),

তাদের পুড়িয়ে হত্যা কর। আমার আদেশের অন্যথা করবে না। আব্বাহ তোমার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।' চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি গুনলাম এবং আমি পালন করব।'

সব বাধা অতিক্রম করে এবং মুরতাদ শত্রুদের নিধন করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতিমধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো সুযোগের প্রতীক্ষা না করে ইয়ামামার দিকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের প্রাথমিক কাজ সাব্যস্ত হয় খালিদের সেনাবাহিনীর পশ্চাত দিকে থেকে যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করা।

ইয়ামামার পথে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেকগুলো মুরতাদ সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এসব যুদ্ধে তিনি অনেককে হত্যা করেন এবং অনেকে আবার ইসলামের পথে ফিরে আসে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সাজাহর বাহিনীরও সাক্ষাৎ পান (সাজাহ নামে এক মহিলার কথা আগে আলোচিত হয়েছে। মুসাইলামার সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং সে নিজেকে মহিলা নবী হিসেবে দাবি করে)। সাজাহর বাহিনীকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শাস্ত্রাঙ্কন করেন। তবে তাদের পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় করতে পশ্চাতে ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে হতো যা ইয়ামামায় মুসাইলামাকে আক্রমণ করার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করত। এজন্য সাজাহর বাহিনীর দিকে না গিয়ে ইয়ামামার দিকেই যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

শীঘ্রই খালিদের বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে মুসাইলামা ইয়ামামার প্রান্ত সীমায় আকরিবা এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে। তারপর সে তার সৈন্যদের খালিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। মুসাইলামা তার বাম-বাহুর কমান্ডে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক রাজ্জাল এবং ডান বাহুতে আল-মুহকাম ইবনে তুফাইলকে নিযুক্ত করে।

মুসলিম বাহিনীর সমন্বয়সাধনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং গুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলিত হন।

আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ বাহিনীর কমান্ডে শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন। আর বাম ও ডান বাহুর কমান্ডে যথাক্রমে আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রাবিঈ এবং যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন।

মুসলিম বাহিনী কর্তৃক মুজ্জাআ ইবনে মুরারাহ হানাকীকে বন্দী

খালিদ বাহিনীর সম্মুখ অংশ মুজ্জাআ ইবনে মুরারাহ হানাকীর নেতৃত্বে চল্লিশজন (কোনো কোনো বর্ণনামতে, ষাটজন) অশ্বারোহীর সন্ধান পান। এরা ছিল বনু হানীফা গোত্রের লোক যারা খালিদের সেনাবাহিনীর আগমন সম্পর্কে কিছু জানত না। কারণ, তারা কয়েকদিনের জন্য ইয়ামামার বাইরে ছিল। তারা তাদের পূর্ব শত্রু বনু তামীম এবং বনু আমির গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছিল। ইয়ামামায় ফেরার পথে খালিদের সৈন্য বাহিনী দেখে তারা খুব অবাক হলো। তাদের সামনে পালানোর কোনো পথ ছিল না। অগত্যা তারা মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং খালিদের সৈন্যরা তাদের বন্দী করে।

মুজ্জাআ এবং তার দলের লোকদের খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হাজির করা হয়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জিজ্ঞেস করেন, ‘হে বনু হানীফার লোকেরা! তোমরা কী যত পোষণ কর?’ তারা তাদের জীবন বাজি রেখে জবাব দিল, ‘আমাদের মধ্য থেকে একজন নবী আছেন এবং আপনাদের মধ্যেও একজন নবী আছেন।’ ইসলামবিরোধী এ উক্তি র জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সবাইকে হত্যা করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ এলাকায় কখন তোমরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছ?’ তারা জবাব দিল, ‘আমরা কখনও তোমাদের উপস্থিতি অনুভব করিনি (যতক্ষণ না তোমরা আমাদের সামনে এসেছ এবং আমাদের বন্দী করেছ)। আমরা বনু তামীম এবং বনু আমির গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলাম।’ কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিশ্বাস করেননি। তিনি তাদের মুসাইলামার গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করেছেন।

যখন এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে, তখন তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কেবল তাদের নেতার জীবন

ভিক্ষা চায়। তারা বলে, ‘আগামীকাল তোমরা ইয়ামামার লোকদের সাহায্য কর কিংবা হত্যা কর, তবে এই লোকটিকে বাঁচিয়ে রাখ।’ তারা এ কথা বলার সময় মুজ্জাআর দিকে ইশারা করছিল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর মুজ্জাআকে বাদ দিয়ে বাকি সকলকে হত্যা করেন। মুজ্জাআ ছিল ভালো বংশের সন্তান এবং বনু হানীফার সম্মানিত একজন সর্দার।

ইয়ামামার পথে যখনই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কোথাও বিশ্রাম নেয়ার জন্য বিরতি নিতেন, তখন তিনি মুজ্জাআকে পাশে বসাতেন; তারপর তারা একসঙ্গে খেতেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। একবার খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার সঙ্গী (মুসাইলামা) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো। তোমাদের নিকট সে কী আবৃত্তি করে শোনাতে? তুমি কি সেগুলোর কিছু মুখস্থ শোনাতে পারবে (যেগুলোকে সে অহী হিসেবে দাবি করে)?’ মুজ্জাআ জবাবে বলল, ‘হ্যাঁ।’ এ কথা বলে সে মুসাইলামার কিছু বানানো শ্লোক আবৃত্তি করল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব শ্লোক শুনে যারপরনাই আহত হলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে মুসলমান ভাইয়েরা, এদিকে এসো। আল্লাহর দুশমনের কথা শোন। সে কেমন করে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে!’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর বললেন, ‘তোমার উপর দুর্ভোগ, হে মুজ্জাআ! আমি ভেবেছিলাম সর্দার হিসেবে তুমি জ্ঞানী (তারপরেও কেমন করে তুমি এসব কথায় বিশ্বাস করছ?)। হে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর কিতাবের কথা শোন। তারপর এই দুশমনের কথা মেলাও। এটা নিয়ে চিন্তা কর।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①

আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।^{১৪৫}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর তিলাওয়াত শেষ হলে মুজ্জাআ একটু নরম হয়। নিজেকে আরও পরিকারভাবে তুলে ধরার জন্য সে একটি গল্প বলে। গল্পটি

হলো : বাহরাইনে এক লোক ছিল যে লিখতে ও পড়তে জানত। মুসাইলামা তার সঙ্গে অতিরঞ্জিত ভালো ব্যবহার করে এবং তাকে নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর বানায়। এত ভালো আপ্যায়ন ও কদর পাওয়ার পরও লোকটি আমাদের নিকট এসে বলত, ‘দুর্ভোগ তোমাদের উপর, হে ইয়ামামাবাসী! আল্লাহর কসম! তোমাদের এ সঙ্গী মিথ্যুক। আমি মনে করি, তোমরা আমাকে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য ভৎসনা করবে না। কারণ, দেখতেই পাচ্ছ, সে অন্যদের থেকে আমাকে কত বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে! আল্লাহর কসম! সে তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলছে এবং চরম মিথ্যার উপর সে তোমাদের বাইআত করেছে।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারপর ঐ বাহরাইনের লোকটির কী পরিণতি হলো?’ মুজ্জাআ বলল, ‘সে পালিয়েছে। মুসাইলামার কানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত লোকটি এ রকম কথা বলতেই থাকে। তারপর নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে সে পালিয়ে বাহরাইন চলে যেতে সক্ষম হয়।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এই অভিশপ্ত শয়তানের আরও মিথ্যার কিছু নমুনা বলো।’ তারপর মুজ্জাআ মুসাইলামার আরও অনেক বানানো পঙ্ক্তিমালা আওড়াল। এসব শুনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমরা এগুলোকে সত্য মনে কর? তোমরা কি আসলেই তাকে বিশ্বাস কর?’ তখন মুজ্জাআ বলল, ‘আমি যা বলেছি তা যদি আমার লোকেরা বিশ্বাস না করত তাহলে আগামীকাল তোমাদের বিরুদ্ধে দশ হাজার তরবারি ঝলসে উঠত না...।’ তারপর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি অবশ্যই তার দ্বীনকে সম্মানিত করবেন (বিজয় দান করে)। মূলত, তোমরা তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছ, আর তার দ্বীন থেকেই পলায়ন করছ।’^{১৪৬}

অনেকে মনে করেন যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরোপুরিভাবেই একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব, দ্বীনের ব্যাপারে তিনি খুব কমই জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু এটি সত্য নয়। তিনি দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার মূল শক্তিই ছিল ঈমান। উপরের ঘটনাটি বিবেচনা করলেই এ সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা—‘তাহলে তোমাদের

বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি অবশ্যই তার দীনকে সম্মানিত করবেন (বিজয় দান করে)। মূলত, তোমরা তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছ, আর তার দীন থেকেই পলায়ন করছ’—কি প্রগাঢ় বিশ্বাসের সাথেই না তা উচ্চারিত হয়েছে! হ্যাঁ, এটা সত্য যে, তিনি স্বভাবগতভাবে একজন দৃঢ়চেতা সামরিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি এর চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন : তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান যে কিনা সবকিছুর উপরে আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেছিলেন। আল্লাহ তার উপর রাজি হোন এবং সকল সাহায্যে কেরামের উপর রাজি হোন।

মূল যুদ্ধের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্ভিগ্ন ছিল মুসাইলামার অনুসারীরা। তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল এবং বিদেশি মিত্রদের সাহায্যপ্রাপ্তিরও কোনো আশা ছিল না। হ্যাঁ, তারা সংখ্যায় ছিল অনেক এবং অস্ত্রের মজুদও ছিল বিশাল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে ছিল নিঃস্ব। কারণ, আরবের বেশিরভাগ এলাকাই ছিল মুসলমানদের দখলে। অপরদিকে মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনেক জায়গা থেকেই সৈন্যসংগ্রহ ও সরবরাহের সুযোগ ছিল। অধিকন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনস্থ সৈন্যরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করছে এবং এজন্য তাদের কিছুই হারানোর ছিল না; এমনকি তারা যদি মৃত্যুবরণও করে, তবু শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শত্রুদের উপর আরেকটি সুবিধা ছিল যে, তার সৈন্যরা বিজয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল; তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। আর মুসাইলামার সৈন্যরা আসন্ন যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করছিল না, বরং তাদের গোত্রের নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্যই লড়ছিল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থার সুবিধা গ্রহণের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ করার কৌশল অবলম্বন করেন। এ কারণে তিনি যায়েদ ইবনে লুবাইবকে তার বন্ধু মুহকাম ইবনে তুফাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাঠান যে ইয়ামামার একজন সম্মানিত সর্দার ছিল। যায়েদের উদ্দেশ্য ছিল মুহকামকে দলত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা।

আবার খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমাইর ইবনে সালাহ ইয়াসকুরীর সাহায্য নেন। তিনি মুসলমান ছিলেন, তবে তিনি তার গোত্রের লোকদের কাছ থেকে নিজের দীনকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। উমাইরের ঈমান ছিল মজবুত এবং তিনি তার গোত্রের লোকদের পরিকারভাবে সতর্ক করার জন্য তৈরি ছিলেন। তিনি তাদের বলেন, ‘তোমাদের খালিদ এবং মুহাজির ও আনসার মুজাহিদরা ঘিরে ফেলেছে।... তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে তোমরা তাদের পরাজিত করতে পারবে, তাহলে তারা পশ্চাতে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে তোমাদের পরাজিত করে ছাড়বে। তোমরা এবং তারা কখনও সমান নয়; ইসলাম দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং মুশরিকরা দিন দিন অতীত হয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গী আল্লাহর রাসূল এবং তোমাদের সঙ্গী একজন মিথ্যুক। তাদের সামনে রয়েছে সুখ-সমৃদ্ধ দিন এবং তোমরা ধোঁকায় পড়ে রয়েছে।’

মূলত মুসাইলামার সৈন্যদের মনোবলকে দুর্বল করাই এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সুমামাহ ইবনে উথাল হানাফী রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও একই দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাকে তার স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট গিয়ে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়। তিনি তার গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে বলেন, ‘নিশ্চয়ই দু-জন নবী একসাথে একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে আগমন করেনি। মূলত, মুহাম্মাদের পর আর কোনো নবী নেই এবং তার সঙ্গেও অন্য কাউকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়নি। আবু বকর এমন একজনকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন যাকে তার নিজের নামে কিংবা পিতার সূত্রে ডাকা হয় না, তাকে ডাকা হয় আল্লাহর তরবারি। তার নিকট আরও অনেক তরবারি রয়েছে। এজন্য খুব চিন্তা করা দরকার, তোমাদের আসলে কী করা উচিত?’

পাঠকের কাছে বিষয়টি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পরিকার হয়ে গিয়েছে যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য সম্ভাব্য সবরকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তার রণকৌশলের নিগূঢ় দিক হচ্ছে, তিনি কখনও শত্রুকে হেয় মনে করেননি; এজন্য তিনি সব সময় তৈরি ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শত্রু থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকতেন। তিনি সারাজীবন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পারদর্শী সামরিক ব্যক্তিত্ব

ছিলেন; এমনকি ইসলাম পূর্ব যুগেও। তার সতর্ক ও ধূর্ত সমর পরিকল্পনার জন্যই মক্কার মুশরিকরা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ করতে পেরেছিল। নিজের সৈন্যরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলত যে, তিনি ঘুমের মধ্যেও শত্রুর গতিবিধি বুঝতে পারতেন। প্রতিটি রাতেই তিনি পরবর্তী দিনের ঘটনাবলির জন্য তৈরি থাকতেন এবং শত্রুর সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানতে কখনও কার্পণ্য করেননি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। শত্রু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি দু-জন দূত প্রেরণ করেন—মুকনাফ ইবনে যায়েদকে অশ্বারোহী বাহিনীর তথ্য নেওয়ার জন্য এবং তার ভাই, হুরাইসাকে যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উদঘাটনের জন্য। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হাফস ইবনে গানিমকে যুদ্ধের পতাকা দেন। পরবর্তীতে তা আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালিমের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারপর তিনি তার বাহিনীকে পাঁচটি ডিভিশনে বিভক্ত করেন। সম্মুখ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার ভার খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাখযুমের হাতে অর্পণ করেন, ডান বাহুর নেতৃত্বে আবু হুযাইফা, বাম বাহুর নেতৃত্বে সুজাহকে নিয়োগ করেন; আর কেন্দ্রীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেন যায়েদ ইবনে খাত্তাবের হাতে। উসামা ইবনে যায়েদকে অশ্বারোহী সেনাদলের দায়িত্ব দেন। আর পশ্চাতে মহিলা ও তাঁবুর প্রহরায় দু-জনকে নিয়োজিত করেন। চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এটাই ছিল খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সর্বশেষ প্রস্তুতি।

চতুর্থ। যুদ্ধ শুরু

দু-বাহিনীর সৈন্যরা যখন মুখোমুখি অবস্থান নেয়, মুসাইলামা তখন তার সৈন্যদের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দ্রুত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়, ‘আজ আত্মমর্যাদা রক্ষার দিন। আজ যদি তোমরা হেরে যাও তাহলে তোমাদের মহিলারা বন্দী হবে। অপাত্রে তাদের বিবাহ হবে। অতএব তোমরা বংশমর্যাদা রক্ষার্থে জীবনপণ করে যুদ্ধ কর এবং তোমাদের স্ত্রীদের রক্ষা কর।’

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পথে একটু থামলেন। পাহাড়ের উপর এমন একটি স্থানে তাঁর স্থাপন করলেন যেখান থেকে পুরো ইয়ামামার প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। একটু পরেই দু-বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মুসাইলামার সৈন্যরা এগিয়ে যায়। এমনকি তারা খালিদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। তারা সেখানে উম্মু তামীমকে দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মুজ্জাআ, যে তখনও বন্দী, উম্মু তামীমকে নিরাপত্তা দিয়ে বলে যে, এই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ভালো মানুষ (সুতরাং তাকে হত্যা করো না)।’ যদিও শুরুতে মুসাইলামার সৈন্যরা মুসলমানদের সারি ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যালেদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু অভিশপ্ত রাজ্জাল ইবনে উনফুয়াকে হত্যা করেন।

মুসাইলামার বাহিনী যে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল, তা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। মুসলিম বাহিনী দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। মুসলমানরা আবার সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে; খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি ব্যাটালিয়ানে আলাদা পতাকা দেন যাতে মুহাজির, আনসার এবং বেদুইন সৈন্যদের পৃথকভাবে চেনা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মুজাহিদরা তাদের নির্ধারিত পতাকার কাছাকাছি অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করবে না, গণ্ডগোলও কম হবে।

আনসারদের ঝাণ্ডা বহনকারী সাবিত ইবনে কায়স কাফনের কাপড় পরে এবং তাতে কর্পুরের সুগন্ধি মেখে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন— যাতে তার যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। তার এ সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তা’আলা তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য নসীব করেন। ঐদিন অন্যান্য মুসলমানরাও এ রকম চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যালেদ ইবনে খাত্তাব বলে ওঠেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ওদের পরাজিত না করেন, অথবা আমি আল্লাহর নিকটে চলে যাই। তখন আমি তার কাছে আমার পক্ষের সাফাই পেশ করব।’ কিছুক্ষণ পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ঐদিন আরেক সাহসী যোদ্ধা আবু হুযাইফা মুসলমানদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, ‘হে

কুরআনের ধারক-বাহকগণ! বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তোমরা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর।' এ কথা বলেই তিনি শত্রুর মধ্যে বাঁপিয়ে পড়েন, তাদের দূরে সরিয়ে দেন। অতঃপর শাহাদাতবরণ করেন।

মুজাহিদদের মধ্যে সাহসিকতার দিক থেকে প্রত্যেকের তালিকা তৈরি করা কঠিন। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা ও নিষ্ঠাকতার স্বাক্ষর রেখেছেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। শত্রুপক্ষের কোনো সৈন্য কাছাকাছি এলেই তিনি তাকে হত্যা করেছেন। তিনি নিজে তার অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন; যুদ্ধরত বাহিনীর পশ্চাতে থেকে নয়, বরং সম্মুখ সারিতে অকুতোভয়চিত্তে যুদ্ধ করার মাধ্যমে। এমনকি মাঝে মাঝে তিনি শত্রুসারি ভেদ করে একাই মুশরিকদের নিধন করতে করতে এগিয়ে গিয়েছেন।

মুসলিম সৈন্যরা আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করেছেন। এটা ছিল অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু তারা থেমে থাকেননি। শত্রুদের ভয়াবহ আক্রমণ করে পশ্চাতে সরে যেতে বাধ্য করেছেন। পরিশেষে শত্রুদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে যায়; তারা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে উল্টো ঘুরে পালাতে থাকে। এখানেই হয়তো যুদ্ধের শেষ হয়ে যেত। কিন্তু মুহকাম ইবনে তুফাইল পলায়নরত সব সৈন্যদের বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করতে বলে—এ বাগিচা পরবর্তীতে 'মৃত্যুর বাগিচা' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুসাইলামার সব সৈন্য বাগিচায় প্রবেশ করার পর ভেতর থেকে সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে অবরোধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে মুহকাম সময়মতো বাগিচায় প্রবেশ করতে পারেনি। সে সৈন্যদের বাগানে প্রবেশ করতে বলছিল এবং তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিল। এ অবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন। এ তীর সরাসরি তার কাঁধে বিদ্ধ হয়। মুহকাম মাটিতে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। তখন তার অনুসারীরা বাগিচার দরজা বন্ধ করে দেয়। একটু পরেই মুসলমানরা চারিদিক থেকে বাগিচাকে ঘিরে ফেলে।

১। বারা ইবনে মালিক রা.

বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অবরোধের দীর্ঘায়িত করতে চাননি। তিনি মুসলমানদের বললেন, 'তোমরা আমাকে উঁচু করে (প্রাচীরের উপর দিয়ে) বাগিচার মধ্যে ফেলে দাও (আমি যেন ভেতর থেকে ফটকের দরজা খুলে দিতে পারি এবং তোমরা ভেতরে প্রবেশ করতে পার)।' এটা বারা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সাহসিকতার চেয়ে আরও বড় কিছু ছিল। প্রাচীরের অপর পাশে শত্রুর সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তারপরেও তিনি তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা তাকে বর্ষার সাহায্যে উঁচু করে ধরল যেন তিনি লাফ দিয়ে প্রাচীর ডিঙাতে পারেন। তিনি লাফ দিয়ে প্রাচীরের উপর দিয়ে দরজার কাছে শত্রুর সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েন। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি শত্রুর প্রতিরোধ ভেঙে দরজা খুলে দিতে সক্ষম হন। এখন উন্মুক্ত দরজা দিয়ে মুসলিম বাহিনী শ্রোতের মতো বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর যা ঘটেছে, তা আর যুদ্ধ ছিল না। বরং শত্রু খুঁজে খুঁজে তাদের নিধন করাই ছিল একমাত্র কাজ। বাগান যত বড়ই হোক না কেন, মুশরিকরা বুঝে গিয়েছিল যে, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে এবং শেষ পরিণতি খুব নিকটে।

২। মুসাইলামা কান্দাবের মৃত্যু

অভিশপ্ত মুসাইলামা বাগানের ভেতর একটি ডাঙা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। অত্যধিক ক্ষুধাবস্থায় তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। মৃত্যুমুখে পতিত সৈন্যদের সে কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারছিল না। এজন্য প্রচণ্ড ক্রোড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে তাকে প্রথম দেখেছিলেন ওয়াহশী ইবনে হারব রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের ইবনে মুতইমের আযাদকৃত গোলাম। এই হচ্ছে সেই ওয়াহশী যিনি উহুদের যুদ্ধে হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেছিলেন। এখন

তার সামনে এর ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় এসেছে যেজন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দুনিয়ার বুকে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছিলেন, আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট একজন মানুষকে হত্যার সুযোগ এসেছে। দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী ওয়াহশী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার লক্ষ্য ঠিক করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। বর্শা মুসাইলামার দেহ ভেদ করে পেছন দিকে বেরিয়ে যায়। তারপরেও মুসাইলামা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশা দ্রুত গিয়ে তরবারি দিয়ে মুসাইলামার উপর আঘাত হানেন। এতে মুসাইলামা ভূপাতিত হয়। এক মহিলা প্রাসাদ থেকে মৃত্যুবর্তী ঘোষণা করল, ‘হায়, মু’মিনদের নেতা! তাকে এক হাবশী ক্রীতদাস হত্যা করেছে।’

বাগিচার মধ্যে মুরতাদ শত্রুদের প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। কারও কারও মতে নিহতের সংখ্যা একুশ হাজার। এজন্য বাগানের নতুন নামকরণ হয়, ‘মৃত্যুর বাগিচা’। পক্ষান্তরে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ছয়শ’ ভিন্ন মতে পাঁচশ’ সৈন্য শহীদ হয়। শহীদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী ও নেতৃস্থানীয় লোক।

বাগান সম্পূর্ণরূপে দখলে আসার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে মুজ্জাআ ইবনে মুরারাকে নিয়ে বের হলেন। তখনও সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। নিহতদের মধ্য থেকে মুসাইলামার লাশ সনাক্ত করার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাথে নেন। রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়ার লাশের কাছে দিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই কি সেই ব্যক্তি?’ মুজ্জাআ বলল, ‘আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি তার থেকে উত্তম। এ হচ্ছে রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়া।’ কিছুক্ষণ পর গেরুয়া বর্ণের চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট একটি লাশের কাছে উপস্থিত হয়ে মুজ্জাআ বলল, ‘এই হচ্ছে সেই (মুসাইলামার) লাশ যাকে আপনি খুঁজছেন।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এর অনুসরণ করায় আল্লাহ আজ তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন।’ তারপর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার চারপাশে পড়ে থাকা মাল-সম্পদ ও বন্দীদের তুলে আনার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন।

৩। আবু আকিল : আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ বালওয়ালী আনসারী
আউসী

ইয়ামামার যুদ্ধে সর্বপ্রথম আহত হয়েছিলেন আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন একজন আনসার সাহাবী। শত্রুপক্ষের একটি তীর তার বক্ষদেশ ও কাঁধের মাঝামাঝি এসে বিদ্ধ হয়। এতে তিনি মারাত্মক আহত হলেও তীরটি বের করে ফেলতে সক্ষম হন। তবে তার বাম দিক পুরো অবশ্য হয়ে যায়। তিনি মুসলমানদের তাঁবুতে চিকিৎসার জন্য ফিরে আসেন। যখন যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং মুসলমানরা প্রথম ধাক্কায় পিছু হটতে বাধ্য হন, তখন মা'আন ইবনে আদি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হে আনসার লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, ঘুরে দাঁড়াও এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়।' অন্যের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি নিজেই সবার আগে শত্রুর সারির মধ্যে ঢুকে যান। আর তাকে অনুসরণ করে আনসার মুজাহিদরাও শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে।

ঐ সময় আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসার মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে উঠে দাঁড়ান। কয়েকজন মুসলমান তাকে ওঠার চেষ্টা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তারা বলে, 'হে আবু আকিল! আপনি যুদ্ধের জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ নন।' আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু মা'আন ইবনে আদির অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আহবানকারী আমার নাম ধরে ডেকেছে!' তখন কেউ বলল, 'আহবানকারী শুধু আনসার লোকদের সম্বোধন করেছেন। তিনি আহত যোদ্ধাদের কথা বলেননি।' আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি একজন আনসার। আমি তার ডাকে অস্ত্র হাতে সাড়া দেব যদিও আমাকে ক্রলিং করে (শত্রুর দিকে) যেতে হয়!'

আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাম দিকে কোনো শক্তি না থাকায় তিনি ডান হাতে তরবারি ধরলেন; পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল নিয়ে তিনি শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। আর এ কথা বলতে থাকলেন, 'হে আনসার লোকসকল! চল, হুনাইনের যুদ্ধের মতো পুনর্বীর নতুন করে শত্রুকে আক্রমণ করি।' তারপর আনসারদের প্রত্যেকে প্রচণ্ড মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা দু-টির যে কোনো

একটির আশায় মরিয়া হয়ে উঠলেন; হয় শহীদ, না হয় বিজয়। মুসলমানদের পুনঃ আক্রমণে তারা শত্রুদের পিছু হটিয়ে মৃত্যুর বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। এ প্রতিআক্রমণে আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাত দিখণ্ডিত হয়ে যায়; মূলত তিনি চৌদটি বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন যার প্রতিটি তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল।

পরবর্তীতে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শেষ নিঃশ্বাসগুলো নিচ্ছিলেন। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ডাক দিলেন, ‘হে আবু আকিল।’ এ আহবানে আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু সজোরে চিৎকার করে বললেন, ‘এই যে আমি এখানে, তোমার কথা শুনছি।’ আজ কে বিজয়ী হলো?’ ইবনে উমর বললেন, ‘সুখবর! আল্লাহর শত্রু (মুসাইলামা) নিহত হয়েছে।’ আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর আকাশের দিকে তার হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে তুলে ধরলেন যাতে মনে হচ্ছিল, তিনি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছেন।

পরবর্তীতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু আকিল রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, ‘আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষণ করুন। তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করছিলেন। অবশেষে তিনি তা লাভ করেছেন। তিনি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন।’

৪। নাসিবাহ বিনতে কা’ব মাযিনিয়াহ আনসারিয়াহ

নাসিবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা কেবল ইয়ামামার পথে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে শরীক ছিলেন না, বরং তিনি সশরীরে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার অভিশপ্ত মিথ্যুক মুসাইলামার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন না বলে শপথ করেন। তিনি তার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় ছিলেন। মুসাইলামা নিহত হওয়ার পর তিনি তার দেহে বারোটি জখম নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এগুলোর সবই ছিল তীর, বর্শা এবং তরবারির আঘাত। তার আঘাতের চিহ্নই বলে দেয় তিনি কত গভীরভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যা অধিকাংশ মহিলাই কল্পনা করতে পারবে না।

ইসলামের জন্য তার এ ত্যাগের কারণে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবন তাকে বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি তার খোঁজখবর রাখতেন। এমনকি তার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়ে যেতেন। পরবর্তীতে নাসিবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, ‘খালিদ আমার অনেক সেবা-শুশ্রূষা করেছে এবং তিনি আমাদের (আনসারদের) একজন ভালো সঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন (আনসারদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার ব্যাপারে), তা বাস্তবায়ন করেছেন।’

ছয়। ইয়ামামার যুদ্ধে কয়েকজন শহীদের বিবরণ

১। সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস রা.

সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মাদ। তিনি ছিলেন আনসারদের খতীব। বিশ্বস্ত বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে এ ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়। এ সময় আনসারদের ঝাণ্ডা বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে। এ স্বপ্নে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বলছেন, ‘গতকাল আমি যখন নিহত হই, তখন আমার পাশ দিয়ে একজন মুসলমান যাচ্ছিল। সে আমার পরিহিত একটি উৎকৃষ্ট বর্ম দেহ থেকে খুলে নেয়। সে লোকটি সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে আছে। তার কাছে দীর্ঘকায় একটি ঘোড়া আছে। আমার বর্মটিকে সে পাতিল দিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং তার উপর সওয়ারীর গদি উঠিয়ে রেখেছে। তুমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আমার বর্মটি তার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। যখন খলীফার নিকট ফিরে যাবে, তখন তাকে বলবে, আমার উপর অমুক ব্যক্তির ঋণ আছে। আর এই মাল আমার আছে (তিনি যেন এ দ্বারা আমার

ঋণ পরিশোধ করে দেন। আর আমার অমুক গোলাম আযাদ। তুমি এরূপ ভেবো না যে, এটি একটি স্বপ্নমাত্র, তাই তা উপেক্ষণীয়।' লোকটি ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নটিকে হালকাভাবে নেয়নি, বরং তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে স্বপ্নের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্মটির কথা বলে। তারপর তারা যখন বর্মটির খোঁজে বের হন, স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী তা অবিকল একই জায়গায় পাওয়া যায়। পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ফিরে গিয়ে তাকে অসীয়তের কথা জানালে তিনি সেমতে কাজ করেন। কারও মারা যাওয়ার পর তার স্বপ্নে দেয়া অসীয়ত কার্যকরী করা হয়েছে, এ দৃষ্টান্ত সাবিত ইবনে কাইস ছাড়া আর পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা সাবিতসহ সকল সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

২। যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর ইবনুল খাত্তাবের বৈমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মদীনায হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'আন ইবনে আদী আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তারা উভয়েই শহীদ হন।

ইয়ামামার যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ছিল। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত সম্মুখে এগিয়ে যান। নিহত হওয়ার পর ঝাণ্ডা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম মাওলা সালিম তা ধারণ করেন। শহীদ হওয়ার আগে যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামাকে কঠিন আঘাত করতে সক্ষম হন। তিনি মুসাইলামার এক নম্বর কমান্ডার কুখ্যাত রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়াকে হত্যা করেন, যে মুসাইলামা থেকেও বেশি ক্ষতির কারণ ছিল। আর আবু মারিয়াম আল-হানাকীর হাতে যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন। পরবর্তীকালে আবু মারিয়াম ইসলামগ্রহণ করেন এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আমার হাতে যায়েদকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।'

যখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যায়েদ ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি মন্তব্য করেন, ‘আল্লাহ আমার ভাইয়ের উপর রহম করুন। তিনি দু-টি কল্যাণের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রসর হয়েছেন। আমার আগে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং আমার আগে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুতাম্মিম ইবনে নুওয়াইরা যখন তার ভাই মালিকের কবিতার মাধ্যমে শোকগাঁথা গাইত, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ করে মন্তব্য করেন, ‘আমি যদি ভালো কবি হতাম, তাহলে তোমার মতো কাব্য রচনা করতাম।’ প্রতিউত্তরে মুতাম্মিম বলেন, ‘আপনার ভাই যেভাবে মারা গিয়েছে, যদি সেভাবে আমার ভাই মারা যেতেন, তাহলে আমি তার জন্য দুঃখবোধ করতাম না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি আমাকে যেভাবে সান্ত্বনা দিলে, সেভাবে কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেয়নি।’ এতসব কিছুর পরও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

যখনই বাতাস প্রবাহিত হয়, তখনই তা আমাকে যায়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

৩। মা’আন ইবনে আদী আল-বালওয়াভী রা.

মা’আন ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আনসার সাহাবী এবং আকাবার শপথকারীদের অন্যতম। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এবং তার মুহাজির ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

অন্য অনেক গুণাবলির পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর একটি বিশেষ কীর্তির জন্য মা’আন ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। লোকজন সবাই কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, ‘ভালো হতো যদি রাসূলের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হতো। কেননা আশঙ্কা হয়, তার মৃত্যুর পর আমরা ফিতনায় জড়িয়ে পড়ব।’ ঐ সময় মা’আন ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম, রাসূলের পূর্বে আমি মারা যাব, এটা আমি চাই না। কারণ, মৃত্যুর পরেও তাকে আমি সেভাবে সত্য ঘোষণা করতে চাই, যেভাবে তাকে জীবিত অবস্থায় সত্য বলে মেনেছি।’

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

ইসলামের প্রথম যুগেই আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইসলাম কবুল করেন। এরপর হিজরত করেন (সম্ভবত আবিসিনিয়ায়)। কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায হিজরত করে গেলেও তিনি ইচ্ছের বিরুদ্ধে মক্কায থেকে যান। বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ বাহিনীর সাথে তিনিও আসেন। উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলে তিনি পালিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিশে যান। ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী আরেক প্রসিদ্ধ সাহাবী হলেন এই আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু।

পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হজের সময় আব্দুল্লাহর পিতাকে সাক্ষ্যনা দেন। তখন পিতা সুহাইল বললেন, ‘আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন শহীদ তার নিজ পরিবারের সমস্ত জন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। আমি আশা করি, সে প্রথমে আমাকে দিয়েই সুপারিশ আরম্ভ করবে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মক্কার অনেক অধিবাসী ইসলাম ত্যাগ করার চিন্তা-ভাবনা করছিল। পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, মক্কার গভর্নর আব্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে লুকাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে গোপন করেননি। বরং তিনি জনসমক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর উল্লেখ করে বলেন যে, ইসলাম একই রকম শক্তিশালী আছে। যে কেউ ইসলাম ত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করা হবে।’ সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শুনে মক্কাবাসী তাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে। তারা মুরতাদ হওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুহূর্তের মধ্যেই মক্কার পরিবেশ শান্ত হয়ে ওঠে এবং আব্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গোপন অবস্থা থেকে জনসমক্ষে বেরিয়ে আসেন।

৫। আবু দুজানা সিমাক খারাসাহ রা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উতবা ইবনে গাজওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বদরের যুদ্ধে তিনি মাথায় লাল পট্টা পড়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাঁড়ান এবং তিনি এসব মহান সাহাবীদের একজন যারা ঐদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মৃত্যুর বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার আগে তিনি অভিশপ্ত মুসাইলামাকে হত্যা করার ব্যাপারে ওয়াহশীর সাথে শরীক ছিলেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একবার আবু দুজানা অসুস্থ হলে লোকজন তাকে দেখতে গেল। এ সময় তার চেহারায় যেন নূর চমকচ্ছিল! এজন্য কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার চেহারা এমন উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কী?’ আবু দুজানা জবাব দিলেন, ‘দু-টি আমল ছাড়া আমার তেমন কোনো আমল নেই। একটি হচ্ছে, আমি অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলি না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার অন্তর সব সময় মুসলমানদের কল্যাণকামী।’

৬। আব্বাদ ইবনে বিশর ইবনে ওয়াকাস আল-আনসারী রা.

ইয়ামামার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্বাদ ইবনে বিশর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন।

মদীনার অনেক সাহাবীর মতো আব্বাদ ইবনে বিশর আনসারী মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীতে তার একটি কারামত বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাতের বেশিরভাগ অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটাতে। যখন তার বাসায় ফেরার সময় হতো, তখন বাইরে থাকত ঘন কালো অন্ধকার। এজন্য তার পথ চিনতে অসুবিধা হতো। কোন পথে তিনি যাবেন কিংবা কোন পথে চলছেন, বোঝা মুশকিল হয়ে উঠত। আল্লাহ

তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহে তার হাতের লাঠি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো। এ আলোতে তার পথ চলা সহজ হয়ে যায়।^{১৪৭} এ ঘটনা থেকে আব্বাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের গভীরতা সহজেই অনুমেয়।

আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই বিশ্বস্ত সাহাবী ছিলেন। তার এ বিশ্বস্ততার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুজাহিদনাহ এবং বনু সালিম গোত্রের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দেন এবং তারুক-যুদ্ধে তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে নিয়োগদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেন।^{১৪৮}

সংক্ষেপে আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের মধ্যে ধার্মিক এবং আদর্শ মু'মিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মহৎ চরিত্রের স্বীকৃতি হিসেবে উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আনসারদের মধ্যে তিন ব্যক্তি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তারা প্রত্যেকে বনু আব্দুল-আশহাল গোত্রের: সা'দ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্বাদ ইবনে বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আরও বলেন, '(এক রাতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছিলেন। তখন তিনি আব্বাদ ইবনে বিশরের কণ্ঠ শুনতে পান। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা! এটা কি আব্বাদের গলার আওয়ায?' আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'হে আব্বাদ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।'^{১৪৯}

ইয়ামামার যুদ্ধে আব্বাদ সব সময় যা আশা করতেন, তাই লাভ করেছেন : শাহাদাত। তিনি যে শহীদ হবেন, এ ব্যাপারে আগে থেকেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন বযাখার যুদ্ধে লড়াই শেষ হয়, তখন আমি শুনতে পেলাম আব্বাদ ইবনে বিশর বলছে,

^{১৪৭} বুখারী (৩৮০৫)।

^{১৪৮} বুখারী (৪০৩৭)।

^{১৪৯} বুখারী (২৬৫৫)।

‘হে আবু সাঈদ! গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার জন্য আকাশ খুলে যাচ্ছে। তারপর তা আমাকে ঢেকে নিয়েছে। এর মানে ইনশাআল্লাহ আমি শহীদ হব।’ আমি জবাবে বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই উত্তম স্বপ্ন দেখেছেন।’

ইয়ামামার রণক্ষেত্রে আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ড সাহসিকতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি বনু হানীফা গোত্রের উপর তিনি মারাত্মক ত্রাস সঞ্চার করেন। এ গোত্রের যে কেউ আহত হলেই তারা বলাবলি করত, একে নিশ্চয়ই আব্বাদ ইবনে বিশর আঘাত করেছে! ^{১৫০}

তাদের এ ধারণার সঙ্গত কারণও ছিল। তিনি শত্রু ব্যূহ ভেদ করে তাদের অনেক ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুর দিকে আব্বাদ একটি ছোট টিলার উপর দাঁড়িয়ে সজোরে চিৎকার করে বলেন, ‘আমি আব্বাদ ইবনে বিশর। এসো, হে আনসার সম্প্রদায়! এসো, হে আনসার লোকসকল! আমার পাশে এসে লড়াই কর। আমার পাশে এসে লড়াই কর।’ আনসার লোকসকল তার এ আহবানে সাড়া দিয়ে তার পাশে এসে জমা হয়ে বলতে থাকে, ‘এই যে আমরা। আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমরা প্রস্তুত।’ তারপর তিনি খাপ থেকে তরবারি বের করেন। এ থেকে তিনি বুঝিয়েছেন যে, বিজয় অথবা শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর এ তরবারি কোষবদ্ধ করবেন না। আনসার লোকেরাও তাকে অনুসরণ করে একই শপথ নিল। পরে তিনি তাদের বললেন, ‘চল আমরা নিষ্ঠা ও দৃঢ় মনোবলের সাথে আক্রমণ করি। এখন আমাকে অনুসরণ কর।’ এ কথা বলেই তিনি তার আনসার ভাইদের নিয়ে সরাসরি শত্রুর উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটা এমন ভয়াবহ আক্রমণ ছিল যা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয়। অকস্মাৎ এমন তীব্র আক্রমণে তাল সামলাতে না পেরে বনু হানীফার মুরতাদরা পশ্চাপসরণে বাধ্য হয়। বনু হানীফারা পশ্চাতে পালিয়ে যেতে থাকলেও আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ছেড়ে দেননি। বরং তাদের ধাওয়া করে মৃত্যুর বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন।

বাগানের দরজা যখন খুলে দেয়া হয়, তখন আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বাগানে প্রবেশ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে নিঃশক্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াইতে থাকেন। তার শরীরে এত বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল যে, পরবর্তীতে তাকে পাওয়া গেলেও তাকে চেনা যাচ্ছিল না। তার শরীরে বিশেষ একটি চিহ্নের কারণেই তাকে চেনা সম্ভব হয়।^{১৫১} আল্লাহ তা'আলা আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

ইয়ামামার যুদ্ধে সকল আনসার মুজাহিদগণ অসম্ভব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাদের অনেকেই সেদিন শাহাদাতবরণ করেছেন। পরবর্তীতে মুজ্জাআ ইবনে মুরারা যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করছিল, তখন সে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি আনসারদের মতো এক ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুর আঘাত সহ্য করতে আর কাউকে দেখিনি এবং সেদিন তারা মারাত্মক সাহসিকতা ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছে।’ তারপর মুজ্জাআ খালিদের বাহিনীর বীরত্বের বর্ণনার পাশাপাশি রণক্ষেত্রে অনেক আনসার মুজাহিদের লাশ পড়ে থাকার বিবরণ দিলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত বেশি ক্রন্দন করেন যে, তার দাড়ি মোবারক ভিজে যায়।^{১৫২}

৭। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী আল-আজদী রা.

উন্নত বংশ ও সচ্চরিত্রের তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন দক্ষ ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের আগে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি নিজেই এ স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমি এবং আমার ছেলে যুদ্ধ করতে রওনা হয়েছি। এর মধ্যে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখি, আমার মাথার চুল মুণ্ডন করা হয়েছে, একটি পাখি আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল এবং মনে হলো, আমাকে যেন একজন মহিলা তার গোপন অঙ্গে ঢুকিয়ে রেখেছে। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করেছি যে, আমার মাথার চুল মুণ্ডন মানে আমাকে শহীদ করা হবে,

^{১৫১} আল-ইকতিফা, আল-কিলাই (৩/৫৩)।

^{১৫২} প্রাগুক্ত (৩/৬৫)।

পাখিটি আমার রুহ এবং মহিলা এ পৃথিবীর মাটি নির্দেশ করছে যেখানে আমাকে দাফন করা হবে।' তারপর ইয়ামামার রণক্ষেত্রে তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতবরণ করেন।

ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুসাইলামাকে পরাজিত করে তারা বিজয়ের আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু একই সময় তাদের অন্তরে শোকের ঝড়ো হাওয়াও বইতে থাকে। এ যুদ্ধে কতজন শাহাদাতবরণ করেছেন, এটা মুখ্য বিষয় ছিল না (সর্বমোট ১২০০ মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন)। বরং সকলের বেদনার কারণ ছিল যে, এ যুদ্ধে অনেক প্রসিদ্ধ মুহাজির ও আনসার সাহাবী শাহাদাতবরণ করেছিলেন। তাদের অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব প্রিয় ছিলেন এবং তাদের প্রায় চল্লিশজন কুরআনে হাফেজ ছিলেন। এজন্য মুজাহিদগণ মদীনার ফিরে তারা একই সঙ্গে আনন্দ উদযাপন এবং অশ্রুপাত করেছেন—আনন্দের কারণ ছিল মুসাইলামার শোচনীয় পরাজয়, আর কান্নার কারণ ছিল অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবীদের শাহাদাতবরণ।

ছয়। মুজ্জাআর প্রতারণা; খালিদ রা.-এর সাথে
মুজ্জাআর মেয়ের বিবাহ; আবু বকর রা. এবং
খালিদ রা.-এর মধ্যে পত্রবিনিময়

‘মৃত্যুর বাগান’ পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার চারিদিকে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। তার নির্দেশ ছিল পরিকার : তারা দুর্গ থেকে দুর্গে যাবে এবং দুর্গের বাইরে সম্পদ ও বন্দীদের তুলে আনবে। তার কিছু পরেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার দুর্গসমূহ আক্রমণ করা সিদ্ধান্ত নেন যদিও তিনি জানতেন না যে, দুর্গের ভেতর কেবল কিছু বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশু ছাড়া কোনো সৈন্য-সামন্ত ছিল না।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেছিলেন যে, প্রতিটি দুর্গেই অনেক সৈন্য রয়েছে। বন্দী মুজ্জাআ এ সুযোগে অনেকগুলো জীবন বাঁচানোর

ফন্দি আটল। সে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, ‘পুরুষ লোক ও যুদ্ধক্ষম লোকে দুর্গসমূহ পরিপূর্ণ। সুতরাং আমাকে সুযোগ দিন আপনার এবং তাদের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করি।’ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুজ্জাআর প্রস্তাবের ব্যাপারে রাজি হতেন না; কিন্তু ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মুসলিম সৈন্যদের আর অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে তিনি মুজ্জাআর প্রস্তাব মেনে নেন। তারপর মুজ্জাআ বলল, ‘আমাকে তাদের নিকট যেতে দিন এবং দেখি তারা আপনার সঙ্গে সন্ধির যাবতীয় শর্ত মেনে নেয় কি না।’

মুজ্জাআ একটি দুর্গে প্রবেশ করে সে তার পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়। সে মহিলাদের বলল, ‘তোমরা বর্ম পরে দুর্গের উপরে মাথা উঁচিয়ে থাক।’ তারা তা-ই করল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন, দুর্গের শীর্ষে মানুষের অঙ্গশ্রম মস্তক উঁচু হয়ে আছে। তাদের অবস্থান দূরে হওয়াতে সবাই যে মহিলা, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা বুঝতে পারেননি।

সন্ধি স্থাপনের পূর্বে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। এ আহ্বানে দুর্গের সবাই ইসলাম গ্রহণ করল এবং সত্য ধর্মে ফিরে আসল। বনু হানীফার লোকজনকে আরও উৎসাহ দেয়ার নিমিত্ত তিনি তাদের নিকট কয়েকজন নারী বন্দীকে হস্তান্তর করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ এগারো হিজরীতে সংঘটিত হয়। আল-ওয়াকিদী এবং অন্যরা মনে করেন যে, এ যুদ্ধ বারো হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহই ভালো জানেন—মনে হয় দুটো বর্ণনাই সঠিক। সম্ভবত এগারো হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধ শুরু হয়ে তা বারো হিজরীতে শেষ হয়েছিল।

মুজ্জাআর মেয়ের সঙ্গে খালিদ রা.—এর বিবাহ

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুজ্জাআর মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। প্রথমে মুজ্জাআ এ কথা বলে রাজি হয়নি যে, এতে মুজ্জাআর পরিবারের সবাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্রোধের শিকার হয়ে। কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যায় কিছু করছেন বলে

মনে করেননি। এজন্য তিনি পুনরায় তার প্রস্তাব দিলেন। মুজ্জাআ রাজি হলো এবং সে তার মেয়েকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিয়ে দিল।

মদীনায়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এখনও ইয়ামামার বিজয়ের সংবাদ পাননি। তিনি সালামাহ ইবনে ওয়াকসের মাধ্যমে বনু হানীফার সকল বালগ পুরুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু সালামাহ যখন ইয়ামামায় পৌঁছেন, তখন ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার অধিবাসীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন যার অর্থ হচ্ছে, বেঁচে যাওয়া বনু হানীফা গোত্রের পুরুষরা আর হত্যার শিকার হবে না।

ইয়ামামার যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব উদ্গ্রীব ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সঙ্গী নিয়ে হুররাহ এলাকায় গমন করেন। সেখানে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূত আবু খাইসামা আল-নাজ্জারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পান। তিনি আবু খাইসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী খবর নিয়ে এসেছ, হে আবু খাইসামা?’ আবু খাইসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। আল্লাহ তা’আলা ইয়ামামার যুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেছেন এবং এই যে নিন, খালিদের চিঠি।’ এ খবর শুনে একমুহূর্ত দেরী না করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাটিতে সিজদা দিয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাকে যুদ্ধের বিবরণ দাও, কিভাবে কী হয়েছে বল।’ আবু খাইসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর রণকৌশল এবং বিজয়ের সবিস্তারিত বর্ণনা দেন। আর এ যুদ্ধে যেসব মহান সাহাবী শহীদ হয়েছেন, তাদের বিবরণও দেন।

প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ব্যথিত হলেন। কিন্তু তাকে আরেকটি বিষয় রাগান্বিত করে তোলে। যখন তিনি জানলেন যে, মুজ্জাআ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কীভাবে প্রতারণিত করে চুক্তি-স্বাক্ষর করিয়েছে এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার মুজ্জাআর মেয়েকে বিয়ে করেছে—তখন তিনি মারাত্মক গোস্বা হলেন। এ অবস্থায় তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিচের চিঠি

লিখলেন, ‘তুমি কি এতই স্বাধীন হয়ে গিয়েছ যে, ১২০০ মুসলমানের শাহাদাতের রক্ত না শুকাতেই তুমি বিয়ে করছ? মুজ্জাআ তোমাকে প্রতারণা করে তোমার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলশ্রুতিতে তুমি বনু হানীফার লোকদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছ যেখানে আল্লাহ তা’আলা তোমাকে তাদের শেষ করে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এ রকম কঠিন প্রতিক্রিয়ার আশা তিনি করেছিলেন কি করেননি, তা জানা না গেলেও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠি পেয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং তিনি তার কাজে একইরকম আত্মবিশ্বাসী থাকেন। কোথাও কোনো ভুল হয়েছে বলে তার কাছে মনে হয়নি। এজন্য যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের লক্ষ্যে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে খলীফার নিকট আবু বারযাহ আসলামী মারফত চিঠির জবাব প্রেরণ করেন। উক্ত চিঠিতে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন :

১। যখন এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তখন থেকেই কি তিনি মুজ্জাআর মেয়েকে বিয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন কি না!

২। এ বিয়ের মাধ্যমে বনু হানীফা গোত্রের এক সর্দারের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কের কারণে বনু হানীফা গোত্রের লোকজনের মধ্যে অবশ্যই ভালো ছাড়া মন্দ কোনো প্রভাব পড়বে না।

৩। বিয়েতে জাঁকজমক কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল না। এটা ছিল নিতান্তই একটি প্রস্তাব এবং তার সমর্থন। বলা যায়, এ বিয়ের জন্য তিনি নিজেকে অথবা অন্য কোনো মুসলমান ভাইকে অপদস্থ করেননি।

৪। এ বিয়েতে ইসলাম কিংবা আরবের কোনো আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়নি।

৫। অনেক মুসলমানের মৃত্যুতে বিয়ের কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে না। দুঃখবোধ হচ্ছে একটি অনুভূতি বাস্তবজীবনে যার কোনো প্রয়োগ নেই। এটা জীবিতকে বাঁচিয়ে কিংবা মৃতকে জীবিত করতে পারে না।

৬। তিনি জিহাদ থেকে দুনিয়ার অন্য কিছুকেই কখনও বেশি প্রাধান্য দেননি। তিনি দেহের প্রতি কণা শক্তি দিয়ে লড়েছেন, রণক্ষেত্রে যা কিছু সম্ভব তা করেছেন—শত্রুর আঘাতের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন যাতে শাহাদাত লাভ করা যায়। এখন কেউ যদি শাহাদাতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে কি তাকে বিয়ে করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে!

৭। মুজ্জাআর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ ভালো কাজটিই তিনি করেছেন এবং কখনও তা মুজ্জাআর দিক বিবেচনা করে করেননি। অধিকন্তু মুজ্জাআ তার সঙ্গে চাতুরতার আশ্রয় নিয়েছে যা একজন মানুষ হিসেবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেননি। দুর্গের ভেতরের অবস্থা বাইরে থেকে তার জন্য বোঝাও সম্ভব ছিল না। তারপরেও তিনি কেবল মুজ্জাআর কথায় প্রভাবিত হননি; তিনি দূর থেকে দুর্গের ছাদে অনেক সৈন্যের অবস্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যদিও তারা যে মহিলা ছিল তা বুঝতে পারেননি। সংক্ষেপে তাকে প্রভারিত করা হয়েছে এবং তা ধূর্ত মুজ্জাআর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষমা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রভারিত হওয়ার পরও মুসলমানদের প্রাণ্যই বেশি। মুসলমানরা বনু হানীফার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনেকে ইসলাম কবুল করেছে।

এ চিঠি পড়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মন কিছুটা নরম হয়। তবে কুরাইশদের একটি দল যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে কথা হলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষমা দেয়ার ক্ষেত্রে আরও দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে যান। তাদের একজন আবু বারযাহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, খালিদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে কাপুরুষ কিংবা বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিন্দুমাত্র তুলনা করা যায় না। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য আত্মাণ চেষ্টা করেছেন—বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত রণক্ষেত্রে তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। চুক্তি করতে রাজি হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং এতে তার দোষের কিছু নেই। আপনাকে মনে রাখতে হবে, দুর্গের উপর অনেক মহিলাকে বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখে তিনি তাদের পুরুষ মনে করেছিলেন।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, 'তোমরা সত্য বলেছ। খালিদের চিঠির চেয়ে তোমরা যা বলেছ, তাতেই সে ক্ষমা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত।'

খালিদের চিঠি এবং আবু বারযাহর উক্তি থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর রাগান্বিত হওয়ার বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় : ইয়ামামাতে কোনো ভুল করা থেকে খালিদ নির্দোষ। তিনি তার লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন এবং মুজ্জাআর কন্যাকে বিয়ে করার তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।

অনেক ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে নাজুকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তারা কোনো শত্রুতাবশত কাজটি করেছেন কিনা বিষয়টি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়; বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা সত্য ঘটনা আড়াল করেছেন এবং খালিদের চরিত্রে কালিমালেপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ড. মুহাম্মাদ হুসেইন হেইকেলকে কোনোভাবেই ক্ষমা করা যায় না, যদিও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করাই তার লক্ষ্য ছিল। আস-সিদ্দীক আবু বকর কিতাবে ড. হেইকেল লেখেন, 'বাৎসরিক উৎসবের মতোই মুজ্জাআর মেয়েকে খালিদ বিয়ে করেছিলেন যা অনেক যুদ্ধ জয়ের নেতা খালিদের জন্য রীতিমতো আইনে পরিণত হয়েছিল। সে ছিল সাক্ষাৎ বলির পাঠা এবং তাকে এমন এক ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল যাকে একই সাথে বিরাট যোদ্ধা এবং মহান বিজয়ী হিসেবে বর্ণনা করা যায়। সর্বোপরি তিনিই ইয়ামামাতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এটা সম্ভবত তার পক্ষিতাকে ঢেকে দিয়েছে।'

কী জঘন্য কথা! এ কথা লেখার সময় ড. হেইকেল কি এ ধারণা করেছিলেন যে, খালিদ যেন প্রাচীন গ্রীক কোনো নেতা যে সম্মান, প্রতিপত্তি অথবা ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছে; অথবা নীলনদের কোনো দেবতা যার উপর মিশরীয়রা বিশ্বাস করতে যে, সুন্দরী মহিলাকে নদীতে বিসর্জন না দিলে তার অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না!

সত্যিকার অর্থে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে বিশেষ কোনো সম্মানের মোহ ছিল না। তিনি নিজেকে অন্যের উপর বিশেষ কোনো সুবিধা পাওয়ারও যোগ্য মনে করতেন না। বরং তিনি ছিলেন যোদ্ধা-ইবাদতকারী, একজন সত্যিকার মু'মিন যার আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান। তিনি যশ কিংবা ক্ষমতার জন্য লড়াই করেননি। তিনি সবকিছুর উপর আল্লাহর বাণীকে সমুচ্চ করার জন্যই যুদ্ধ করেছেন। এ কাজে তিনি দুনিয়ার কোনো পুরস্কারের আশা করেননি এবং তিনি কোনো মানুষের কাছ থেকে ধন্যবাদ কিংবা স্বীকৃতিও আশা করেননি।

জেনারেল আকরাম সাহেবও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ বিয়ে নিয়ে বিদ্রোহিত ছড়িয়েছেন। তিনি এ বিয়েকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শারীরিক সক্ষমতা এবং সুঠাম গড়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন এভাবে যে, এ যোগ্যতার কারণে তিনি আরব উপত্যকায় অনেক সুন্দরী মহিলার প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। এভাবে জেনারেল আকরাম খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পুরোনো ডন জুআনের চরিত্রে বর্ণনা করেছেন যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরী মহিলাদের সাথে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকা। জেনারেল আকরামের এ ভাষ্য অবশ্যই মিথ্যা; খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন যোদ্ধা ছিলেন যে কিনা কেবল ইসলামের জন্যই লড়াই করেছেন। ড. হেইকেল এবং জেনারেল আকরাম থেকে আমরা একটি সত্যই জানতে পারি যে, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে কত সহজে একজনের চরিত্রে কালিমালেপন করা যায়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছেই এর প্রতিদান আশা করেননি। যুদ্ধের সময় তিনি শাহাদাতের জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করেছেন। তিনি কেবল মুসলিম মুজাহিদদের পাশেই থাকেননি, বরং সম্মুখ সারিতে সরাসরি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বযাখার যুদ্ধের দিন তিনি যখন মুসলিম সৈন্যদের সারি থেকে একা এগিয়ে যান, তখন তার অধীনস্থ একজন সৈন্য চিৎকার করে বলে ওঠেন, ‘আল্লাহ, আল্লাহ! আপনি আমাদের নেতা এবং আপনি এভাবে অগ্রসর হবেন না (আমাদের সকলের সামনে)।’ তিনি জবাবে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি জানি না তুমি কী বলতে চাচ্ছ। আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি কারণ আমি মনে করি না যে পেছনে ধৈর্যধারণ করার সময় আমার আছে এবং আমি ভয় করি যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যাবে।’^{১৫৩} আর ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মুসলিম বাহিনীর সর্বাগ্রে লড়াই করছিলেন, তিনি অনেক বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেছিলেন। তার সামনে যেই আসত তাকেই হত্যা করে ফেলতেন।’

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবন বিজয় অথবা শহাদাতের আশায়ই লড়াই করেছেন। একজন সেনাপতি সাধারণত কোনো পাহাড়ের উপর

^{১৫৩} খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ, সাদিক অর্জুন (পৃ. ১৮০)।

থেকে কিংবা কমান্ড-সেন্টার থেকে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে নিজ বাহিনীর সম্মুখসারিতে অবস্থান করে শত্রুর বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। তিনি নিজে মুসাইলামার এক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

আমি বাগানে (মৃত্যুর বাগানে) অবস্থান করার সময় মুসাইলামার এক সৈন্য আমাকে ধরে ফেলে। ফলে আমরা উভয়েই ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। আমি তাকে আমার তলোয়ারের সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে আঘাত করি। সেও আমাকে তার তরবারির মাথা দিয়ে বারংবার আঘাত করতে থাকে। খুব দ্রুত সে আমার শরীরে সাতটি বড় রকমের জখম করে এবং সেখান থেকে অনর্গল রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। আমার হাত তার হাতে ধরা। এ অবস্থায় আমি কোনো রকমে আমার ছুরি শেষ পর্যন্ত তার শরীরে বিদ্ধ করতে সমর্থ হই। মৃত্যুতে তার দেহ নিখর হয়ে গেলে আমার হাত তার মুঠি থেকে ছাড়া পায়। আমি ব্যথার তীব্রতায় নড়াচড়া করতে পারছিলাম না এবং আমার জখম থেকে তখনও অনবরত রক্ত বের হচ্ছিল। যা হোক, সে মৃত্যুবরণ করে এবং আমি এখনও বেঁচে আছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।^{১৫৪}

আরেকটি বিষয় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দক্ষ সেনানায়কে পরিণত করে : তিনি কখনও শত্রুকে অবহেলা করেননি এবং তিনি সব সময় শত্রুদেরও তাদের ভালো যোগ্যতার জন্য প্রশংসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বনু হানীফার লোকজনের যুদ্ধ করার সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেছেন, ‘আমি শত্রুপক্ষকে দেখলাম (বনু হানীফার লোকজন) বিশবারের মতো সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি তাদের মতো এ রকম ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুর তীরের আঘাত সহ্য করতে দেখিনি এবং তাদের মতো এ রকম দক্ষতার সঙ্গে কাউকে তরবারি চালাতেও দেখিনি। ইরামামার দিনে বনু হানীফার লোকজনের মতো রণক্ষেত্রে এত দৃঢ় ও অনড় থাকতেও কাউকে দেখিনি। ঐদিন প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাতে জর্জরিত হয়ে আমি চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মারাত্মক সব জখম এবং ব্যথার তীব্রতায় আমি বেঁচে

থাকার আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর
গুনছিলাম।”^{১৫৫}

**সাত। খালিদ রা.-কে হত্যার চেষ্টা এবং আবু বকর
রা.-এর সঙ্গে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

যতই প্রমাণ উপস্থাপন করা হোক না কেন, কিছু লোকের চিন্তা-ভাবনার
কখনই পরিবর্তন হয় না : মিথ্যাই তাদের জীবনের একমাত্র উপকরণ। এ
শ্রেণির মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই যাবে যতক্ষণ না তারা
পরাজিত হয়। একসময় তারা প্রকাশ্যে শত্রুতা ছেড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে
গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বনু হানীফা গোত্রের সালামা ইবনে উমায়ের
হচ্ছে এ রকম একজন ব্যক্তি। ইয়ামামার যুদ্ধে তাদের লোকজন পরাজিত
হয়েছে, তাদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছে এবং গোত্রের সবাই তাওবা করে
ইসলামে পুনর্বার দাখিল হয়েছে; তারপরেও সে পূর্বের ধ্যান-ধারণাতেই
বহাল রয়েছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দৃঢ় বাসনা
লালন করছে।

বনু হানীফার সঙ্গে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্ধিচুক্তি করার পরও
সালামাহ এর বিরুদ্ধাচরণে নিজের অবস্থান প্রমাণ করতে খালিদ
রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবননাশের সংকল্প করেছে। কোনো কিছু করার
আগেই তার পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় এবং তাকে বন্দী করা হয়। সে তার
গোত্রের লোকজনের সামনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর ভবিষ্যতে এমন
দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু কোনোমতে বন্দীত্ব থেকে ছাড়া পেয়ে
সে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য
আরও একবার পরিকল্পনা করে। সে সম্ভবত ভালো পরিকল্পনা করতে
পারেনি। সে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রহরীর হাতে ধরা পরে এবং
প্রহরী সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। বনু হানীফার লোকেরা
সালামার জন্য আর দায় নিতে চায়নি। তারা প্রহরীর আহবানে সাড়া দেয়।

তারা কোনো সহানুভূতি প্রকাশ না করে সালামাকে আটকে ফেলতে সহায়তা করে। কারণ, ইতিমধ্যে তাকে এ দুষ্কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়েছিল। তারা সবাই মিলে সালামাকে ধাওয়া করলে সে একটি কূপে পড়ে নিহত হয়। যারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের জন্য সালামা একটি বাস্তব উদাহরণ। কত প্রমাণ তার সামনে উপস্থাপন করা হলো অথবা কতবার অনুশোচনা করার সুযোগ দেয়া হলো —এগুলো তার কোনো কাজেই আসেনি।

বনু হানীফার প্রতিনিধিদল

বনু হানীফার প্রতিনিধিদল মদীনায়ে এলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বলেন, ‘মুসাইলামার বানোয়াট কুরআন থেকে কিছু শোনাও।’ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; মুসাইলামা মৃত্যুবরণ করেছে এবং বনু হানীফার লোকজন মুসাইলামাকে অনুসরণ করার জন্য এখন ভীষণভাবে অনুতপ্ত। এজন্য কিছুটা লজ্জিত হয়ে প্রতিনিধিদল জবাব দিল, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি কি আমাদের ক্ষমা করবেন না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘অবশ্যই তা করব।’ তখন তারা মুসাইলামার তথাকথিত অহী পড়ে শোনাল : ‘হে ব্যাণ্ডের কন্যা! তুমি তোমাদের জন্য পরিকার রাখ। পানি নষ্ট করো না, আর পানকারীকে নিষেধ করো না, তোমার মাথা পানির মধ্যে এবং লেজ কাঁদার মধ্যে।’ মুসাইলামা এসব কথাগুলোকে অহী হিসেবে তার উপর নাযিল করা হয়েছে বলে প্রচার করত। এ রকম আরও কয়েকটি অর্থহীন ও অসংলগ্ন উক্তি শোনার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘তোমাদের জন্য দুর্ভোগ! সে তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল!’

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুসাইলামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের অনুরূপ কাজ করার চেষ্টা করত। সে জানতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কুয়োতে লাল নিষ্কেপ করায় কুয়োর মধ্যে পানির ধারা ফুটে উঠেছে। সেও একটি কুয়োতে লাল নিষ্কেপ করে। কিন্তু এতে কুয়োর সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়। আরেকটি কুয়োতে সে লাল নিষ্কেপ করায় তার পানি তিক্ত হয়ে যায়।

মুসাইলামা কাজ্জাবের কাজে বরকতের বিপরীত প্রতিফলন ঘটত। একবার সে অযু করে অবশিষ্ট পানি খেজুর গাছের গোড়ায় দিলে গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। একবার দু-টি বালককে দুআ নেয়ার উদ্দেশ্যে তার কাছে আনা হয়। সে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কিন্তু এতে একজনের মাথার সব চুল পড়ে যায় এবং অপরজন ভোতলা হয়ে যায়। কোনো একলোকের চোখে ব্যথা হলে মুসাইলামা তার দুই চোখ মাসাহ করে দেয়। এবার পাঠকরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, তারপর কী হয়েছিল। লোকটি ভালো হওয়ার পরিবর্তে তার উভয় চোখই অন্ধ হয়ে যায়।^{১৫৬}

আট। পবিত্র কুরআন মাজীদ সংকলন প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের সময় পবিত্র কুরআন মাজীদ একটি গ্রন্থ হিসেবে একত্রিত করা ছিল না, বরং কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লোকের কাছে সংরক্ষিত ছিল—প্রস্তরখণ্ডে, চামড়ায়, খেজুর-ডালের ছিলকায় এবং মানুষের অন্তরে মণ্ডলিত ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়াতে ইসলামের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এটা এমন এক ক্ষতি যা সবকিছুর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনাকে ভাবিয়ে তোলে : কুরআন হারিয়ে যাওয়া, অথবা নিদেনপক্ষে কুরআনের কিছু অংশ কিংবা সূরা হারিয়ে যাওয়া। এর অন্যতম কারণ হলো, সাহাবীরা অনাগত দিনগুলোতে মুরতাদ ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আরও অনেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে। আর এসব যুদ্ধে যদি বাকি হাফেজে কুরআন সাহাবীরাও শহীদ হয়ে যায়, তাহলে কুরআন মাজীদ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়টির ভয়াবহতা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দ্রুত কুরআন মাজীদ গ্রন্থাকারে সংকলিত করার আবেদন জানান। ইয়ামামার যুদ্ধের কিছুদিন পরেই আবু

বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অহী লেখক যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন। যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট এলে তার পাশে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বসে থাকতে দেখেন। আরু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘আমার কাছে উমর এসে বলেছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কুরআন শহীদ হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহে আরও অনেক হাফেজে কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তিনি আমাকে কাউকে নিয়োগ করে কুরআন (যা বিভিন্ন চামড়া, হাড্ডি কিংবা হাফেজে কুরআনের হৃদয়পটে রয়েছে) জমা করার অনুরোধ করেছেন।’ আমি তাকে বলেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যে কাজ করে যাননি, আমি তা কেমন করে করতে পারি? তখন উমর বলল, ‘এটা একটি উত্তম কাজ (যা আপনার করা উচিত)।’ কিন্তু উমর বার বার আমার নিকট এসে একই অনুরোধ করতে লাগলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা’আলা আমার অন্তর খুলে দিলেন যে বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা উমরের অন্তর আগেই খুলে দিয়েছিলেন। এখন কুরআন জমা করার ব্যাপারে আমিও উমরের মতো একই ধারণা পোষণ করি।’

এ পর্যন্ত কথোপকথনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত ধারণা করতে পারেননি যে, এর পর কি হতে যাচ্ছে : তাকে তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন এবং দুর্লভ কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। আরু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, ‘তুমি যুবক এবং জ্ঞানবান। তোমার বিশুদ্ধতা, সততা এবং সত্যবাদিতার প্রতি কারও কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী লেখার সৌভাগ্যও তুমি অর্জন করেছ। তুমি সম্পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন মাজীদ সংকলন করার কাজে লেগে যাও।’ যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘যদি একটি পর্বতের বোঝাও আমার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হতো, তবে তা কুরআন সংকলনের ন্যায় গুরুতর বোঝা বহন করার চেয়ে আমার পক্ষে সহজ হতো।’

যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে বলেছেন, ‘আমি কুরআন সংকলনের কাজে মশগুল হলাম। চামড়া, হাড্ডি, পাথরের টুকরায় যা বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছিল, আর হাফেজদের স্মৃতিপটে যা কিছু সংরক্ষিত ছিল,

সবকিছুই একত্রিত করতে লাগলাম। সূরা তওবার শেষের দু-টি আয়াত একমাত্র খুযায়মা আনসারী ব্যতীত অন্য কারও নিকট পাইনি।’

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ❶ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ❷

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল।
তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের
মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি
তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য
যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহা নেই। আমি তারই ভরসা
করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।^{১৫৭}

কুরআন মাজীদ একত্রে সংকলন করার পর তা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
আনহুর মৃত্যু পর্যন্ত তার নিকট সংরক্ষিত থাকে। তারপর তা উমর
রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এবং তার ইন্তেকালের পর জমাকৃত কুরআন
মাজীদ হাফসা বিনতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট সংরক্ষিত
থাকে।^{১৫৮}

উপরের বর্ণনার আলোকে আল-বাগভী রহ. লেখেন, ‘এ বর্ণনা থেকে এটা
পরিস্কার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর
নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের সম্পূর্ণ অংশ সাহাবীরা জমা করেছিলেন।
তারা সেখানে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করেননি। তারা
কুরআন জমা করেছিলেন কারণ, তারা কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে
যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন অথবা সকল কুরআনে হাফেজ হয়তো শীঘ্রই
দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। কুরআনের সব অংশ এক জায়গায় সংগৃহীত
ছিল না, বরং বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত ছিল—খেজুর ডালে,
প্রস্তরখণ্ডে, হাড়িতে কিংবা হাফেজদের স্মৃতিপটে। যখন সাহাবীরা
কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলেন, নিদেনপক্ষে কিছু অংশ

^{১৫৭} সূরা আত-তাওবা, ৯:১২৮-১২৯।

^{১৫৮} বুখারী (৪৯৮৬)।

হারানোর ভয় ছিল, তখন তারা খলীফার কাছে গিয়ে কুরআন এক জায়গায় জমা করার অনুরোধ জানান। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন জমা করার আদেশ দেন এবং এক্ষেত্রে সকল সাহাবীদের অবিতর্কিত ঐকমত্য ছিল। তারপর তারা কোনো সংযোজন কিংবা বিয়োজন ছাড়া যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন, সেভাবে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করেন এবং এর ক্রমধারাও বজায় রাখেন। তারা যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন বা শিখেছেন তার কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখনই কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হত, তখনই তিনি তা যথাযথ ক্রমধারা অনুযায়ী সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন যা আজও একইরকম আছে। আর এই ক্রমধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বয়ং জীবরাইল আলাইহিস সালাম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিটি আয়াত নাযিল হওয়ার সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম এ আয়াতের নির্দিষ্ট সূরা ও স্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে দিতেন।^{১৫৯}

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আবু বকরের প্রতি রহম করুন, কুরআন সংকলনের কাজে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সওয়াবের অধিকারী। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে একস্থানে সংকলিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।’^{১৬০}

এটা নিশ্চিত যে, যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন জমা করার দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্তটি ছিল কঠিন। কিন্তু এটাও একই সত্য যে, এ কাজের জন্য যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও মেধা ছিল। নিচে তার কিছু যোগ্যতা তুলে ধরা হলো :

- ১। তিনি ছিলেন যুবক। তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর। এ কাজের জন্য একজন পরিশ্রমী মানুষের প্রয়োজন ছিল যা তার বয়সেই সম্ভব। মূলত তাকে কুরআন জমা করার সময় অনবরত কষ্ট ও পরিশ্রম করে একজন দক্ষ তদন্তকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তিনি

^{১৫৮} শাহরুস-সুন্নাহ, আল-বাগদী (৪/৫২২)।

^{১৬০} ইবনে আবু শাইবাহ (৭/১৯৭)।

সর্বক্ষণ বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়েছেন, প্রাপ্ত তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই করেছেন, কয়েকজনের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছেন, তাদের নিকট থেকে দলীল সংগ্রহ করেছেন, কোনো আয়াত না পাওয়া গেলে তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন এবং এ রকম আরও অনেক কাজে তাকে নিমগ্ন হতে হয়েছে।

২। প্রথর বুদ্ধিমত্তা, গভীর প্রজ্ঞা এবং শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি ছিল যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আল্লাহপ্রদত্ত এক বিশ্বয়কর দান।

৩। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ, কখনও কোথাও কোনোভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। একজন সৎ ও একনিষ্ঠ ঈমানদার হিসেবে তার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মেধাও ছিল অপূর্ব। এজন্য কারও দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার কিংবা সন্দেহপ্রবণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। নিষ্ঠা, সততা এবং বিশুদ্ধতা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। কারণ মুসলমানগণ কুরআন জমা করার দায়িত্ব এমন একজনকে অর্পণ করেছে যার মধ্যে এগুলো থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

৪। এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ছিল। কারণ, তিনি একজন কাতেবে অহী ছিলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অহী লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য মুসলমানকেও এ ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করে।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় চারজন কাতেবে অহীর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। কাতাদাহ রহ. বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কে কুরআন জমা করেছিলেন?’ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দেন, ‘চারজন এ কাজ করেছিলেন এবং প্রত্যেকেই ছিলেন আনসার সাহাবী। উবাই ইবনে কা’ব, যু’আয ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আবু যায়েদ।’^{১৬১}

কুরআন জমা করার ক্ষেত্রে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কঠোর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেন। একজন সাহাবীর নিকট থেকে একটি আয়াত সংগ্রহের

^{১৬১} সিয়র আলাম আল-নুবালা (২/৪৩১)।

জন্য ঐ সাহাবীর আয়াতটি মুখস্থ থাকাই যথেষ্ট ছিল না। এ আয়াত গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এটা কোথাও লেখা থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ শর্তের উপর খুব দৃঢ় ছিলেন, কারণ তিনি ধরে নিতেন যে, ঐ সাহাবী কুরআনের আয়াত ঠিকমতো মুখস্থ নাও করতে পারেন। যদি কেউ তার নিকট কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে আসত, তিনি তখন কমপক্ষে দু-জন সাক্ষী খুঁজতেন যারা এ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় লেখা হয়েছে বলে দেখেছে। সংক্ষেপে পৌনঃপুনিকভাবে সঠিক এবং নির্ভুল কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।



পঞ্চম অধ্যায়

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ

প্রথম। মজবুত এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ার প্রাথমিক শর্তাবলি

প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলমানই এই আশা পোষণ করে যে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি অপরাজেয় রাষ্ট্র গঠন করা উচিত যাতে তারা পৃথিবীর বুকে নেতৃত্ব দিতে পারে। কিন্তু তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না যে, এটা মুসলমানদের জন্মগত কোনো অধিকার নয়, বরং তাদের তা অর্জন করে নিতে হবে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বর্তমান শাসকদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কিছু মুসলিম শাসক নিয়োজিত করবেন; অধিকন্তু তিনি তাদের ইসলামধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের সুযোগ দেবেন; এবং পরিশেষে তিনি তাদের ভয়ের স্থলে নিরাপত্তা ও শান্তি দান করবেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾
اقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।^{১৬২}

যে কেউ এই আয়াতসমূহ পড়বে, সে শুধু আল্লাহ তা'আলা এখানে যেসব ওয়াদা করেছেন কেবল সেগুলোই দেখবে না, বরং শর্তসমূহও খেয়াল করবে। এজন্য মুসলমানগণ পৃথিবীতে নিরাপত্তা, ক্ষমতা, উন্নতি এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে চাইলে তাদের অবশ্যই কিছু গুণাগুণ অর্জন করতে হবে এবং কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে; তারা ঈমান বিধ্বংসী সব রকমের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে। এগুলোর সবকয়টি শর্তই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অন্যান্য খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে একই অবস্থা বিরাজ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এজন্য ঐ শতাব্দীর মুসলমানদের বিজয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এজন্যই তিনি একইসাথে উসামার বাহিনী প্রেরণ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত যেমন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তেমনি তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মুরতাদ এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা কোনো সমাধান নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাকালের পর আল্লাহ তা‘আলা যদি আমাদের আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরকত দ্বারা ধন্য না করতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে, ইবনে মাখায অথবা ইবনাতু লাবুন (দু-ধরনের উটনী যেগুলোকে যাকাত হিসেবে প্রদান করা হতো)-কে উপলক্ষ্য করে আমরা যুদ্ধ করব না (মানে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না), কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের জন্য তিনি দু-টি উপায় খোলা রাখেন; হয় তাওবা কর ও যাকাত দাও, আর নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও)।’^{১৬৩}

১। বিজয় অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা

কেউ যদি কোনো বিষয়ে সফল হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই দু-টি কাজ করতে হবে : প্রথমে তাকে আল্লাহর সাহায্য ও হেদায়েতের উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত হতে হবে, তার নিকট সব প্রয়োজনের জন্য দুআ করতে হবে; দ্বিতীয়ত, তাকে এ দুনিয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। প্রাথমিকভাবে এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করছিলেন, অপরদিকে শত্রুরা কুফরের জন্য লড়াই করছিল। অধিকন্তু দুআর শক্তি উপলব্ধি করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনবরত আল্লাহর সাহায্যের জন্য দুআ করছিলেন। তারপরেও তিনি এ দু-টি কাজের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনিও আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন—মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের জন্য পার্থিব সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল তার ঈমানের উপর নির্ভর করেননি, আর তার ঈমান তো সাধারণ কোনো ঈমান ছিল না, সেটা ছিল অবিশ্বাস্য দৃঢ় ঈমান—এ ঈমানের কারণেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ বান্দাকে জীবনের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সাহায্যের আশার

পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পার্থিব উপায়-উপকরণও অবলম্বন করতে বলেছেন।
যুদ্ধ সম্পর্কে এ বিষয়টি কুরআনের পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلَمُونَ ①

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে
পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া
থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের
শত্রুদের উপর আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদের
তোমরা জান না; আল্লাহ তাদের চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা
ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে
এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।^{১৬৪}

যুদ্ধে বিজয়ের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু
আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেশ কয়েকটি সেনাদল গঠন
করেন; তিনি চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করে যুদ্ধের জন্য একটি অপূর্ব
রণকৌশল নির্ধারণ করেন; লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় সব অস্ত্র দিয়ে
তিনি তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেন; তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে
নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেনাপতি নিয়োগ দেন; যেমন :
খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে
বাস্তবায়ন পর্যন্ত তিনি নিজে পুরো যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলি
ব্যক্তিগতভাবে অবলোকন করেন। এ যুদ্ধের একটি বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ
হচ্ছে, কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সঠিক লোক নিয়োগ। তিনি
গতানুগতিকভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার সূত্রে তার গভর্নর
কিংবা সামরিক অধিনায়কদের নিয়োগ দেননি; বরং তিনি সবচেয়ে ধার্মিক
ও যোগ্যকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভাবে তিনি তার সামরিক বাহিনীর সমর
অধিনায়ক হিসেবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দিয়েছেন,
কুরআন জমা করার জন্য যায়েদ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব

দিয়েছেন এবং আবু বারযাহ আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বার্তাবাহকের দায়িত্ব দিয়েছেন। যদি কেউ এই তিনজনের চরিত্র ও মেধা যাচাই-বাছাই করেন, তাহলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে, তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাজেই নিয়োগ পেয়েছিলেন।

২। ইসলামী আইন প্রয়োগের সুফল

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে খুব দুশ্চিন্তা করতে দেখা যায় যে, যদি সারাবিশ্বে মুসলিম দেশগুলোতে যদি ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন হওয়া শুরু হয়, তাহলে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে! সত্যিকার ঈমানদাররা যুক্তি দেবে যে, মুসলমান জাতি উন্নতি করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তি, বিজয় ও সামগ্রিক দিক থেকে উন্নতি দিয়ে সাহায্য করবেন। আর ইসলামের শত্রুরা বলবে যে, যদি মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়, তাহলে তারা মারাত্মকভাবে দুর্ভোগের স্বীকার হবে। সত্যিকার অর্থে কারও অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত নয়। তাদের উচিত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং নিজেকে প্রশ্ন করা : অতীতে এমন কি কোনো সময় গিয়েছে যখন মুসলিম জাতি পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করেছিল এবং কীভাবে ইসলামী আইন তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয়েছিল। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষাকে ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে এবং সামাজিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন; প্রসঙ্গত তারা যে সময়ে বসবাস করেছিলেন, সে সময়কে ইসলামের সোনালি যুগ বলা হয়। ঐ সময়ের কোনো উদাহরণ পৃথিবীর বুকে নেই এবং তাদের উন্নতিরও কোনো দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়নি; জাগতিক এবং পার্থিব উন্নতি— উভয় দিক দিয়েই এ কথা সত্য। দুনিয়াতে মুসলমানরা তাদের উপস্থিতি চরমভাবে জানান দিয়েছে এবং তাদের সমকালীন পরাশক্তিরও ভয় পেত। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয়ের পর বিজয় দান করেছেন, প্রথমে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন বিদেশি ভূখণ্ড ও সাম্রাজ্য বিজয়ে। মুসলিম সমাজে আল্লাহ তা'আলা শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে তার বান্দাদের ধন্য করেছেন। আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সঙ্গে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।^{১৬৫}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ ۚ
مَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿١٩﴾

যাদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিদর। তারা এমন লোক যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।^{১৬৬}

ইসলামের সোনালি যুগের পরবর্তীতে মুসলমানরা যখনই দলবদ্ধভাবে ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তি, নিরাপত্তা ও ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কখনও এটা সরাসরি করেছেন, কখনও পরীক্ষা, কষ্ট ও দুর্ভোগের পর তা দান করেছেন।

^{১৬৫} সূরা আল-আনআম, ৬:৮২।

^{১৬৬} সূরা আল-হজ্জ, ২২:৪০-৪১।

৩। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের আখলাক

আল্লাহ বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥:٥٨

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-ন্দ্ৰ হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ— তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।^{১৬৭}

এ আয়াতে আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ঘটবে, সেদিকেও ইশারা করে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এ আয়াতে রাসূলের ইত্তেকালের পর উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা বিবৃত হয়েছে। ‘যে কেউ তোমাদের মধ্য হতে তার ধর্ম (ইসলাম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও’—আল্লাহ এ কথা বলে কেবল একটি দলকেই বোঝাননি, বরং অনেকগুলো দলের দিকে ইশারা করেছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহ এমন জাতিকে বের করে আনবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে’ - সুনির্দিষ্টভাবে তাতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীদের বুঝিয়েছেন যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আয়াতের বাকি অংশে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীদের

বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে—এসব গুণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আবশ্যিক। নিচে আয়াতে বর্ণিত গুণসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

ক। ‘যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে’

ইসলামের সোনালী যুগের মুসলমানদের আল্লাহ ভালোবেসেছেন, কারণ তারা ইসলামের জন্য অনেক কুরবানী করেছিলেন। ফরয ইবাদতের বাইরেও তারা ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে খুব বেশি সচেষ্ট ছিলেন। তারা নিজেদের কেবলই নফল ইবাদতে নিমগ্ন করে রাখতেন। আর তা এমন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আমল করতেন যেন তা তাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। সোনালী যুগের মুসলমানগণ ধার্মিক, নেককার এবং তাকওয়াসম্পন্ন ছিলেন যেগুলো একজনকে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গড়ে তোলে। সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَيِّينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٤﴾

যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তৃত আল্লাহ সংকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন।^{১৬৮}

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٥﴾

যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদের ভালোবাসেন।^{১৬৯}

প্রথম যুগের মুসলমানগণ আল্লাহকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মানুষ মাত্রই তাকে কেউ উপকার করলে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এ

^{১৬৮} সূরা আল-ইমরান, ৩:১০৪।

^{১৬৯} সূরা আল-ইমরান, ৩:৭৬।

পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার করুণার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিয়েছেন, তার কল্যাণে আইন প্রবর্তন করে দিয়েছেন, তার জন্য তার কাজকে সহজ করেছেন, সঠিকভাবে ইসলামের যাবতীয় আহকাম পালন করলে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন—তারপরেও আরও অগণিত অসংখ্য নেয়ামত যা উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। এতসব নেয়ামত যে সত্তা নসীব করেছেন, এজন্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ আল্লাহকেই বেশি ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসা তাদের অন্তরে এত বেশি প্রোথিত ছিল যে, তা অন্য কোনো মানুষ বা বস্তু প্রতি তুলনীয়ও ছিল না। তার যখন জানতেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনোকিছুকে ঘৃণা করেন, তখন তারাও সেটাকে ঘৃণা করতেন। আবার যখন জানতেন যে, আল্লাহ কোনোকিছুকে ভালোবাসেন, তখন তারাও সেটাকে ভালোবাসতেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে আল্লাহর চাওয়াকে প্রাধান্য দিতেন। তদুপরি তারা আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করে আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই প্রকাশ করেছিলেন। আর এ ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তারা তাদের কাছে যা ছিল, সবই আল্লাহর পথে ত্যাগ করার জন্য সদাপ্রস্তুত ছিলেন। যে কোনো প্রয়োজনে কোনো রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তারা আল্লাহর জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে তৈরি ছিলেন। তারা আল্লাহকে এসব কাজের মাধ্যমে ধন্য দিচ্ছেন—এ কথা মনে করার পরিবর্তে তারা সব সময় আল্লাহই তাদের সম্মান এবং জান্নাতের ওয়াদা দিয়ে ধন্য করেছেন মনে করতেন।

খ। ‘তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাকেরদের প্রতি কঠোর হবে’

ইমান আনার প্রথম দিন থেকেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য মুসলমান ভাইদের প্রতি বিনয়ী ও সহনশীল ছিলেন। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি মুসলমান দাসদের কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করতেন এবং তাদের একই পর্যায়ভুক্ত করে নিতেন। মক্কা এবং মদীনা—উভয়স্থানেই তিনি ছিলেন একজন উদারচিত্তের মেজবান, বিশেষ করে গরিবদের জন্য। পরবর্তীতে তিনি যখন মুসলিম জাতির খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সমাজের দুঃস্থ ও বয়স্কদের খোঁজ-খবর

নেয়ার জন্য রাতের ঘুম বিসর্জন দেন। মোটকথা, তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিতেন।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন, অন্যদিকে বিশ্বাসীদের প্রতি ছিলেন বিনয়ী। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনড় ছিলেন। কিন্তু এজন্য শুধু মুরতাদদের অবিশ্বাসই দায়ী ছিল না, বরং তাদের মধ্যে বসবাসরত কিছু মুসলমানদের শিক্ষা দেয়াও একটি উদ্দেশ্য ছিল। যদি কোনো গোত্রের বেশিরভাগ লোক মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের মধ্যে বসবাসরত স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের উপর (যারা তখনও মুরতাদ না হয়ে দীনের উপর মজবুতভাবে টিকে ছিল) অত্যাচার, নির্যাতন করত এবং এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে ফেলত। এসব মুসলমানদের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্তরে দয়া ও সহানুভূতি অনুভব করেন এবং এসব মুসলমানদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি প্রতিটি মুরতাদকে তার অন্যায়-অবিচার ও জুলুম অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার বিধান জারি করেন। এভাবে যদি কোনো মুরতাদের বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানকে নির্যাতন করে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া যেত, তাকেও তিনি একইভাবে হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন।

গ। ‘তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না’

যুদ্ধ রক্তের উন্মাদনা; যুদ্ধ নির্মম; যুদ্ধ এক ভয়াবহ কর্মযজ্ঞ; তথাপি যুদ্ধ কখনও খুব প্রয়োজনীয়—অপশক্তিকে দমন করার এটাই একমাত্র উপায়। প্রথম দিকে মুসলমানগণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন না, অনেক বড় বড় সাহাবী এবং অন্যান্য নেককার মুসলমানগণ তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির করার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধঘোষণা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ফলশ্রুতিতে মুসলিম জাতি আল্লাহর বাণীকে সবকিছুর উপর সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন, আল্লাহর ঐশী আইনকে আরব উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং

অনেক বিপথগামী মুসলমানকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। পুরো আরব সাম্রাজ্য ইসলামের একতাবদ্ধ হওয়ার পর তারা বিদেশি ভূখণ্ড বিজয়ে অভিযান পরিচালনা করার দিকে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীরা কোনো মানুষের সমালোচনার ভয় করেননি, বরং প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন ছিল, তাই করেছিলেন যাতে মিথ্যার উপর সত্য বিজয় হয়। এজন্য আল্লাহ তাদের শক্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন এক নেতার অধীনে এবং সত্য-শাশ্বত ইসলামধর্মের পতাকা তলে।

ঘ। ‘এটি আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন’

আয়াতের শেষাংশে আগে যা বলা হয়েছে তারই সমাপ্তি টানা হয়েছে। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। তারা বিশ্বাসীদের প্রতি নরম, অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং এ কাজ করার মধ্যে তারা মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায় না—এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ, এটা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

দ্বিতীয়। আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে সামাজিক অবস্থা

কেউ যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল পর্যালোচনা করে, তাহলে সহজেই তখনকার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা যে কোনো সময়ের মুসলিম সমাজ থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আদর্শিক মনে হবে। নিচে ঐ সমাজ ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো :

১। ‘ইসলামী’ শব্দ দ্বারা যা বোঝায় প্রকৃতপক্ষেই তখনকার সমাজব্যবস্থা ‘ইসলামী সমাজ’ ছিল। ইসলামী আইন কেবল ব্যক্তির অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং তার বাহ্যিক আচার-আচরণেও একইভাবে প্রতিভাত হতো। মুসলমানগণ সর্বাত্মকভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগ

ও বাস্তবায়নে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক ছিলেন। যে কোনো সমাজে অপরাধ সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সমাজে অপরাধপ্রবণতা এত সামান্য ছিল যা পরবর্তীতে কোনো সমাজেই আর পরিলক্ষিত হয়নি।

ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে রাখা হয়নি, বরং ধর্মই ছিল জীবনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক। ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে ধর্মই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করত। ব্যক্তির আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারম্পরিক সম্পর্ক, আইন-কানুন সবকিছুতেই ইসলামী আইন চালু ছিল।

উপরে যা বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তখন সমাজের প্রতিটি মুসলমানই পবিত্রতার শিখরে আরোহণ করেছিলেন, বরং দুনিয়ার কোনো সমাজেই এ ধরনের সামগ্রিক পবিত্রতা আশা করা যায় না। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও সমাজে সবাই উন্নত চরিত্রের নাগরিক হতে পারেনি। সেখানে মুনাফিক ছিল, আরও অনেকে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিল এবং অনেকে দুর্বল ঈমানদারও ছিল। তবে এ দলগুলোর কোনোটাই সত্যিকার অর্থে সমাজের ধারাবাহিক উন্নতির পথে বাধা হতে পারেনি। প্রভাব এবং ক্ষমতামূল্য হওয়ার কারণে তারা মুসলিম সমাজের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। প্রকৃত ঈমানদারদের হাতেই সত্যিকার ক্ষমতা ছিল; তারাই সমাজে আচার-আচরণ ও নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিলেন।

২। ‘জাতি’ বলতে যা বোঝায় তা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময়। কিছু গোত্র একত্রিত হলেই জাতি হয়ে ওঠে না—যদিও তারা একই ভূমি, ভাষা অথবা সংস্কৃতির অধিকারী হয়। ইসলামে জাতি গঠনে জনগণের মধ্যে যে ঐক্য ও সংহতি দৃষ্টিগোচর হয় তা বর্ণ, গোত্র কিংবা ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, বরং তা ব্যক্তির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপরই বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসে কোনো দলই এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো সফল হতে পারেনি।

এখন চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় মুসলমানদের শতধাবিভক্ত হওয়ার অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

তাদের মধ্যে কিছু ছিল আরব, কিছু আবিসিনিয়ান, কিছু রোমান এবং আবার কিছু ছিল পার্সিয়ান। তাদের চেহরায় যেমন অমিল ছিল তেমনি তাদের সমাজ-সংস্কৃতিও ছিল বৈচিত্রময়। একটিমাত্র বিষয়ই তাদের মধ্যে মিল ছিল। আর তা হলো তাদের বিশ্বাস। এই একটি বিষয়ই তাদের ভ্রাতৃত্ব গড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই ঈমানদীপ্ত চেতনার সাদৃশ্যের কারণেই তারা আরব মুসলমানদের নিজের পৌত্তলিকতায় লিপ্ত বাবা-মা, ভাই-বোন থেকে বেশি আপন ও ঘনিষ্ঠ মনে করতেন। এই বোধের কারণেই বিভিন্ন গোত্র ও বর্ণের মানুষকে এক পতাকাতলে আসতে সহায়তা করেছিল, তাদের এক পরিচয় ছিল—মুসলিম উম্মাহ (মুসলিম জাতি)।

৩। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের মানবিক নীতিবোধ ছিল পরিষ্কার এবং তা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইসলামী আইন থেকেই উৎসরিত। মানবিক নীতিবোধ বলতে আমি এখানে শুধু পুরুষ-মহিলার সম্পর্কেই বোঝাচ্ছি না, যদিও পুরুষ ও নারীর বৈষম্যই সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। বস্তুত এ মানবিকতা জীবনের সবকিছুকেই বেঁটন করে রেখেছিল—যেমন : ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক আদর্শ, ব্যক্তির অভিব্যক্তি, সমাজের একে অন্যের সঙ্গে আচার-আচরণ ইত্যাদি। অন্যের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক মুনাফেকী, বিদ্বেষ, অপবাদ এবং গীবত-শেকায়েতে লিপ্ত ছিল না; বরং পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্বস্ততা, সততা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় আকীর্ণ ছিল।

৪। এটা ছিল একটি উৎপাদনশীল সমাজ। এটা গতানুগতিক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা ছিল সত্যিকার অর্থেই উন্নতি এবং অগ্রযাত্রার প্রতীক। ইয়া, সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মতবিরোধও ছিল, তবে তা কখনই রুষ্টতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণমুখী ছিল না; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে এ বিরোধ ছিল উৎসাহ উদ্দীপক, চরম গতি ও কঠোর পরিশ্রমের সোপান। ইবাদত, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ, অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতা, ভালো কাজের নির্দেশ, মন্দ কাজে বাধা, জিহাদে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ, মসজিদে সময় ব্যয় এবং এ রকমই আরও অনেক ভালো কাজে নিয়োজিত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা অনর্থক সময় নষ্ট করতেন না; রাস্তায়

দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করে কিংবা অবসর বিনোদন অথবা কারও দোষ তালাশ করে কালক্ষেপণ করতেন না। তারা সঙ্গীদের মঙ্গল কামনা এবং জাতির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।

৫। যদি কেউ এককথায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সমাজব্যবস্থাকে ব্যক্ত করতে চায়, তাহলে 'কাজ'-ই হবে সঠিক শব্দ। প্রায় প্রতিটি মুসলমানই ব্যক্তিগত উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির উন্নতিতে চেষ্টা-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন—কেবল কথায় নয়, কাজেও। আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা তখন যুদ্ধের দামামার মধ্যে বসবাস করছিলেন; প্রথমে মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে বিদেশি ভূখণ্ড অভিযানে। কিন্তু তারপরেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দেশের জনগণকে যুদ্ধে যেতে কাউকে বাধ্য করেননি। বরং জনগণই স্বেচ্ছায় এসব যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নাম লেখাতেন। তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কারণ, তারা জানতেন, এর বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করবেন অথবা বিজয় দান করবেন।

৬। সমাজের সর্বত্র ইবাদতের প্রতিযোগিতা চলত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতও করতেন। এমনকি ইবাদতের মানসিকতা লোকদেখানো চিন্তা-ভাবনা থেকে ছিল বহু দূরে। যেমন, নামায। মূলত মানুষের জীবনের সবদিকই এ ইবাদত ঘিরে রেখেছিল। প্রত্যেক মুসলমান জানতেন, তাদের সব কাজ ইবাদতে রূপান্তর করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গভর্নররা সমাজ ও জনগণকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব নিয়ম-নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করতেন। একজন অন্যকে ইবাদতের নিয়তেই কুরআন অথবা ফিকহ শিক্ষা দিতেন; মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল মূল লক্ষ্য। এমনকি ব্যবসায়ীরাও তাদের সব লেনদেনকে ইবাদতে পরিণত করেছিলেন। আচরণে সততা, খরিদারদের প্রতি আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি ইসলামী আইন অনুসরণ করে তারা ব্যবসাকে ইবাদতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইবাদতের নিয়তে সঠিক ও ন্যায় আচরণ করার চেষ্টা করতেন এবং তার স্ত্রীরও একই প্রচেষ্টা ছিল। সংক্ষেপে

প্রতিটি ব্যক্তিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীকে অনুসরণ করায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন,

‘প্রতিটি মানুষই রাখাল এবং সে তার বকরির পালের জন্য জিজ্ঞাসিত হয়ে।’

উপরের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থেই একটি ‘ইসলামী’ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজে এত প্রকাশ্যভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হতো যা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে ইসলামধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছরেই ইসলামধর্ম পশ্চিমে সমুদ্র উপকূল এবং পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আর সামরিক দিক দিয়ে ইসলামের বিজয় ছিল বিস্ময়কর; কেবল অস্ত্র ও শক্তি এত বিপুলভাবে মানুষের অন্তরকে কখনও জয় করা সম্ভব হতো না।

বিজিত এলাকাসমূহে মানুষ কোনো ধরনের দ্বিধা ছাড়াই স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। তারা এ রকম করত কারণ তারা দেখত যে, মুসলমানরা নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শ—ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করছে এবং তারা যা দেখত, তা দেখে মোহিত হতো—তারাও এ রকম ইসলামের সৌন্দর্যে অবগাহন করতে চাইত।

তৃতীয়। কীভাবে আবু বকর রা. বহিঃশত্রুদের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রতিহত করেছিলেন

সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রচার-প্রসার হতে লাগল। এ অঞ্চলে অনেক আরব গোত্র যারা আগে রোম ও পারস্যের প্রতি নমনীয় ও বিশ্বস্ত ছিল, তাদের মুসলিম জাতির সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করা হলো। এখানে ঐসব আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা রোম ও পারস্যের সীমান্তবর্তী আরব ভূখণ্ডে বসবাসরত ছিল। মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলেও তারা বিশ্বস্ত ছিল না। যখনই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পায়, তখন তারা আবার তাদের রোম ও

পারস্যের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রোম ও পারস্যের সৈন্যদের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে এ সখ্যের প্রতিফলন ঘটে। রোম ও পারস্যের নেতারা এ আরব জনগোষ্ঠীকে তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে বাফার জোন হিসেবে ব্যবহার করে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে রোমান ও পার্সিয়ান নেতারা এ আরবদের নিকট অস্ত্র ও সৈন্য প্রেরণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় এ রকম আনুষঙ্গিক আরও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, এ রকম বহিঃশত্রুদের প্রভাবকে কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। এজন্য তিনি এসব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্য অনেকগুলো বাহিনী প্রেরণ করেন। যদি রোম ও পারস্যের নেতারা এ অঞ্চলের আরবদের সৈন্য প্রেরণ করে সাহায্য করতে আগ্রহী হয়, তাহলে পরে হয়তো পুরো আরবই দখল করার চেষ্টা করবে। এজন্য রোম ও পারস্যের নেতাদের কোনোক্রমেই মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে দেয়া উচিত নয়। এ কারণেই উসামার বাহিনী প্রেরণের যৌক্তিকতা প্রগাঢ়ভাবে পজিটিভ ফলাফল বয়ে আনে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের উঁচু এলাকা হামকতাইনে, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাবুক এবং দামাওতুল জান্দালে, আলা ইবনে হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইন এবং তার সাহায্যার্থে মুসান্না ইবনে হারিসা শাইবানী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। বাহরাইনে তাদের মিশন শেষ হওয়ার পর মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দক্ষিণ-ইরাকে প্রেরণ করেন। সাজাহ তামিমিয়াহ, যে নিজেকে মহিলা নবী হিসেবে দাবি করে এবং যার সঙ্গে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিয়ে হয়, মুসান্নার সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করে নিজের দেশ ইরাকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে সে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে ইরাকে এক খ্রিস্টান পরিবারভুক্ত ছিল।

অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুদের সঙ্গে আচরণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। বাহ্যিকভাবে অনেকের কাছে মনে

হয়েছিল মুরতাদদের সমস্যা নিরসনই তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এটা পরিকার ছিল যে, মুরতাদদের সমস্যা নিরসন তার প্রধান কাজ হলেও তিনি যদি আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী এলাকায় রোম ও পারস্যের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি তার কর্তব্যে অবহেলা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হবেন। এজন্য তিনি আরব উপদ্বীপের পুরো সীমান্ত এলাকায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যা রোম ও পারস্য থেকে মুসলমানদের সাম্রাজ্যকে আলাদা করে রেখেছিল। তিনি আলা হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাযদ এলাকায় প্রেরণ করেন; আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দামাওতুল জান্দালে এবং খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের উঁচু ভূমিতে প্রেরণ করেন, ইতিমধ্যে যদিও তিনি উসামার বাহিনীকে ঐ এলাকায় আগেই প্রেরণ করেছিলেন।

পার্সিয়ানরা তাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আঘাত করার জন্য প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগানোর জন্য উদগ্রীব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলিম-পার্সিয়ান সীমান্ত এলাকা বরাবর বসবাসরত আরব গোত্রগুলো পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের বাদশা কিসরার অনুকম্পা পাওয়ার আশায় চুক্তিবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বকর ইবনে ওয়াইল গোত্র কিসরাকে বাহরাইনের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তাব দেয়। বাদশা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং মুনযির ইবনে নোমানকে তাদের ফিরতি পথের সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করে। মুনযিরের সঙ্গে সাতহাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী ছিল। তাদের কিছু ছিল অশ্বারোহী এবং বাকিরা পদাতিক বাহিনী। বাহ্যিকভাবে সংখ্যাধিক্য ও চাকচিক্যময় মনে হলেও তাদের শত্রু শক্তিশালী মুসলমানদের বিপক্ষে এরা বড় ধরনের কোনো হুমকি হয়ে উঠতে পারেনি।

পার্সিয়ানরা আরব উপত্যকায় অনবরত গণ্ডগোল সৃষ্টির পায়তারা অব্যাহত রাখে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় শুণু নবী দাবিকারিণী মহিলা সুজাহকে ইরাক ত্যাগ করে আরব ভূখণ্ডে পার্সিয়ান আর্মির সঙ্গে প্রবেশে বাধ্য করে।

পার্সিয়ানরা যদি মুসলমানদের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি এবং তাদের দুর্বল করার আশ্রয়ী হতো, তাহলে রোমানরা এ ব্যাপারে দিগুণ উৎসাহিত ছিল। আর তারা মুসলমানদের জন্য আরও বিপজ্জনক ছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে; তাদের জাতির মধ্যে জটিল বিশ্বাস ও প্রথা চালু ছিল এবং তার যুগ যুগ ধরে নিজস্ব এক সমাজব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন গড়ে তোলে; তাদের জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় সৈন্যসংগ্রহ সহজসাধ্য ছিল। তাছাড়া এবং আরও অনেক জাতি, গোত্র এবং মানুষ তাদের মিত্র ছিল। রোমানদের নিকট ঐসব জাতি বা গোত্র বিভিন্ন কারণে দায়বদ্ধও ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক রোমানদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর পর থেকেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতাবশত প্রকাশ্যে বারংবার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের অতি উৎসাহী শত্রুতার জন্যই দ্রুত দু-টি যুদ্ধের সূচনা হয়—যূতা এবং তাবুক যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে দু-টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। প্রথমত, যূতা ও তাবুক রোমানদের এ কথা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করে যে, তাদের শত্রু মুসলমানদের পরাজিত করা এত সহজ নয়; দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের কাছে এ সত্য উন্মোচন করে যে, শামে বসবাসরত আরবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও আসলে তারা রোমে খ্রিস্টানদের বেশি অনুগত।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মরিয়্যা রোমানদের বিস্তারিত ছক সম্পর্কে ভালোই খোঁজখবর রাখতেন। এজন্যই তিনি উসামার বাহিনী প্রেরণে এত দৃঢ় ছিলেন। উত্তর আরব সীমান্তে যেসব আরব বসবাস করত—যেমন : লখম, গাসসান, যিদাম, বালী, কদিয়া, উযরাহ এবং কালিব গোত্র—তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। যদি রোমানরা না হয় তাহলে কারা তাদের সমরাজ্ঞ, অর্থ-বিলুপ্ত এবং সামরিক কৌশল দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল? যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি যেন বলছিলেন, ‘যদিও আরবরা আমাদের ভূখণ্ডে গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে, তথাপি আমরা দুর্বল হয়ে যাইনি। আমরা মূলত যে কোনো বড় ধরনের আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে সক্ষম বা তোমরা হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার সাহস দেখাচ্ছ।’

রোম এবং পারস্য নিজের হাতে ময়লা লাগাতে আগ্রহী ছিল না। তারা চেয়েছিল যে, মুরতাদ আরবরা ইসলামকে ধ্বংস এবং মূর্তিপূজাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে তাদের পক্ষে যথেষ্ট কিছু করতে সক্ষম হবে। এজন্য রোম ও পারস্যের নেতারা তাদের মিত্র আরব মুরতাদদের যতদূর সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এমনকি তারা পালিয়ে আসা মিত্রপক্ষের মুরতাদদের আশ্রয়ও দিয়েছে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা আরবে ইসলামকে পুনরুদ্ধার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। এ সময় তাদের কাছে সীমান্তে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুই পরাশক্তিতে আক্রমণের সঠিক সময় বলে মনে হয়েছিল।

শাম এবং ইরাক অভিযানের আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তিনটি ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। সেগুলো হলো,

১। তিনি কেবল শাম এবং ইরাক আক্রমণের জন্যই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, বরং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২। তার সমাজ ছিল পবিত্র। এখানে ‘তার সমাজ’ বলতে মদীনার সমাজকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে সম্মানিত সদস্য ছিলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ।

৩। পুরো আরব সাম্রাজ্যে মুসলিম জাতি শিরক ও কুফর থেকে পবিত্র ছিল।

মুসলিম জাতির অভ্যন্তরীণ পরিবেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও শামে পর পর অনেকগুলো আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ আক্রমণে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে ওঠে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপকভাবে সফল হন, কারণ তিনি যেসব সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করেছিলেন তারা সবাই একই আদর্শে লড়াই করছিল এবং একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারা পশ্চাৎ দিক থেকে সুরক্ষিত ছিল এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব সমরাস্ত্র ও রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছিল। অধিকন্তু তারা শহীদ হওয়ার জন্য মরিয়া ছিল; কারণ, শহীদ হওয়া মানেই জান্নাতের অনন্ত-অসীম জীবন লাভ করা।

চতুর্থ। মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিছু প্রাপ্তি

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলিম জাতির জন্য যে কল্যাণকর সাফল্য বয়ে আনে, তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে আলোচনা চলতেই থাকবে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা আলোচনা করা হলো :

১। সব বাতিল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে ইসলাম স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পরপরই আরবের শান্তময় পরিবশে হঠাৎ করেই খুব সংঘর্ষপূর্ণ ও অশান্ত হয়ে ওঠে। অনেক আরব ইসলামধর্ম ত্যাগ করে পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়। কিছু কিছু আরব যুদ্ধে গনীমতের মালের বিরাট অংশ লাভ করে কেবল মুসলমান হয়েছে; অনেকে আগে থেকেই মুনাফিকী আচরণ করে আসছিল; আবার অনেকে বিশ্বাসের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমান হয়েছিল এবং আরও অনেকে শেষ দিকে ইসলাম কবুল করেছিল। প্রথম দু-টির একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে উআইয়ানাহ ইবনে হিসন আল-ফাযারী, যার ইসলাম কবুল করা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যখন কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করল, তখন দ্রুত উআইয়ানাহও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তুলাইহা তাকে সম্পদ ও প্রাচুর্যের লোভ দেখালে সে এসবের বিনিময়ে তার ধর্মকে বিক্রি করে। পরবর্তীতে উআইয়ানাহকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় বন্দী হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হাজির করা হয় এবং তখন মদীনার শিশুরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে খেজুর বৃক্ষের ডাল দিয়ে তাকে আঘাত করে বলতে থাকে, ‘হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি ঈমান আনার পর বেঈমান হয়েছিস?’ তখন সে জবাব দিত, ‘আমি কখনই ঈমান আনিনি।’

ইয়েমেনের আনস গোত্রের ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, তারাও কখনও ইসলাম কবুল করেনি; এখানে উল্লেখ্য যে, আনস গোত্র আসওয়াদ-এর গোত্র ছিল যে কিনা নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছিল। অনেকে না বুঝেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। মুরতাদদের মধ্যে

অনেকে এ শ্রেণির। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং নিচের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করে,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দুআ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দুআ তাদের জন্য সাফল্যস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।^{১১০}

তারা এখানে যুক্তি দেখিয়েছে যে, ‘যাকাত গ্রহণ কর’ এ আদেশটি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রযোজ্য; এখন যেহেতু তিনি ইজ্তেকাল করেছেন এবং তিনি আর যাকাত সংগ্রহ করতে সক্ষম নন, এজন্য যাকাত দেয়া আর ফরয নয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘কিছু আরব যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তারা মনে করেছিল খলীফাকে যাকাত দেয়া তাদের জন্য আর ফরয নয়। তাদের বিবেচনায় শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যাকাত সংগ্রহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের এ কথার যুক্তি হিসেবে নিচের আয়াত পেশ করে,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর।^{১১১}

আয়াতের এ অপব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু এবং অন্যান্য সাহাবীরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন যতক্ষণ না তারা খলীফাকে যাকাত দিতে রাজি হয় যেমন করে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাকাত দিত।’

ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শৌর্য-বীর্যে গোত্রসম্প্রীতি থেকেও দূতর হয়ে ওঠে। তারা গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে বিশ্বাসগত কারণে একে

^{১১০} সূরা আল-তাওবা, ৯:১০৩।

^{১১১} সূরা আল-তাওবা, ৯:১০৩।

অন্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং এক্ষেত্রে তারা ব্যক্তির ভুল কিংবা অত্যাচারের দিক বিবেচনা করত না। এটা এমনই অজ্ঞতার বন্ধন ছিল যা কেবল ইসলাম পূর্ব যুগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং যা অনেক অহেতুক সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল। মানুষ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের অতীত স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছিল যেখানে তারা মূর্তিপূজাসহ নিকৃষ্টতম কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং অন্য গোত্রের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, মুসাইলামা কাজ্জাব গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত যুগের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। সে বলে, ‘আমি তোমাদের বলতে চাই যে, তোমাদের থেকে কেন কুরাইশরা নবুওয়াত ও নেতৃত্বের জন্য অধিক যোগ্য? আল্লাহর কসম! তারা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয় এবং তারা তোমাদের মতো এত বেশি নেয়ামতেও ধন্য নয়। মূলত তোমাদের ভূখণ্ডের চেয়ে তাদের ভূমি এত প্রশস্তও নয় এবং তোমাদের ধন-সম্পদও তাদের চেয়ে বেশি।’

রাজ্জাল ইবনে উনফুওয়াহ আরেকটি উদাহরণ। সে মুসাইলামার গোত্রভুক্ত এমন ব্যক্তি থাকে আল্লাহ তা’আলা জ্ঞান দিয়েছিলেন। রাজ্জাল কুরআন শরীফ ভালোভাবে তিলাওয়াত করা শিখেছিল এবং ইসলামী শিক্ষাও অর্জন করেছিল। কিন্তু গোত্রপীতি তার বুদ্ধিমত্তাকে গ্রাস করে নেয় এবং তার বিচারবুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসাইলামা এবং নবুওয়াতের বিষয়ে সে বলে, ‘তারা দু-জন যেন দু-টি মেষ এবং একজন অন্যকে শিং দ্বারা আঘাত করেছে। আর এ দু-টির মধ্যে আমরা আমাদের মেষকে অধিক ভালোবাসি (মানে আমাদের গোত্রের মুসাইলামাকে)।’

তুলহা নামরী ছিল মুসাইলামাহর আরেক ভক্ত। একদিন সে মুসাইলামাহকে বলল, ‘আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, তুমি মিথ্যুক নবী আর মুহাম্মাদ সত্য নবী। তারপরেও রাবীআ বংশের মিথ্যাবাদী আমার নিকট মুযার বংশের সত্যবাদীর তুলনায় অধিক প্রিয়।’

মুসাইলামা একজন মিথ্যাবাদী এবং প্রতারণা হিসেবে বনু হানীফা গোত্রের এ সত্যায়নের পর সে নিজেও নিজের ভণ্ডামির স্বীকারোক্তি দিয়েছে। যখন

ইয়ামামার লড়াইয়ে যুদ্ধের গতি মুসলমানদের পক্ষে চলে যাচ্ছিল, তখন মুরতাদ সৈন্যরা তার দিকে ফিরে রাগতস্বরে প্রশ্ন করে, 'কোথায় বিজয় এবং কোথায় সেইসব প্রাপ্তি যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিয়েছিলে?' মুসাইলামা জবাব দিল, 'বংশগৌরব রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর। আর ধর্ম বলে আসলে কিছু নেই।'

মুরতাদরা ইসলাম এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তাদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে; নিদেনপক্ষে তারা ইসলামের শিক্ষাকে কলুষিত করতে চেয়েছিল—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষনবী—এ সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে, নামাযকে ঐচ্ছিক এবং যাকাতকে ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে অস্বীকার করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুরতাদরা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। তারা মুসলমানদের ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি এবং ইসলামের শিক্ষাকেও সামান্য পরিমাণ কলুষিত করতে পারেনি।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আপসহীন আচরণ এবং মুরতাদদের অপচেষ্টা থেকে আমরা এ শিক্ষা পেতে পারি যে, আমরা যেন আমাদের ধর্মে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চেষ্টা না করি, সমর্থনও না করি। অনেক বছর আগে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছুক্ষণের জন্য তাদের দেবতাদের ইবাদত করতে বলে এবং এর বিনিময়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করতে রাজি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। আবার অনেক বছর পর, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই কাজ করেন যখন মুরতাদরা ইসলামের কিছু শিক্ষাকে বর্জন করে (যাকাত দিতে অস্বীকৃতি) এবং কিছু শিক্ষাকে পরিবর্তন করে ধর্মকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনমনীয়তায় আরেকটি সত্য উন্মোচিত হয় যে, ইসলামের শক্তি অস্ত্র ও সংখ্যাধিক্যে নয়, বরং ঈমানের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে।

২। একদল বিশিষ্ট মুসলমানদের শক্তিশালী অবস্থান এবং সুরক্ষিত স্বদেশের গুরুত্ব

মুরতাদদের আধিক্য যখন আরব উপত্যকায় বিশৃঙ্খলার উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, তখন একদল মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং

তাদের পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই মূলদলের মুসলমানগণ বিচ্ছিন্নভাবে এবং ব্যক্তিগত পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেননি, বরং তারা একজন নেতার নির্দেশ অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছিলেন। এটা অনেকের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি আসলে গুরুত্বপূর্ণ। মূল কারণ না হলেও এটা মুরতাদদের বিরুদ্ধে অনেক বিজয়ে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল।

যখনই মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে, তারা সেক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। কিন্তু যখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে একই লক্ষ্য অর্জনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সত্যিকার ভ্রাতৃত্ববোধে এগিয়ে গিয়েছে, তা কখনও ব্যর্থ হয়নি। মুরতাদদের সঙ্গে সংঘাত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে, মুসলমানগণ একজন নেতার নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন : তারা তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে যেমন জানতেন, তেমনি তারা তাদের শত্রুদের শক্তি সম্পর্কেও জানতেন। তারপর তারা তাদের পরিকল্পনা সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়ন করেন। এটা তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং তারপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সাহায্যে মুসলিম জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সুরক্ষিত থাকতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমানদের এই বিশেষ শক্তিশালী দলের মতোই স্বদেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি স্বদেশ বা আরব ভূখণ্ডের চারিদিকে গোত্রে গোত্রে কুফর ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিদেশি ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করা বাতুলতামাত্র। এ বিষয়টি উপলব্ধি করেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অভ্যন্তরীণ সমস্যা না মেটানো পর্যন্ত বিদেশি ভূখণ্ডে কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বিস্তারিতভাবে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাদের পরাজিত করে আরব উপত্যকায় সবাইকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। তিনি তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলেন এবং আরবকে একটি নিরাপদ ও শত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তারপরই কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদেশি ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করার জন্য আরব উপত্যকাকে নিরাপদ ক্ষেত্র বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩। নতুন মুজাহিদ নিয়োগের প্রস্তুতি

রাসূলের জীবদ্দশায় মদীনার পুরো সময় ধরেই সাহাবীগণ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যাপ্ত ছিলেন। রাসূলের এ স্কুল থেকে ডিগ্রিপ্ৰাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং এ তালিকার দৈর্ঘ্য অনেক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে সরাসরি কঠোর প্রশিক্ষণের ফলেই তারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং সহজে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন।

অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা দেখার সুযোগ পাননি। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দীন শিখেছিলেন। এ রকম নতুন মুসলমান হঠাৎ করেই যুদ্ধের দামামার মধ্যে পতিত হন। অভ্যস্তরীণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে সুশৃঙ্খল মুরতাদদের বিরোধিতা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ঐসব নতুন মুসলমান দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকেন এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাহাবীদের কাছে বদর, উহুদ, খন্দক যেমন, তাদের নিকট তেমন মনে হয়; ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ও অভিযানের জন্য মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধটি তাদের জন্য বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ড তৈরি করে। তারা মুহাজির কিংবা আনসার না হওয়া সত্ত্বেও এ প্রশিক্ষণের ফলে এমন কিছু নতুন সমরনেতার উদ্ভব হয়, যারা ঈমান ও আমলে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক ছিলেন। তারা এ যুদ্ধ থেকে সমরবিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কয়েক মাস কিংবা বছর পরেই বিভিন্ন অভিযানে তাদের ভূমিকা মুসলমানদের নিকট অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে।

৪। মুরতাদদের ব্যাপারে ইসলামী আইন

কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের হাদীসে মুরতাদ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করা হয়েছে—এটাকে সেখানে একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে খুব কম লোকই আরোগ্য লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত

এদিকটি একটি খিওরি হিসেবেই থাকে। কারণ, তার ইজ্তেকালের পরই প্রথমবারের মতো এত বিস্তৃতভাবে মুরতাদদের উদ্ভব হয়। মুসলমানগণ যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন তাদের নিকট কুরআনের অনেক আয়াত গাইড হিসেবে কাজ করে। এ সমস্যা সামাধানে তাদের কীভাবে কাজ করতে হবে, তা সেখানে পরিকারভাবে বিবৃত হয়েছে। আবার সেখানে কিছু আয়াত এমনও রয়েছে যা সরাসরি আমল করার দিকে ধাবিত করে না, তবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে তা থেকে মাসআলা বের করে আমল করার দিকে উৎসাহিত করে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যে কেরাম কেবল তাদের ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রসূত মতামতের উপর নির্ভর করেননি, বরং তারা এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে সবাই এ বিষয়ে একমত না হলেও কার্যক্ষেত্রে তারা ওহীর শিক্ষার দিকেই ফিরে গেছেন এবং পরিশেষে তারা একই মত, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

৫। ‘কুচক্র কুচক্রীদেরই ঘিরে ধরে’ (আল-কুরআন, ৩৫:৪৩)

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কতগুলো বিষয় নিশ্চিত করেছে : যখন কোনো ব্যক্তি, দল বা জাতি ইসলামকে ধ্বংসের পায়তারা করবে, তখন তাদের সব চেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে। কারণ, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যা তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন—এটা সেই কিতাব যা তিনি সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। এজন্য দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তারা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে যে, তারা দুনিয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এবং আখেরাতে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

৬। আরব উপত্যকা বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আরব উপত্যকায় শান্তি ও স্থায়িত্ব ফিরে এসেছিল। স্বাভাবিকভাবেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জনগণ ও দেশকে পরিচালনা করার দিকে অধিক মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান।

তিনি এ সুযোগে মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন ঠিক একইভাবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় করেছিলেন। নিচে বিভিন্ন প্রদেশ ও গভর্নরদের নাম দেয়া হলো :

- ১। মক্কা : আব্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ২। তায়েফ : উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৩। সানআ : মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৪। হাযারা মাউত : য়ায়েদ ইবনে লুবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৫। খাওলান : ইআয়াল্লা ইবনে উমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৬। যুবাইদ এবং রাফা' : আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু (তিনি উভয়টির গভর্নর ছিলেন)
- ৭। জান্দুল ইয়েমেন : মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৮। নাযরান : জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৯। যারস : আব্দুল্লাহ ইবনে সাওর রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ১০। বাহরাইন : আলা ইবনে হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ১১। ওমান : হুযাইফা গিলফানী রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ১২। ইয়ামামা : সালীত ইবনে কাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু

আবু বকর রা. এর বিজয়সমূহ, তার স্থলাভিষিক্ত
হিসেবে উমর রা.-কে নির্বাচন এবং
আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল মানুষের মতো মুসলমানদের জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সেটা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ এবং তার ইবাদত জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

আমি মানুষ এবং জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।^{১৭২}

মানব ও জিন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। এজন্য মুসলমানরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং সকলকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা উপরে বর্ণিত আয়াতে 'মানুষ' বলেছেন, 'মুসলমান' বলেননি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এক আল্লাহর ইবাদত করা ফরয। মহান আল্লাহর দিকে অন্যকে আহ্বান করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য।

মুসলমানদের জন্য অবশ্যই এ দায়িত্ব হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সত্যের ধারক-বাহক হিসেবে তারা অবশ্যই ইসলামের বার্তাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু সেখানে শুধু একটি সমস্যা ছিল : যখন মুসলমানগণ ইসলামী হুকুমতের বাইরে বহিঃবিশ্বে অমুসলমানদের কাছে ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হলো, তখন বিদেশি শাসকগোষ্ঠী, রাজা-বাদশারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং এসব বাধাকে অতিক্রম করা মুসলমানদের জন্য আরেকটি উদ্দেশ্য হয়ে যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সার্বিক লক্ষ্য

^{১৭২} সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬।

ছিল দুনিয়ার বুকে ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহর বাণীকে সবকিছুর উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে এসব বাধা, যা বহিঃবিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিঘ্ন তৈরি করছিল, দূর করতে সৈন্য প্রেরণে বাধ্য হয়ে পড়লেন। ইসলামের বিখ্যাত মনীষী ইবনে তাইমিয়া রহ. লেখেন, ‘শরীয়তে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ : আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ তা’আলার বাণীকে সমুচ্চ রাখার লক্ষ্যেই শরীয়ত জিহাদ করার অনুমতি দেয়। যে এই জিহাদকে অস্বীকার করবে, সব মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য হচ্ছে, তার সঙ্গেও যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়বে।’^{১৭৩}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসক, রাজা-বাদশার নিকট চিঠি পাঠিয়েছেন, তাদের ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে যতদূর সম্ভব সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন। তার সর্বশেষ অভিযান ছিল বিখ্যাত তাবুক অভিযান যা নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, তাদের জন্য তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দিতেন : হয় তারা ইসলাম কবুল করবে এবং অন্য সকল মুসলমানদের ভাই হয়ে যাবে, অথবা তারা তাদের নিজেদের কুফরের উপর থাকবে, তবে মুসলিমদের জিযিয়া কর প্রদান করবে, অথবা তারা প্রথম দুটি সুযোগকে অস্বীকার করে কেবল আরেকটি পথই খোলা রাখতে পারে, আর সেটা হলো তরবারির মাধ্যমে মুসলমান এবং তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ধারণ করা।^{১৭৪}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদেশের ভূখণ্ডে অভিযান প্রেরণের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময় সাহাবীদের যেসব বিজয়ের সুসংবাদ আগাম প্রদান করেছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেসব বিজয়

^{১৭৩} আস-সিয়াসাহ আস-শারিয়াহ, ইবনে তাইমিয়া (পৃ. ১৮)।

^{১৭৪} সাফাহাত মিন তারিখ লিবির আল-ইসলামী, আস-সাল্লাবী (পৃ. ১৬৮)।

তার খেলাফতকালে আশা করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদি ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

قَوِّلِي لَفِئَتِي بِيَدِهِ لِيُتِمَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الطَّعِينَةُ مِنَ
الْحِذْيَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جَوَارٍ أَحَدٍ وَلَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى
بْنِ هُرْمُزٍ

ঐ মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এ
দীনকে পরিপূর্ণ করবেন যতক্ষণ না একজন নারী হীরা থেকে
সফর করে কারও সাহায্য ছাড়াই নিরাপদে মক্কায় এসে কাবাঘর
তাওয়াফ করতে পারবে। তোমরা অবশ্যই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে
কিসরা ইবনে হরমুযের (পারস্যের সম্রাট) ধনভাণ্ডারের মালিক
হবে।

পাশ্চাত্যের ধর্মীয় পণ্ডিতরা প্রথম দিকের মুসলমানদের এ বিজয়ের ক্ষেত্রে
তাদের যে মহান উদ্দেশ্য ছিল—অন্য সকল মানুষের নিকট ইসলামের
বাণী প্রচার করা—এর বিরুদ্ধে কূটকৌশল অবলম্বন করেছে। মুসলমান
সেনাপতিদের নামে ভিত্তিহীন অপবাদ ছড়িয়েছে। আসল সত্য হচ্ছে,
মুসলমানদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে সারাবিশ্বের মানুষের
নিকট পৌঁছে দেয়া। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে স্বৈরশাসক থেকে
মুক্তি দেয়া।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ
তা'আলা মুসলমানদের শক্তি, সামর্থ্য এবং বিজয় দান করবেন। সাধারণ
মুসলমান সৈন্যগণ এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু—সকলেই
সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ বিজয়ের ওয়াদাকে পরিপূর্ণ
করবেন। কুরআন মাজীদে নিচের আয়াতে এই ওয়াদার কথা বর্ণিত
হয়েছে :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ
لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ①

তিনিই তার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।^{১৭৫}

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ﴿٦١﴾

আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।^{১৭৬}

মূলত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই ইসলামের বড় ধরনের বিজয় শুরু হয়েছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এবং অন্যান্য বিজয় বাকি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিল, এসব যুদ্ধ ও অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হবে।

^{১৭৫} সূরা আস-সফ, ৬১:৯।

^{১৭৬} সূরা আল-গাফির, ৪০:৫১।

প্রথম অধ্যায়

ইরাক বিজয়

প্রথম। আবু বকর রা. কর্তৃক ইরাক বিজয়ের পথ সূচনা

মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পুরো আরব উপত্যকায় শান্তির সুবাতাস কেবল বইতে শুরু করেছে। এর মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদেশি ভূখণ্ডে অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করলেন। মূলত এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই প্রথম হাতে নিয়েছিলেন। ইরাক অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-টি বাহিনী প্রেরণ করেন:

১। প্রথম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু; ঐ সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামাতে অবস্থান করছিলেন, কেবলই মুসাইলামা কাস্জাবের বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট চিঠি প্রেরণ করে তাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ইরাক আক্রমণ করতে আদেশ দেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠিতে বলেন, ‘ইরাক অভিযুখে রওনা হও। সেখানকার সমুদ্র তীরবর্তী শহর উবুল্লা দিয়ে আক্রমণ সূচনা কর।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আরও নির্দেশ দেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে তাদের অন্তর জয় করার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান জানাতে হবে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তো ভালো। আর যদি না মানে তাহলে জিযিয়া কর দিতে বলবে। কিন্তু যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, এই অভিযানে সাথে যাওয়ার জন্য কাউকে যেন তিনি বাধ্য না করেন। আর যে একবার মুরতাদ হয়েছে তাকেও যেন

না নেন, যদিও সে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসে থাকে। সবশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা অতিক্রমকালে লোকজনকে ইরাক অভিযানে যোগদানের আহ্বান জানাতে বলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ প্রেরণ করার পরই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যার্থে সৈন্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।

২। দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইয়ায ইবনে গানাম রাযিয়াল্লাহু আনহু। হিয়ায এবং নাবাজ এর মধ্যবর্তী কোথাও ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু অবস্থান করছিলেন। মক্কা থেকে বসরার অর্ধেক দূরত্বে নাবায একটি ছোট শহর। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সময় ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পত্রের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব দিকে মাসিখ এলাকা দিয়ে ইরাক আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দেন। মাসিখ হলো শাম ও ইরাক সীমান্তে একটি এলাকা। এ পত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন, ‘মাসিখ পৌছে ঐখান থেকেই আক্রমণ সূচনা করবে। তারপর উঁচু এলাকা দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবে এবং খালিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে।’ তারপর আরও লেখেন, ‘যদি কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত আসতে চায় (আরব অথবা ইরাক অভিযান থেকে অব্যাহতি চায়), তাহলে তাকে অনুমতি দেবে। এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করবে না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাকে অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। আর যদি কেউ ফিরে থাকতে চায়, সেটারও অনুমতি দেবে।’^{১৭৭}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি বার্তা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে লেখে পাঠান, ‘তোমাদের মধ্যে যে প্রথম হীরায় পৌছবে, হীরার যুদ্ধে সে-ই সেনাপতি থাকবে (উভয় বাহিনীর নেতা)।’ পত্রের পরবর্তী অংশ হলো, ‘যখন তোমরা একসাথে হীরায় মিলিত হবে, পারস্যের দুর্গবেষ্টিত এলাকা বিজয় করার পর এবং পশ্চাৎ

^{১৭৭} আল-ফান আল-আসকারি আল-ইসলামী, ড. ইয়াসীন সূর্যাদ (পৃ. ৮৩); আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৬২)।

থেকে আক্রমণের স্বীকার না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তোমাদের একজন মুসলিম বাহিনীর রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং আরেকজন আল্লাহর শত্রুদের আক্রমণ করবে; তাদের কেন্দ্রীয় ও সম্মানিত জায়গায় আঘাত কর : আল-মাদাইন।^{১৭৮}

ইরাক অভিযানে তৃতীয় আরেকটি বাহিনী ছিল। এই বাহিনীকে আগেই মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ দিকে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খলীফার নিকট তাকে ইরাক অভিযানে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি খলীফাকে বলেন, ‘আমাকে আমার স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করুন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করলেন।

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে গমন করেন এবং পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে, পারসিকদের পরাজিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য প্রয়োজন। তখন তিনি খলীফার নিকট অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য তার ভাই মাসউদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় প্রেরণ করেন করেন। মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তিনি যা শুনলেন, তা হলো যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে ইরাকে প্রেরণ করেছি। তোমার লোকজনসহ তাকে অভ্যর্থনা জানাও। তারপর তাকে সাহায্য কর, তার হাতকে প্রসারিত কর এবং তাকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা কর। তার কোনো আদেশকে অমান্য করো না এবং তার কোনো মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না। কারণ, তিনি হচ্ছেন এসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কথা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবেন।^{১৭৯}

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি প্রেরিত চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আরও বলেন, ‘যতক্ষণ সে তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করবে, সে-ই হবে তোমাদের আমীর; আর যদি সে তোমাদের ত্যাগ করে যায়, তাহলে তুমি তোমার পূর্বের দায়িত্ব বুঝে নেবে।’

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিল মাযউর ইবনে আদি। তিনি মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি ছাড়াই সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। খলীফার নিকট প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন, ‘আমি বনু ইযল গোত্রের সদস্য। এ গোত্রের লোকেরা বাহনের উপর দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ (আমরা মূলত যোদ্ধা)। আমরা প্রত্যাশে শত্রুকে আক্রমণ করার অভিভূত। আমার সঙ্গে আমার গোত্রের আরও লোক রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তিই অন্য গোত্রের একশ জনের চেয়ে (যুদ্ধক্ষেত্রে) বেশি দায়ি। আমি ঐ এলাকা খুব ভালোভাবেই চিনি (যে এলাকায় অভিযান পরিচালিত হচ্ছে); আমি যুদ্ধকৌশলেও পারদর্শী; এবং আমি রণক্ষেত্রের অলি-গলি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। সুতরাং আমাকে সেনাবাহিনীর নেতা হিসেবে মনোনয়ন দান করুন।’

যখন মাযউর ইবনে আদী সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন, তখন মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের দায়িত্ব হিসেবে মূল ঘটনা খলীফাকে অবহিত করার প্রয়োজন মনে করলেন। সুতরাং মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুও খলীফার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। এ চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফাকে আমার স্বগোষ্ঠীয় একজনের ব্যাপারে জানাচ্ছি যে, তার নাম মাযউর ইবনে আদী। সে ইযিল বংশের একজন সদস্য। তার বংশের খুব কম লোকই তার সঙ্গে

রয়েছে। সে প্রকাশ্যে আমার সাথে বৈরী আচরণ করেছে এবং আমার বিরোধিতা করেছে। আমি তার ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করছি যেন আপনি এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দু-টি পত্রই এসে পৌঁছেছে। তাকে এখন এ বিষয়ে জবাব দিতে হবে। তবে তাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি ফায়সালা করতে হবে যেন তিনি মাযউর এবং মুসান্না— দু’জনেরই সেবা থেকে উপকৃত হতে পারেন। দু-জনই অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি কাউকেই কষ্ট দিতে চান না এবং এর ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের সামগ্রিক লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া যাবে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাযউর ইবনে আদীর চিঠির প্রতিউত্তরে লেখেন, ‘আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যা লেখেছ, তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। তুমি যেমন বলেছ, সত্যিকার অর্থে তুমি তেমনই। আর তোমার গোত্রও বরকতময় এবং ভালো। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনীতে তোমার যোগ দেয়া উচিত। ইরাকে যে কয়দিন খালিদ অবস্থান করে, তুমি তার সঙ্গে থাক। আর যখন সে ইরাক ত্যাগ করে যায়, তখন তুমিও তার সাথে চলে যাবে।’

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠির জবাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন, ‘তোমার বাহিনীর ইযিল গোত্রের সদস্য আমার নিকট চিঠি দিয়েছে। সে অনেকগুলো বিষয়ে জানতে চেয়েছে। আমি তার চিঠির জবাবে তাকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনীতে যোগদান করতে বলেছি (তার নেতৃত্বে সে যুদ্ধে শরীক হবে) যতক্ষণ না আমি উদ্ধৃত পরিস্থিতি সাপেক্ষে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিই। এ চিঠিতে আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি ইরাকেই থাকবে যতক্ষণ না খালিদ ইরাক ত্যাগ করে। খালিদ চলে গেলে তুমি তোমার জায়গায় অবস্থান করবে। বস্তুত তুমি অনেক বেশি বরকতময় এবং তোমার গুণাবলি সত্যিই প্রশংসনীয়।’

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ

১। রযব মাসে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে গমন করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি রযব মাসে ইরাকে যাননি, মহররম মাসে গিয়েছিলেন।

তার এ গমনের মাস নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও তার ইরাক ত্যাগের মাস নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। সব সূত্রমতে তিনি ১২ হিজরীতে ইরাক ত্যাগ করেছিলেন।

২। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থে একজন প্রচণ্ড মেধাবী সমরবিদ ছিলেন। তার খেলাফতকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে দ্রুত একতরফা বিজয়ের কারণে অনেকে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান। ইরাক অভিযান পরিকল্পনায়ও তিনি অসম্ভব মেধার স্বাক্ষর রাখেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন এক যুগে বসবাস করতেন যখন আধুনিক সভ্যতার মতো পানি সরবরাহ, ইলেকট্রিসিটি, গান পাউডার, কম্পিউটার এবং অন্যান্য প্রযুক্তির কিছুই ছিল না। মাত্র একশ বছর আগে থেকে মানুষ এসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তারপরেও সমর পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ দেখে মনে হয়, তিনি আধুনিককালের কোনো কমান্ড-সেন্টার থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন যা কিনা আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপ দ্বারা সজ্জিত। মদীনায় বসে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কোন পথে ইরাকে প্রবেশ করতে হবে, তাও বলে দিচ্ছেন। এটা ছিল ইরাকে প্রবেশের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ, যেখানে শত্রুদের দু-টি ফণ্টে যুদ্ধরত অবস্থায় রাখা সম্ভব ছিল। আবার একইসাথে এটা দু-টি মুসলিম বাহিনীকে ইরাকের কেন্দ্রস্থলে মিলিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিল। ফলে মুসলমান সৈন্যরা একসঙ্গে একটি দল হিসেবে শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার ক্ষেত্র তৈরি করে।

আবার মুসলিম সেনাবাহিনীর দু-টি দলকে হীরায় একত্রিত হতে আদেশ দিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের ভৌগলিক অবস্থার উপর তার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সামরিক দিক দিয়ে হীরা ইরাকের সবচেয়ে কৌশলগত অবস্থান, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। এ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়া মানে বিজয় অবধারিত হয়ে যাওয়া। হীরা শহর কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল। প্রথমত, এটা ইরাকের বড় বড় শহরগুলোর নিকটেই অবস্থিত ছিল; কুফার বাইরে তিন মাইল দূরে। হীরা থেকে নাযফ যেতে একজন ঘোঁরসওয়ারের মাত্র এক ঘণ্টা লাগত। দ্বিতীয়ত, যদি কেউ ১৭ শতকের ইরাকের ম্যাপ দেখেন, হীরায় এসে সব

শহরের রাস্তা মিলিত হয়েছে এবং এখান থেকেই ইরাকের যে কোনো দিকেই যাওয়া যায়। পূর্ব দিকে ইউফ্রেটিস নদী পথে এটা মদীনা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল; উত্তর দিকে স্থলপথে হীত শহরের সঙ্গে সংযুক্ত; আশ্বার বিজের মাধ্যমে এটা আশ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত; পশ্চিম দিকে স্থলপথে শামের সঙ্গে সংযুক্ত (সিরিয়া ও আশেপাশের এলাকাসমূহ)। একইভাবে হীরা বসরার উবুল্লাহ শহরের সঙ্গে, কাসরা, সাওয়াদ এবং নুমানিয়াহর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে যে কেউ হীরার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারত, তাহলে সে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সকল এলাকাই দখলে নিতে পারত। চতুর্থত, হীরার অবস্থান ছিল মাদাইন শহর থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী যা ছিল পারস্যের রাজধানী। পারস্যের অধিবাসীরাও হীরার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিল। পরবর্তীতে এর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্য সামরিক কৌশলগত অবস্থানের পাশাপাশি হীরা শামে রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সূচনা করার মোক্ষম জায়গা হিসেবেও কাজ করে।

৩। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুভব করেছিলেন যে, ইরাক অভিযানে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সৈনিকদের অংশগ্রহণ করা জরুরি। এজন্য তিনি তার দুই সেনাপতিকে কারও উপর যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু, তাদের অধীনস্থ কেউ যদি মদীনায় ফিরে যাওয়ার আশ্রয় প্রকাশ করে, তাহলে তাকে সে স্বাধীনতাও দিতে বলেছেন।

৪। যুদ্ধের প্রবল আশ্রয়ের কারণেই নয়, বরং তার মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষের কারণেও ইরাক বিজয়ে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন অরণীয় মুসলিম হিরো। তার লোকজনের সহায়তায় তিনি ইরাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সর্বাঙ্গিক আক্রমণ করার পরিকল্পনার অনেক আগ থেকেই অভিযান পরিচালনা করে আসছিলেন। তিনি যখন মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাফল্য দেখলেন, তখন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডে খুশি প্রকাশ করেছেন; পরবর্তীতে তিনি মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করেন। কিন্তু যখন তিনি পারস্য সাম্রাজ্যকে পুরোপুরিভাবে

আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন, মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নয়। এজন্য তিনি মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীতে যোগ দিতে বলেন এবং তাকে মেনে চলার হুকুম দেন।

মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে যদি অহংকার কিংবা দম্ভ থাকত, তাহলে এ ঘটনায় তিনি নিশ্চিতভাবেই কষ্ট পেতেন। কারণ, তিনি তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে অন্য অনেকের চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ইরাক বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তার বিনয় ও সহনশীলতার গুণে খলীফার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্মুদ্রা বিচলিত হননি। এজন্য তিনি দেরি না করে দ্রুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশকে শিরোধার্য করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে যোগ দিতে সক্রিয় হয়েছেন।

৫। যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেননি, বরং নিষ্ঠাবান মুসলমান সৈন্যদের সমন্বয়েই কেবল তার বাহিনী সাজাতে চেয়েছেন। এজন্য দু-ধরনের সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য তিনি তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন : প্রথমে এসব সৈন্য যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, এসব সৈন্য যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি, তবে দীনের উপর অটল-অবিচল ছিলেন। এতে তৃতীয় আরেক শ্রেণিকে বাদ দেয়া হয়েছে, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে দীনের পথে ফিরে এসেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর প্রকাশ্যে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেন: 'এই অভিযানে যে একবার মুরতাদ হয়েছে তাকে নেওয়া যাবে না, কমপক্ষে আমি যতক্ষণ না এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি।' এ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে একবার যারা মুরতাদ হবে গিয়েছিলেন এবং পরে ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন, তারা প্রথম দিকে বিদেশের কোনো ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানে শরীক হননি। পরবর্তীতে যখন তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তখন তাদের এসব অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে (এই বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন : যারা একবার মুরতাদ হয়ে আবার ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাদের বিদেশি ভূখণ্ডে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি না দিয়ে তাদের মনোকষ্টের কারণ হওয়া; অথবা যাদের বিশৃঙ্খলতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাদের অভিযানে প্রেরণ করে অভিযানের মূল লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এ অবিশৃঙ্খতার মূল কারণ ছিল, তারা মাত্র কয়েক মাস, কয়েক সপ্তাহ এবং এমনকি মাত্র কয়েক দিন আগে মুরতাদ থেকে তাওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম উপায় অবলম্বন করেছেন। বস্তুত বিদেশি ভূখণ্ড জয় করার ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে বিশৃঙ্খল, আন্তরিক এবং দৃঢ় মনোবলের মুসলিম সৈন্যের অপরিহার্যতা ছিল। একবার মুরতাদ হওয়ার মানসিকতা প্রমাণ করে যে, তাদের লক্ষ্য ছিল জাগতিকভাবে লাভবান হওয়া; তাদের কেউ কেউ ক্ষমতালোভী ছিল; অন্যরা সম্পদ এবং আরও অনেকে পার্থিব সম্মানের আশাবাদী ছিল। অথচ ইরাক অভিযানে এমনসব মুসলমান সৈন্যের প্রয়োজন ছিল, যারা কিনা জাগতিক কোনো কিছুর জন্যই যুদ্ধ করবে না, বরং সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার তীব্র আশা নিয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরীক হবে।

৬। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরিত পত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন, ‘পারস্যের জনসাধারণসহ যারা সেখানে বসবাস করে, তাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে তাদের অন্তর জয় করার চেষ্টা করতে হবে।’ এ উক্তি সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর আচরণ প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের বিদেশি ভূখণ্ডে অভিযানের পেছনে সেখানকার অধিবাসীদের অপদস্থ করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাদের আল্লাহর উপর অবিশ্বাস ও স্বৈরশাসকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করাই লক্ষ্য ছিল। যতদিন পর্যন্ত ঔদ্ধত্যকারী স্বৈরশাসকরা ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমানরা পারসিক কিংবা রোমানদের মধ্যে দ্বীনের কথা প্রচার-প্রসার করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং এসব সরকারকে শক্তি প্রয়োগ করে উৎখাতের প্রয়োজন ছিল। বিদেশি জনগণের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো বৈরীতা ছিল না; বস্তুত যখন কোনো দল ইসলামগ্রহণ করত, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই ইয়েমেন, মক্কা, এমনকি মদীনার মুসলমানদের মতোই সমপর্যায়ের বলে গণ্য হতো। তারাও অন্যান্য মুসলমানের মতো একই অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করত।

যদি কেউ ইসলামগ্রহণ করতে অস্বীকার করত, তাকে এক্ষেত্রে বাধ্য করা হত না। বরং মুসলমানদের জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে সে তার নিজের ধর্মের উপর থাকার স্বাধীনতা লাভ করত। আবার এ কর তাদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হতো। এ করের পরিমাণও খুব বেশি ছিল না। আর এ করের বিনিময়ে তারা তাদের ধর্মে বহাল থাকতে পারত, মুসলমানদের ভূমিতে বসবাস করার সুযোগ পেত এবং মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করত। অমুসলিমরা যখন প্রথম দু-টি শর্তের উভয়টি অস্বীকার করত—ইসলামগ্রহণ অথবা জিযিয়া কর প্রদান—তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল। আর এ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আল্লাহর বাণীকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা।^{১৮০}

সেনাপতিদের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সময়ই সাধারণভাবে বিদেশি সকল জনগণ এবং বিশেষভাবে কৃষকদের প্রতি কোমল ব্যবহার এবং তাদের অন্তর জয় করার ব্যাপারে তাগিদ দিতেন। মুসলমানরা বিদেশি ভূখণ্ডকে আবাদ করতে চাইতেন। সেখানকার মানুষজন বা তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করতেন না। আর বিদেশের ভূখণ্ডে সবচেয়ে দামি সম্পদ—খাবার—যার কাছে ছিল, তারা হচ্ছে কৃষক; ফলে তাদের অন্তর জয় করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যখন সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে, তখন যেন ফার্ম, মাঠ কিংবা বাগানে কাজের লোকের অভাব পড়ার কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন না হয়।^{১৮১}

৭। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা পরিমাপের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক অভিযুখে যাত্রা করে তাদের সাহায্যার্থে মদীনা থেকে আরও সৈন্য প্রেরণের জন্য খলীফার নিকট আবেদন জানান। এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য প্রেরণের পরিবর্তে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাত্র একজনকে প্রেরণ করেন : কা'কা ইবনে আমর তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু। কেউ একজন খলীফাকে একদল সৈন্য প্রেরণ না করে

^{১৮০} আভ-তারিখ আল-ইসলামী (৯/১৩০)।

^{১৮১} তারিখ আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম (পৃ. ৩৪২)।

কেবল একজন সৈন্য প্রেরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘কা’কা যে বাহিনীতে থাকবে, আল্লাহর ফ্যালে সে বাহিনী কখনও পরাজিত হবে না।’ পরবর্তীতে ঘটনাসমূহ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কা’কা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ়তা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথাকে সত্যে পরিণত করে এবং মানুষের চরিত্র, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তার অসম্ভব মেধার পরিচয় ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয়: খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর ইরাক অভিযান

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দুই হাজার মুজাহিদসহ ইরাক অভিযানে রওনা হন। এসব মুজাহিদদের সবাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাবীআ গোত্র থেকে আরও আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। সফরে থাকা অবস্থায় ইরাকে অবস্থানরত তিনজন মুসলিম সেনাপতির নিকট তিনি পত্র প্রেরণ করেন। তারা হলেন : মাযউর ইবনে আদী আল-ইযলি রাযিয়াল্লাহু আনহু, সালমাহ ইবনে আল-কীন আল-তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হারমালাহ ইবনে মুরবাতাহ তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা প্রত্যেকেই চিঠির জবাবে তার জন্য অপেক্ষারত আছেন বলে জানান এবং তারা সবাই এক ইউনিটে পরিণত হয়েছেন। তাদের সঙ্গে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী এসে যোগ দিয়েছিল। তাতে সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা আট হাজারে উপনীত হয়। ফলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমগ্র বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো হাজার। এ বিষয়ে সবাই একমত হন যে, উপরে উল্লেখিত সব সৈন্য উবুল্লাহ নামক স্থানে এসে একত্রিত হবে।

ইরাকে পৌঁছার আগে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হুরমুযের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। হুরমুয ছিল পারস্যের একটি ব্যাটালিয়ানের সেনাপতি এবং সে উবুল্লাহতে অবস্থান করছিল। এটা ছিল একটি সতর্কবার্তা যাতে লেখা ছিল : ‘তুমি ইসলামগ্রহণ কর, আমরা তোমাদের দেশে কোনো প্রকারের অশান্তি ঘটাব না। অন্যথায় জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার কর। এতদুভয়ের কোনোটিতেই সম্মত না হলে তোমাকে

চরম পরিতাপ করতে হবে। কিন্তু তখন পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না। তখন কাউকে দোষারোপ করতে পারবে না। কেননা, আমার সঙ্গের মুজাহিদগণ মৃত্যুর জন্য ততটাই আগ্রহান্বিত যতটা তোমরা বেঁচে থাকার জন্য আগ্রহশীল।' নিশ্চিতভাবেই এ চিঠি ছিল মানসিক যুদ্ধের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যাতে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। সর্বোপরি, ইতিহাসে এমন বাহিনী বিরল যারা শত্রুর মোকাবেলায় জীবন থেকে মৃত্যুকেই বেশি ভালোবাসে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে নিজ বাহিনীকে তিনটি ব্যাটালিয়ানে ভাগ করেন। প্রত্যেককেই তিনটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। প্রথম ব্যাটালিয়ানের নেতৃত্বে ছিলেন মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু; দ্বিতীয়টির আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তৃতীয়টির নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে। এই তিন বাহিনীকে 'হাযর' নামক স্থানে মিলিত হওয়ার জন্য বলা হয়। 'হাযর' মক্কা থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

১। যাত আস-সালাসিল অভিযান

হুরমুয কোনোভাবে তার শত্রুর পরিকল্পনা জেনে গেল। সে উভয় খবরই পেল যে, খালিদের বাহিনী কাছাকাছি চলে এসেছে এবং সকল মুসলিম সৈন্য হাযর-এ মিলিত হতে সম্মত হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে সে দ্রুত তার দু-জন কমান্ডার, কুব্বাদ এবং আনুশজানকে শত্রু আসার আগেই হাযরে প্রেরণ করে। এটা ছিল খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হুরমুযের মধ্যে বুদ্ধির খেলা। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারলেন যে, হুরমুযের বাহিনী ইতিমধ্যে হাযরে এসে পৌঁছেছে, তখন তিনি তার গতিপথ পরিবর্তন করে কাদিম এলাকার দিকে রওনা হলেন। এখানেও হুরমুয এক পা আগে বেড়ে যায়। মুসলমানরা আসার আগেই হুরমুযের বাহিনী কাদিমে অবস্থান নেয়।

কাদিমে একমাত্র পানির কূপের পাশে হুরমুয বাহিনী তাঁবু গাড়ে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কাদিমে পৌঁছে সবচেয়ে ভালো জায়গায় তাঁবু গাড়লেন, তবে সেখানে পানি ছিল না। তিনি পরিকারভাবে বেকায়দায়

পড়ে গেলেন। তার একটি উপায় বাকি ছিল এবং সেটা হলো, পানির কুপটি আয়ত্বে আনার জন্য চেষ্টা করা। এজন্য তিনি সৈন্যদের বললেন, ‘তোমাদের বাহন থেকে ভারী বোঝাসমূহ নামিয়ে রাখ এবং তাদের সঙ্গে পানির জন্য লড়াই কর...বস্তুত আল্লাহ তা’আলা দু-দলের মধ্যে অধিক ধৈর্যশীলদের পক্ষে থাকেন।’

মুসলমানরা বাহন থেকে ভারী বোঝাসমূহ নামিয়ে রাখল। ঘোরসওয়াররা দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়। পদাতিক বাহিনী শত্রু অভিযুখে অগ্রসর হতে থাকে। এর মধ্যেই আল্লাহ তা’আলা একটি মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। ফলে দু-টি পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। মুসলমানগণ সবাই বৃষ্টির পানি পান করলেন এবং এভাবে তারা শত্রুকে মোকাবেলা করার শক্তি পেয়ে নতুনভাবে উজ্জীবিত হলেন। এই যে ঘটনা—একটি মেঘ আবির্ভূত হওয়া এবং সেখান থেকে বৃষ্টি হওয়া—এটা এ রকম হাজার ঘটনার একটি যা ‘আল্লাহ ঈমানদের সঙ্গে থাকেন’ এর ব্যাখ্যা।

মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হুরমুয, মহা ধুরন্ধর যে কিনা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। আসলে তার মনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে লড়াই করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। সে কৌশলে তাকে একটি ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। বিশ্বাঘাতকতার মাধ্যমে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে সে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেয়ার চক্রান্ত করেছিল।

উভয় দলের সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় হুরমুয এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পরস্পর সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হলে একে অন্যের উপর আক্রমণ আরম্ভ করলেন। তীব্র আক্রমণে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হুরমুযকে অপদস্থ অবস্থায় আটকে ফেলেন। হুরমুযের দুরভিসন্ধি মোতাবেক হুরমুযের সৈন্যরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঘিরে ফেলে। শত্রুসেনারা ঘিরে ফেললেও তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার কাজ থেকে ফেরাতে পারেনি—তিনি তরবারির এক আঘাতে হুরমুযকে হত্যা করে ফেলেন।

এসময় কা'কা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি আরও কিছু ঘোরসওয়ার নিয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। যখনই হুরমুযের সৈন্যরা দৃন্দযুদ্ধে বিঘ্ন ঘটাতে আসে, তখন তিনিও সাথীদের নিয়ে তাদের উপর বাঁপিয়ে পড়েন। তারপরই পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কা'কা এবং তার সঙ্গীরা হুরমুযের গার্ডদের শায়েস্তা করেন; খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হুরমুযকে হত্যা করেন এবং মুসলমানরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তারা জায়গায় দাঁড়িয়েও থাকেনি, পশ্চাদপসরণও করেননি, বরং শত্রুদের সারি ভেদ করে একের পর এক শত্রু নিধন করতে থাকেন। মুসলমানরা যে গতিতে যুদ্ধ করতে থাকে, তা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী আক্রমণ যাকে বাধা দেয়া ছিল কঠিন। ফলশ্রুতিতে অল্প সময়েই মুসলমানদের বিজয় হয়।

এদিন বিজয়ের শুরু হয়েছিল কা'কা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে যার সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'কা'কা যে বাহিনীতে থাকবে, আল্লাহর ফযলে সে বাহিনী কখনও পরাজিত হবে না।' এ যুদ্ধে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি কেবল হুরমুযকেই হত্যা করেননি, বরং কা'কা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতায় হুরমুযের গার্ডদেরও হত্যা করেন। পারস্যার সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে একে অন্যের সঙ্গে শিকল দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু মুসলমানদের মতো সাহসী ও শক্তিশালী সৈন্যদের সঙ্গে এ কৌশল কোনো কাজে আসেনি। শেকলকে আরবীতে 'সালাসিল' বলা হয়। আর পারস্যরা শেকল ব্যবহার করে যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল বিধায় এ যুদ্ধকে যাত আস-সালাসিল অভিযান বলা হয়।^{১৮২}

এ যুদ্ধে মুসলমানরা এত বেশি গনীমতের মাল লাভ করে যা বহন করার জন্য একশ উটের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধশেষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ছোট ইউনিটকে একটি দুর্গ বিজয় করার জন্য প্রেরণ করেন। হীরার চারিদিকে এই দুর্গসমূহে শত্রুসেনারা আশ্রয়

^{১৮২} আভ-তারিখ আল-ইসলামী (৯/১৩৩); আভ-তারিখ আভ-তাবারী (৪/১৬৫)।

নিয়েছিল। এসব দুর্গসমূহ দখল করার পর মুসলমানরা আরও গনীমতের লাভ করে।

মুসলমানগণ ঐদিন যত গনীমতের মাল লাভ করেছিলেন, তার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশনা ছিল পরিকার : খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন পারস্যের অধিবাসীদের প্রতি কোমল ব্যবহার করেন, বিশেষ করে কৃষকদের প্রতি। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন, বিশেষভাবে এসব কৃষকরা যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জমি ও ফসল অক্ষত রাখেন। তারপর তিনি তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন, তাদের কী পরিমাণ শস্যের যাকাত দিতে হবে, তা বলে দিয়েছেন। আর যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেনি, তাদের প্রদেয় জিযিয়া করার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, তারা ইতিপূর্বে পারস্যের বাদশাকে যে কর প্রদান করত, জিযিয়া করার পরিমাণ তা থেকে অনেক কম ছিল। অধিকন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের অধিবাসীদের মধ্যে কাউকে তার বাড়ি-ঘর, জমিজমা ও ধনদৌলত থেকে উচ্ছেদ করেননি। এভাবে তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা দান করেছে, তাদের মূল্যায়ন করেছে।

গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। বাকিটুকু মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মদীনায প্রেরিত গনীমতের মালের মধ্যে হুরমুখের দামি টুপিও ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু টুপিটি গ্রহণ করে তা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসকিতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেন। সম্ভবত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে জানতেন না যে, এ টুপিটির দাম ছিল এক লক্ষ দিনার অথবা দিরহাম (যাই হোক, অনেক দামি)। এটাতে দামি মণিমুক্তার কারুকাজ করা ছিল। কিন্তু এজন্য টুপিটির দাম এত বেশি হয়নি। পারস্যে টুপির দাম ব্যক্তির উপর নির্ভর করত। যে এ টুপি পরিধান করত, তার বীরত্ব ও সম্মানের উপর টুপির দামও বেশি হত। পারস্যের উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের টুপির মূল্য সাধারণত এক লক্ষ দিরহাম

বা দিনার ছিল। যেহেতু হুরমুযও পারস্যের উচ্চ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এজন্য তার টুপির দামও এই পরিমাণ পাওয়া যায়।

২। মাযার বা সানীর যুদ্ধ

যাত আস-সালাসিল যুদ্ধের আগে হুরমুয মারাত্মক বোকামি করে বসে; এ বোকামির কারণে তার দল পরাজিত হয় এবং নিজেও প্রাণ বিসর্জন দেয়। শত্রু সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা রাখা যে কোনো সেনাবাহিনীর কমান্ডারের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভুল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে হুরমুয পারস্যের সম্রাট কিসরার নিকট পত্র প্রেরণ করে। এ পত্রে সে আরও সৈন্য চেয়ে অনুরোধ জানায়। এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কিসরা কারানের নেতৃত্বে সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু শত্রুকে সহজেই পরাজিত করবে ভেবে সে আর কারানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেনি, বরং খালিদের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ফলশ্রুতিতে তার বাহিনী এক অপমানজনক পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হয়, সে নিজে তার জীবন হারায় এবং তার বাহিনীর যেসব সৈন্য প্রাণে রক্ষা পায়, তারা দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

পলায়নপর সৈন্যরা কারানের বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং কারানের কাছে হুরমুয বাহিনীর বিরুদ্ধে যা হয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরে। প্রচণ্ড রাগ, স্বদেশপ্ৰীতি এবং সমুচিত প্রতিশোধ নেশায় কারানের সৈন্যরা পাগলপারা হয়ে যায়। তারা সরাসরি শত্রুর মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে চায় এবং যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নেশায় মেতে ওঠে। তারা মাযার নামক স্থানে তাঁবু গাড়ে (এজন্য এ যুদ্ধের নাম মাযার যুদ্ধ)।

ইতিপূর্বে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ভাই মুআন্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পলায়নরত শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করে। দু-ভাই মিলে পশ্চিমধ্যে প্রাপ্ত দুর্গসমূহ বিজয় করতে সক্ষম হন, কিন্তু সহসাই তারা কারানের বিশাল বাহিনী আগমনের সংবাদ পান। তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ সংবাদ প্রেরণ করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সংবাদ পেয়ে তা খলীফাকে অবহিত করেন যে, তিনি আগত শত্রুর মোকাবেলা করতে চান।

শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা অনবরত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে থাকেন। প্রত্যেক সদস্যই যে কোনো অতর্কিত হামলা রুখে দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। দুই বিপরীত সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত মাঝারে মুখোমুখি হয়। যখন দুই বাহিনীর সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন কারান অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হলে মা'কিল ইবনে আ'মাস ইবনে নাব্বাস প্রথমে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি কারানের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাকে হত্যা করেন।

কারান তার বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে কুব্বাজকে নিযুক্ত করেন এবং বাম বাহুর নেতৃত্বে রাখেন আনুসুজানকে। তারা ঐ একই কমান্ডার যারা যাত আস-সালাসিল যুদ্ধে হুরমুযের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল। তারা মুসলমানদের হাতে ধরা পরার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রারম্ভিক পর্যায়ে কুব্বাজ এবং আনুসুজান মুসলমানদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। কুব্বাজ দ্রুত আদী ইবনে হাতিম আত-তাই রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নিহত হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু-দলের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। কিন্তু পারস্য সৈন্যরা অপরপক্ষের সাহসিকতা ও দক্ষতার সামনে টিকতে পারেনি। তাদের জেনারেল নিহত হলে তারা আশাহত হবে পড়ে এবং বাকিরা মুসলমানদের হাতে ধরা পরার আগেই নিকটস্থ নদীপথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাঝারে তাঁর গাড়েন। তিনি তার সৈন্যদের যারা যাকে হত্যা করেছিল, তার সব আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র মূল্য বিবেচনা না করেই দিয়ে দেন। তারপর তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করেন। এক-পঞ্চমাংশ তার সাহসী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং বাকি সব সম্পদ মদীনায়ে প্রেরণ করেন।

প্রথমে পারস্যের নেতারা মুসলিম বহিরাক্রমণকে খুব সীমিত বলে ধারণা করেছিল। তারা মনে করেছে, খালিদের বাহিনী বড় জোড় একটি ছিঁচকে বাহিনী, যারা জাতি হিসেবে খুবই অসভ্য। এটা খুবই সম্ভব যে, পারস্যের সৈন্যরা খালিদের বাহিনীকে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি; সর্বোপরি এটা এক বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুটিকয়েক বাহ্যিকভাবে দুর্বল সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল। বস্তুত অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসই তাদের শোচনীয় পরাজয়বরণ করতে বাধ্য করেছিল। হুরমুযের অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসের কারণেই সে মৃত্যুবরণ করেছে, এমনকি সে অতিরিক্ত সৈন্য আগমনের জন্য অপেক্ষাও করার প্রয়োজনবোধ করেনি। বরং সে তার সৈন্যসামন্তসহ খালিদের বাহিনীকে সহজেই পরাজিত করতে পারবে বলে ধারণা করেছিল।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং শত্রুকে দুর্বল প্রতিপন্ন করে পারসিকরা দু-টি শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়েছে। প্রথমে যাত আস-সালাসিল যুদ্ধে এবং পরে মায়ুরের যুদ্ধে। যখন কিসরা মায়ুরে তার বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেল, তখন সে বুঝতে পারল যে, ভয়ানক বিপদ আসন্ন যা তার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এ চিন্তা করে পারস্যাদিপতি আনদার যাগারের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। কোনো সুযোগ না নিয়ে এ বাহিনীর সাহায্যার্থে পশ্চাতে দ্বিতীয় আরেক বাহিনী পাঠাল যার নেতৃত্বে ছিল বাহমান জায়াওয়াহ।

আনদার যাগারের বাহিনী পারস্যের রাজধানী থেকে রওনা দিয়ে মাদাইন, কাসকার হয়ে ওয়ালজাহরে পৌঁছল। ঐদিকে বাহমান জায়াওয়াহ তার বাহিনী নিয়ে ভিন্নপথে অগ্রসর হলো। সে ধারণা করেছিল মুসলমান বাহিনীকে আনদার যাগারের বাহিনী আর তার বাহিনীর মধ্যে ফেলে পিষে ফেলবে। একজন দক্ষ সেনাপতি হিসেবে ওয়ালজাহরের দিকে যাত্রাপথে অনেক সাধারণ মানুষকে সৈন্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হলো।

আনদার যাগার নিজের বিশাল সৈন্যসামন্তকে কারও পক্ষে পরাজিত করা অসম্ভব মনে করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে মার্চ করা শুরু করল।

ঐ সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সানীতে অবস্থান করছিলেন যা বসরার নিকটবর্তী একটি এলাকা। তিনি যখন আনযার যাগারের বাহিনীর ওয়ালজাহতে অবস্থান এবং বিশাল শত্রুসংখ্যার ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তিনি তিন দিক থেকে শত্রুকে আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন যাতে বিশাল শত্রুবাহিনীকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা ছিল অবিশ্বাস্য। এ পদ্ধতিতে তিন দিক দিয়ে শত্রু বাহিনীকে অতর্কিত হামলা করে মুসলমানদের নিদেনপক্ষে যুদ্ধ করার সুযোগ তৈরি হয়ে এবং বিশাল শত্রুর প্রাচীরও ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে। পেছনের সৈন্যদের রক্ষায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সুওয়াইদ ইবনে মুকরিন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পশ্চাতে হুদাইর নামক স্থানে থাকার আদেশ দেন। তারপর তিনি বাকি সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে ওয়ালজাহর দিকে অগ্রসর হন।

অগ্রে দূত প্রেরণ করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, ওয়ালজাহর যুদ্ধক্ষেত্র বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং জমিনও সমান, সমতল। সুতরাং তার পরিকল্পনা বাস্তবে সঠিক প্রতীয়মান হয়। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তার বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। নিজে মূল দলকে সঙ্গে রাখেন। বাকি দু-টি দল শত্রুর পশ্চাৎ দিক থেকে এবং উভয় পার্শ্বদিক থেকে অতর্কিতে হামলা করবে।

যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যরা শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করতে থাকেন। এ সময় তার বাহিনীর বাকি দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি লুকিয়ে থাকে। সুযোগমতো তারা শত্রুর উপর অতর্কিতে বাঁপিয়ে পড়ে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা চমৎকার কাজ করে : শত্রুরা সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হয়। যুদ্ধের গতি মুসলমানদের পক্ষে চলে আসে এবং আনযার যাগার ও তার বাহিনী পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হয়। আনযার যাগারের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা শুরু করে। আর যারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়, তারা সবাই পিপাসায় মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করে।^{১৮৩}

^{১৮৩} আল-কামিল, ইবনে আসির (২/৫২); আবু বকর আস-সিদীক, খাদি আল-যিনানী (পৃ. ৪৮)।

বিজয়ের পর নিজের বক্তব্যে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের অনারব দেশের প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং আরব দেশের মমতা ত্যাগ করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তার সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তোমরা কি এখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের ভাণ্ডার দেখতে পাচ্ছ না? যদি আমাদের উপর আল্লাহর পথে জিহাদ ফরয না হতো এবং আমরা যদি কেবল দুনিয়ার সম্পদ আহরণ করতে চাইতাম, তাহলে এখানে থাকা আমাদের জন্য ভালো হতো এবং এদেশের নিয়ন্ত্রণ নেয়াও যথার্থ হতো...।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা যথেষ্ট অর্থবহ। একটি দিক হলো, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, প্রাক ইসলামিক যুগে আরবরা আখেরাতে কিছু পাওয়ার আশা করত না এবং দুনিয়াতেও খুব বেশি সফল ছিল না। তারা ছিল বহুধাবিভক্ত এবং পথভ্রষ্ট। তারপরেও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। আসলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন বলছেন, ‘আমরা আখেরাতের পথিক। আমাদের উদ্দেশ্য সর্বোত্তম। ঐ লক্ষ্য অর্জনে আমরা অন্যকে ইসলামের দিকে আহ্বান করি এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করি। যদি আমাদের সেই উদ্দেশ্য না থাকত—আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রাখা—এবং যদি আমাদের যুদ্ধ করার ধর্মীয় কোনো কারণ না থাকত, তাহলেও আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য এখানে যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত হত।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর বাণীকে সবকিছুর উপর সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্য থেকে দুনিয়ার প্রাপ্তিকে বড় মনে করেননি। বরং তিনি একটি ধারণাপ্রসূত পরিস্থিতি উপস্থাপন করে সৈন্যদের মনে বিদেশের ভূখণ্ডে অবস্থান এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন, ‘যদি আমরা ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে জাগতিক চাহিদায় যুদ্ধ করতাম, তাহলে কেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় কারণে যুদ্ধ করব না—আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য?’

আরেক বর্ণনায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালাজাহর যুদ্ধে এমন এক পারসিক সৈন্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন যে হাজার লোকের মোকাবেলা করার শক্তি রাখত। কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। তারপর যুদ্ধ সমাপ্ত হলে গনীমত পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ

সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং এক ভাগ খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। শত্রু যোদ্ধাদের সন্তান ও স্ত্রীদের বন্দী করেন এবং কৃষকদের জিযিয়ার বিনিময়ে স্বস্থানে বহাল রাখেন।^{১৮৪}

৪। আললীসের যুদ্ধ

একদল বিশ্বাসঘাতক খ্রিস্টান আরব ইরাকে গিয়ে পারসিক বাহিনীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের ওয়াদা করে। এই আরব খ্রিস্টানদের দলের নেতা ছিল আব্দুল-আসওয়াদ ইয়লী এবং অপরদিকে তার মিত্রপক্ষের পার্সিয়ান লোকটির নাম ছিল জাবান। বাহমান জাযাওয়াহ যে ইতিমধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, জাবানকে বিজ্ঞসুলভ উপদেশ দেন—যেন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগে থেকে যুদ্ধ শুরু না করে। মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণ করলেই কেবল লড়াই করবে।

খ্রিস্টান আরব সৈন্যদের কথা জানতে পেরে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের দিকে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি জানতেন না যে, পারস্য সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যৌথবাহিনী গঠন করেছে। যখন মুসলমানরা দৃশ্যপটে এসে হাজির হয়, তখন জাবান মনে করে যে, সে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সে দ্রুত তার সৈন্যদের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে আদেশ দেয়। কিন্তু সৈন্যরা তার আদেশ অমান্য করে। তারা অহংকারবশে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার বাহিনীকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের সত্যিকার হুমকি হিসেবে আমলে নেয়নি। তারা জাবানের আদেশ পালন করার পরিবর্তে নিজেদের ক্যাম্পে বড় ধরনের ভোজসভার আয়োজন করতে মেতে উঠল।

অন্যদিকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে অপেক্ষা করার মানসিকতা ছিল না, অথবা শত্রুপক্ষকে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-ফুর্তিতে ব্যস্ত থাকার অবকাশ দিতেও চাননি। সুতরাং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ভোজ চলাকালে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করল। শীঘ্রই তারা বুঝতে পারল যে, তার এক অপরাজেয় বাহিনীর মোকাবেলা করছে; এটা

এত ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, পারস্যের সেনাপতিরা বাহমান জায়াওয়াহর নিকট থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের আশায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল।

পরিস্থিতি জটিল হলেও মুসলিম সৈন্যরা সাহসিকতা ও ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—যে কিনা একদিকে নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী ছিলেন, একদিকে দক্ষ সৈনিকও ছিলেন—আল্লাহর নিকট সাহায্যে প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে দুশমনদের উপর আমাদের বিজয় দান করলে আমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করব, একজনকেও জীবিত রাখব না। তাদের রক্ত দিয়ে এখানকার নদীতে রক্তের বন্যা বইয়ে দেব।’ আল্লাহ তা‘আলা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুআ কবুল করলেন। মুসলমানরা শত্রুদের পরাজিত করল এবং অনেক পারসিক ও খ্রিস্টান আরব সৈন্যকে বন্দী করল। বহু শত্রু নিহত হলো। এখন একটা প্রশ্নই শুধু বাকি ছিল যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কীভাবে তার ওয়াদা পূরণ করবেন? কা’কা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে, নিহত শত্রুর রক্ত এখনও শুকিয়ে যায়নি। এখানে নদীতে একটি বাঁধ আছে। কেউ একজন সে বাঁধ খুলে দিলে তার ওয়াদা পূরণ হয়ে যাবে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সে বাঁধ খুলে দিতে আদেশ দিলেন। তারপর পানি তার স্বাভাবিক গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহ হতে লাগল। মৃত সৈন্যদের রক্তও পানির সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হতে লাগল। এজন্য বর্তমানে ঐ নদীকে নাহরুদ-দাম বা রক্ত নদী বলে অভিহিত করা হয়।^{১৮৫}

পুরো এলাকা বিশেষ করে রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর মুসলমানগণ জাবানের বাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ ক্যাম্পে প্রবেশ করেন। তারা সেখানে বিশাল খাদ্যসম্ভার পড়ে থাকতে দেখলেন। কিন্তু কোনো লোক নেই, কোনো ফুর্তিবান লোক সেগুলো উপভোগ করছে না! খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব খাদ্যকে গনীমতের মাল বলে ঘোষণা দিলেন এবং তাদের সেগুলো আহার করতে বললেন। সবার জন্য এটাই ছিল রাতের ডিনার।

এই যুদ্ধ ‘আললীস’ নামক স্থানে সংঘটিত হয়। এজন্য এ যুদ্ধকে আললীসের যুদ্ধ বলা হয়। এখানে সব কাজ সমাধা হওয়ার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমগেশিয়ার দিকে যাত্রা করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে দেখে আমগেশিয়ার লোকজন তাদের সব সম্পদ রেখেই এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। তারা এত বেশি সম্পদ পেছনে রেখে যায় যে, সব যখন জমা করে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তখন প্রতি অশ্বারোহী ১৫০০ দিরহাম করে পান।

পরবর্তীতে এক-পঞ্চমাংশ গনীমতের মাল এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিজয়ের সংবাদ পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন, ‘হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সিংহ অন্য সিংহের উপর জয়ী হয়েছে। এবং তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। বর্তমানকালের মহিলা আরেকজন খালিদ প্রসবে ব্যর্থ হয়েছে।’^{১৮৬} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তি থেকে তার সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর সেনাপতির উপর যে কী পরিমাণ আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা’আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ সকল সাহাবীর উপর সমুদ্র হোন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যে ব্যক্তি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তার নাম জান্দাল। তিনি বনু যিল গোত্রের সদস্য, একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক। তিনি আরব ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পথ-ঘাট খুব ভালো চিনতেন। জান্দাল মদীনায়ে পৌঁছে খলীফাকে আললীস যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পাশাপাশি অন্যান্য খবরাদিও প্রদান করেন—
যেমন : গনীমতের মালের পরিমাণ, বন্দীদের সংখ্যা এবং যারা এ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছে ইত্যাদি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথায় অভিভূত হন এবং তার নাম জানতে চান। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জান্দালের নাম জানার পর তাকে একজন দাসী উপহার দেন (এ দাসী পরবর্তীতে জান্দালের এক সন্তান প্রসব করে)।^{১৮৭}

^{১৮৬} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৭৫)।

^{১৮৭} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৭৪)।

৫ ! হীরার যুদ্ধ

হীরার গভর্নর আমগেশিয়ায় সংঘটিত সবকিছুর বিবরণ জানতে পারলেন। স্বভাবতই তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তার এ ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। শীঘ্রই তিনি হীরা অভিযুখে অভিযান পরিচালনা করবেন। সুতরাং হীরাকে রক্ষার জন্য তিনি তার ছেলের নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেও আরেকটি দল নিয়ে হীরা ত্যাগ করেন। তার ছেলের উপর সরাসরি শত্রুকে আক্রমণ করার দায়িত্ব ছিল না, বরং শত্রুকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করাই মূল দায়িত্ব ছিল। তার কাজ ছিল ইউফ্রেটিস নদীর প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া যাতে শত্রুকে বহনকারী নৌকাসমূহকে চড়ায় আটকে ফেলা যায়।

হীরার গভর্নরের এই পরিকল্পনা মুসলমানদের আহত করল। যদি গভর্নরের ছেলে নদী পথে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, মুসলমানদের নৌকাসমূহ মাটিতে আটকে যাবে এবং তাদের রসদ সরবরাহের লাইন বন্ধ হয়ে যাবে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন বিরক্তি, রাগ কিংবা ভয় পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে কোনো ভূমিকা রাখে না, বরং কাজ করতে হয়। সুতরাং কোনো রকমের সম্ভ্রান্তভাবে ছাড়াই একদল সৈন্য নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গভর্নরের ছেলের দলবলকে শাস্তা করে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য তাঁরু থেকে বের হয়ে গেলেন। পশ্চিমধ্যে তিনি এক দল অশ্বারোহীকে পেলেন যারা গভর্নরের ছেলের দলের লোক ছিল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আচমকা তাদের উপর আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করলেন। কোনো সময় নষ্ট না করে এবং এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই গভর্নরের ছেলের সৈন্যদের আক্রমণের জন্য তীরবেগে ছুটলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গভর্নরের ছেলের পুরো বাহিনীকে তাদের মিশন শেষ করার আগেই কজা করলেন। গভর্নরের ছেলেসহ সব শত্রুসেনা নিহত হলো। তারপর তিনি নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করলেন।

তারপর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হীরার দিকে রওনা হলেন। হীরার গভর্নরের কাছে একটি নয়, পর পর দু-টি দুঃসংবাদ পৌছল: প্রথমে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর হাতে তার ছেলের মৃত্যু এবং তারপর

পারস্য সম্রাট আরদশীর মৃত্যুর খবর। সংক্ষেপে গভর্নরের অবস্থা মারাত্মক শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে উঠল। সে মারাত্মক ভয়ে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেও ভুলে গেল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে প্রতিরোধ করা এবং হীরাবাসীকে রক্ষা করার চেয়ে ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে পালিয়ে বাঁচল—সম্মানের সঙ্গে না হোক, অন্তত নিজের জ্ঞান বাঁচাতে পেরে সে খুশি হলো। হীরার গভর্নর ও তার সৈন্যদল এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে ছিটকে পড়ল। শহরে তাদের কোনো চিহ্নও নেই। ফলে শহরবাসী নিজেরা নিজেদের রক্ষায় চারটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। ফলশ্রুতিতে তারা সর্বাঙ্গিক অবরোধের মুখোমুখি হলো। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরো শহরকে অবরোধ করেননি, বরং এই চারটি দুর্গ মুসলমানদের চারটি ছোট দল দিয়ে অবরোধ করে রাখলেন। তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে এ চারটি দুর্গের কমান্ডার নিয়োগ করেন :

- ১। যিরার ইবনে আযওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাদা দুর্গ,
- ২। যিরার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদিসিয়ান দুর্গ,
- ৩। যিরার ইবনে মুকরিন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বনু মাযিন দুর্গ এবং
- ৪। মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইবনে বাকিলাহ দুর্গ।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক কমান্ডারকে শত্রুদের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে বলেন। অবরুদ্ধ শত্রুরা কোনো শর্ত না মেনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল। তারা মুসলমানদের লক্ষ্য করে ছোট ছোট পাথরের ক্রাস্টার ছুঁড়তে লাগল। মুসলমানরা এর জবাবে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই পারসিকরা তাদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারল এবং দুর্গের ভেতর থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘হে আরব! আমরা তোমাদের দেয়া তিনটি শর্তের একটি মেনে নেব (জিযিয়া কর দেব)। সুতরাং তীর বন্ধ কর।’

অতঃপর চার দুর্গের নেতারা একে একে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের জন্য বের হয়ে এল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক নেতাকে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ভৎসনা করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক নেতার সঙ্গে চুক্তি করলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না, তবে বাৎসরিক ১,৯০,০০০ দিরহাম জিযিয়া কর প্রদান করবে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর গনীমতের

মাল মদীনায়ে প্রেরণ করেন। এই গনীমতের সঙ্গে পারস্যের এই অবরুদ্ধ নেতারা খলীফার জন্য মূল্যবান একটি হাদিয়া প্রদান করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদিয়া পেয়ে তিনি এটাকে গ্রহণ করা অসঙ্গত মনে করলেন। সাধারণত অনারব নেতারা বিজিত জনগণের নিকট থেকে এ রকম মূল্যবান উপটোকন গ্রহণ করে থাকে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই উদাহরণ রেখে যেতে চাননি। বরং তিনি এর পরিবর্তে বিজিত জনগণের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত এবং দয়াল্প আচরণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং হাদিয়া গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি তা যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

হীরায়ে ফিরে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে বিস্তারিত চুক্তি-সম্পাদন করলেন। এ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হীরাবাসীরা বছরে ১৯০০০০ দিরহাম জিযিয়া কর প্রদান করবে। আর এর বিপরীতে তারা তাদের স্বধর্ম পালন করার সুযোগ পাবে। অধিকন্তু তারা মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করবে—এমনকি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকেও তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ কথাও বলেছেন যে, যদি মুসলিম সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের আর জিযিয়া কর দিতে হবে না। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ না মুসলমানরা আবার এ চুক্তির শর্তসমূহ পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি হীরাবাসী কখনও মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা এ চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে পুরো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ চুক্তি ১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সম্পাদিত হয়।^{১৮৮}

আরেক বর্ণনামতে হীরার অধিবাসীরা যখন দুর্গের ভেতর অবস্থান করছিল, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেন: ‘হয় তোমরা ইসলামধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন, আমাদের মতোই অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করবে; অথবা জিযিয়া কর প্রদান কর; অথবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু

মনে রেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমনসব লোক নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে অধিক ভালোবাসে যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাস।’ এ কথার উত্তরে অবরুদ্ধ দুর্গের নেতারা বলে, ‘ঠিক আছে, তাহলে আমরা জিযিয়া কর প্রদান করব।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমরা ধ্বংস হও। তোমাদের জন্য দুর্ভোগ! অবিশ্বাস হলো পলায়নপর মনোবৃত্তি যা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং সবচেয়ে বোকা আরবরাই এ পথে পা বাড়ায়।’^{১৮৯}

এ ঘটনায় প্রমাণ করে যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা—মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া। গৌরব, সম্পদ আহরণ, ধনী হওয়া, দুনিয়ার জীবন উপভোগ করা—এসবের কোনো কিছুই তার উদ্দেশ্য ছিল না। যুদ্ধে তিনি বরাবরই শাহাদাতের আকাজক্ষা করেছেন এবং শান্তির সময় তিনি মানুষের হেদায়েতের উসিলা হতে চেয়েছেন। তাহলে তিনি কেন রাগান্বিত হলেন, যখন হীরার অধিবাসীরা জিযিয়া কর দিতে চাইল? জিযিয়া কর তো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ বৃদ্ধি করে মুসলমানদেরই উপকারে আসবে। দুনিয়ার স্বচ্ছলতা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কোনো বিষয় ছিল না। তিনি তো সত্যিকার ঈমানদারের জন্য আল্লাহ যা গচ্ছিত রেখেছেন, তার জন্য পাগলপারা ছিলেন—জান্নাত এবং চিরশান্তি ও চিরসুখের জায়গা। এটা খুবই সম্ভব যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হীরাবাসীকে ইসলামগ্রহণ অথবা জিযিয়া কর প্রদানের সুযোগ দিলেন তিনি তখন রাসূলের এই কথাকে স্মরণ করেছিলেন,

لَا أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

তুমি একজন মানুষকেও দ্বীনের পথে আনতে পার, তাহলে সেটা লাল উট পাওয়ার চেয়েও অনেক দামি (ঐ সময় যার কাছে একটা লাল উট থাকত, তাকে বর্তমান সময়ের একজন লাখপতি মনে করা হতো)।^{১৯০}

^{১৮৯}আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৭৮)।

^{১৯০}সহীহ বুখারী (৪২১০)।

হীরার কৌশলগত অবস্থানের গুরুত্ব

কৌশলগত অবস্থানের কারণে হীরা ইরাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা উপলব্ধি করে এ শহরকে ইরাকের সকল সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রধান ফৌজি ঘাঁটি বানান। পরবর্তীতে এখান থেকেই ইরাকে বিভিন্ন অভিযানে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এখান থেকেই সব নির্দেশ প্রদান করা হতো। অধিকন্তু তিনি এখানে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় জিযিয়া কর সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করতেন এবং যুদ্ধের সম্মুখ লাইন দেখভাল ও নিরাপত্তার জন্য টহল অভিযান পরিচালনা করতেন।

সংক্ষেপে যতক্ষণ না পুরো ইরাক বিজয় করা সম্ভব না হয়, হীরা মুসলমানদের জন্য ইরাকের বিজিত এলাকার রাজধানীতে পরিণত হয়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল সামরিক নেতা হিসেবেই সফল ছিলেন না, বরং বিজিত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও সফল ছিলেন। এ সময়ের খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইরাকে অবস্থান নবম হিজরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ সময় মুসলমানরা আরব উপত্যকার অধিকাংশ এলাকা বিজয় করে এবং দিকে দিকে বিভিন্ন আরব গোত্রের প্রতিনিধিরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণ করতে থাকে। একইভাবে ইরাকের অধিকাংশ এলাকা মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পর ইরাকের অন্যান্য শহরের নেতারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে শান্তি চুক্তি করার জন্য আসতে থাকে। সামান্য সময়ের মধ্যে ইরাকের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম কবুল করেছে অথবা শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করার সুবিধার্থে ইরাকের বিজিত এলাকাসমূহকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। এসব প্রদেশে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেন :

- ✓ আব্দুল্লাহ ইবনে উসাইমাহ আন-নাসরী রাযিয়াল্লাহু আনহু - ফালালিয প্রদেশ
- ✓ ২। যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু - বানকিয়া প্রদেশ

- ✓ ৩। বাশির ইবনে খাসাসিয়াহ - নাহরাইন প্রদেশ
- ✓ ৪। সুআইদ ইবনে মুকরিন মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু - তাসতার প্রদেশ
- ✓ ৫। উত্ত ইবনে আবি উত্ত - রাওয়সতান

নিম্নে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ সারির কমান্ডারদের নামের তালিকা দেয়া হলো :

- ✓ ১। যিরার ইবনে আযওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ২। মুসান্না ইবনে হারিসা শাইবানী রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ৩। যিরার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ৪। যিরার ইবনে মুকরিন রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ৫। কাকা ইবনে আমর আত-তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ৬। বুসর ইবনে আবী রুহম রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ ৭। উতাইবাহ ইবনে নাহহাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

পারস্যের নেতাদের নিকট খালিদ রা.-এর প্রেরিত পত্রসমূহ

একশ বছর ধরে টিকে থাকা পারস্য সাম্রাজ্যে হঠাৎ করেই যুদ্ধের দামাঘা বেজে ওঠে। মুসলিমশক্তি তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অধিকাংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে তারা মুসলমানদের কাছে হেরেছে। এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হওয়ারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গতকারণেই এই সাম্রাজ্য টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সাম্প্রতিক পারস্যের বাদশা আরদশীর মৃত্যু পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজপরিবারের সদস্যরা সিংহাসন লাভের প্রতিযোগিতায় মেতে আছে। যদি রাজপরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রের বিজ্ঞজনেরা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ডুবে থাকে, তাহলে তারা বিদেশি শক্তিকে কেমন করে পারজিত করবে?

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সশ্রুটি আরদশীর মৃত্যুর প্রভাব সম্পর্কে ঠিকই অবগত ছিলেন এবং রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও রাজপরিবারের মধ্যে চলমান সংকট সম্পর্কেও তিনি জানতেন। এ সংকটময় মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের উচ্চ পর্যায়ের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। এ চিঠিতে লেখেন:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাদের সরকারকে অকেজো করে দিয়েছেন, তোমাদের দুর্বল করেছেন, তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তোমাদের সম্মান থেকে পদস্থলিত করেছেন। আমার এই চিঠি যখন তোমাদের নিকট পৌছবে, তখন যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর, তাহলে তোমাদের নিরাপত্তা দেয়া হবে। অন্যথায় জিযিয়া কর প্রদান কর। যদি এর কোনোটাই না মান, তাহলে আমি এমন সব সৈন্য নিয়ে তোমাদের মোকাবেলা করব যারা মৃত্যুকে এমন ভালোবাসে যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাস এবং আখেরাতের জন্য তারা এমন পাগলপারা যেমন তোমার দুনিয়া কামনা কর।

খালিদ ইরাকের সাধারণ জনগণের নিকটও চিঠি পাঠান। সেসব চিঠির বক্তব্য একই, তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা হয়েছিল : ইসলাম কবুল কর, নতুবা জিযিয়া কর দাও, অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। মনে রেখ, আমি এমনসব সৈন্য নিয়ে তোমাদের মোকাবেলা করব যারা মৃত্যুকে এমন ভালোবাসে যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাস এবং আখেরাতের জন্য তারা এমন পাগলপারা যেমন তোমার দুনিয়া কামনা কর।’

হীরা বিজয়ের মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ইরাক বিজয়ের লক্ষ্যে তিনি অর্ধেক এগিয়ে গিয়েছেন। এখন তাকে পারস্যের বাদশার মূল কেন্দ্রে আঘাত হানতে হবে। ইরাক যুদ্ধে বিজয়ের সংখ্যার চেয়ে যে গতিতে তা অর্জন করা হয়েছিল, তা-ই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর। ১২ হিজরীর মহররম মাসে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে অভিযান শুরু করেন এবং ঐ একই বছর রবিউল আওয়াল মাসে হীরা বিজয় করতে সক্ষম হন।

খালিদ রা.-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার গায়েবী সাহায্য

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যক্তি হিসেবে বেশি ধার্মিক না যোদ্ধা, এ বিতর্কের মূল কথা হচ্ছে, তিনি দুটোই ছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তার যুদ্ধ ও বীরত্বের ঘটনাই বেশি পাওয়া যায়। খুব কমসংখ্যক গ্রন্থেই তার ঈমান, দীনদারী এবং ইবাদতের বর্ণনা রয়েছে। এটাই খুব স্বাভাবিক। কারণ, তার ইবাদত-আমল ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং যুদ্ধ ছিল প্রকাশ্য বিষয় যা তার সময়ের লোকদের ও পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করেছে। যা হোক, সত্য হচ্ছে খালিদ

রাযিয়াল্লাহু আনহু উঁচু শ্রেণির ইবাদতকারী হওয়ার জন্যই যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন। এটা ঠিক যে, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সৈনিক দক্ষ হিসেবে গড়ে ওঠে; কিন্তু অন্তরের প্রচণ্ড সাহসিকতা, যা কিনা একজন সামরিক ব্যক্তির মূল শক্তি, এটা দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ততা ছাড়া তা লাভ করা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় ঈমানের জন্য তাকে একটি প্রকাশ্য কারামত নসীব করেন। ইরাকে অবস্থানের সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। তার নাম আমর ইবনে আব্দুল মাসীহ ইবনে বুকাইলা। সে ছিল তার দলের সর্দার। একদিন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনে বুকাইলার গোলামের গলায় একটি থলে ঝুলানো দেখতে পান। তিনি থলেটি নিয়ে খোলেন এবং কিছু একটি জিনিস দেখতে পান। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কী?' আমর ইবনে আব্দুল মাসীহ জবাব দিল, 'এটা মারাত্মক বিষ যা পান করলে মানুষ এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে এটা বহন করার কারণ জানতে চাইলেন। আমর ইবনে আব্দুল মাসীহ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সে যখন নিজ সম্প্রদায়ের দুরবস্থা দেখতে পাবে, তখন সেটা খেয়ে ফেলবে। কেননা, এমন অবস্থা দেখার চেয়ে মরে যাওয়াটাই তার নিকট অধিকতর প্রিয়। সে আরও বলল যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময়ের অনিশ্চয়তার ব্যাপারে আমর ইবনে আব্দুল মাসীহকে বললেন, 'কোনো মানুষ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কখনও মারা যায় না।' তারপর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন এক কাজ করে বসলেন যা সবাইকে স্তম্ভিত করে। তিনি বিষটুকু হাতে নিয়ে পড়লেন,

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي لَيْسَ يَضُرُّهُ مَعَ

أَسْمِهِ دَاءُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। তার নাম সকল নামের চেয়ে উত্তম। তিনি আসমান ও জমিনের প্রতিপালক। যার নামের বরকতে কোনো রোগ কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

তিনি এ দুআ পড়ে বিষটুকু খাওয়ার জন্য মুখের দিকে তুললেন। আশেপাশে যারা ছিল, তারা সবাই তাকে এ বিষ খাওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু তারা আসার আগেই অবলীলায় তিনি তা গিলে ফেলেন। বিষের ক্রিয়ায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করার কথা। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় ঈমানের জন্য এ বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমরা ইবনে আব্দুল মাসীহ বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এরূপ একজন লোকও যদি বেঁচে থাকে, তা হলেও তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।’

প্রথম শুনলে মনে হতে পারে যে, ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর অথবা নিরোট বানানো। এজন্য সম্প্রতি অনেক ইসলামী পণ্ডিত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদাকে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য এসব হাদীসকে ‘জাল হাদীস’ বলে প্রচার করছে। কিন্তু কেউ যদি গভীরভাবে হাদীসশাস্ত্র এবং এ সংক্রান্ত মূলনীতি অধ্যয়ন করে, তাহলে তিনি সহজেই স্বীকার করবেন যে, এসব বর্ণনা বানোয়াট নয়, বরং সত্য। সহীহ প্রমাণিত না হলেও গ্রহণযোগ্য। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইবনে কাসির রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এ সংক্রান্ত হাদীসকে দুর্বলও বলেননি, বানোয়াট বলা তো দূরের কথা। আবার হাফিজ ইবনে হাজার রহ. ইসাবাহ কিতাবে এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘আবু ইয়ালা এ হাদীসটি দু-জনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালা এ বর্ণনাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেননি।’ আর ‘কারামত’ আলোচনা প্রসঙ্গে নেক বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা যে বিভিন্ন অলৌকিক জিনিস প্রকাশ করে থাকেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাটির বর্ণনাকারীরা গ্রহণযোগ্য। হাদীস শাস্ত্রে বিখ্যাত মনীষীগণ যেমন : তাবারী, ইবনে সা’দ, ইবনে কাসির, ইবনে হাজার এবং ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে সমর্থন দিয়েছেন। এসব আলেম যারা এটাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তারা নিঃসন্দেহে অধুনা আলেম ও লেখক থেকে অধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঘটনাটি সত্য।

এখন ঘটনাটিকে সত্য হিসেবে মেনে নিলেও ব্যক্তির মনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে জাগ্রত হতে পারে। যেমন, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু

জেনেশুনে কেন বিষপান করলেন? এ রকম করা কি তার ঠিক হয়েছে? আর যদি তিনি করেই থাকেন, তাহলে বর্তমানে যারা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, তারাও কি এই কাজ করতে করবেন? প্রথম কথা হচ্ছে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ঈমান ইতিহাসের পাতায় বিরল। সুতরাং তার অবস্থা যদি এ রকম হয়, তাহলে তার কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা আমাদের জন্য উচিত নয়। তিনি এমন এক স্বর্ণযুগের মানুষ যারা অনেক বিস্ময়কর জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন। এর মধ্যে কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত হয়েছে এবং আরও কিছু পরবর্তীতে ঘটেছে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন নিজ হাতে বিষ নিয়েছেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবেই এ বোধ ও বিশ্বাস পোষণ করেছেন যে, আল্লাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় যার ইশারায় প্রতিটি দ্রব্য (খাদ্য, শস্য, ওষুধ অথবা বিষ) তার নির্দিষ্ট গুণ প্রকাশ করে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এটাও বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা চরম ক্ষমতাশীল। তিনি চাইলে বস্তুর এ অনিবার্য গুণ নষ্ট করে দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন আগুন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর স্বাভাবিক ক্রিয়া মানে পোড়ানোর কাজ করতে পারেনি। বরং আগুন উদ্ভূত অবস্থার পরিবর্তে তার উপর ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। একই ঘটনা নবী নন, এ রকম একজন সাধারণ মানুষের বেলায়ও ঘটেছে। তার নাম আবু মুসলিম খাওলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যখন আসওয়াদ আনাসীকে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান, তখন এটা ঘটে। ফলে তাকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। আশেপাশের লোকেরা এ অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করল যে, আবু মুসলিম রাযিয়াল্লাহু আনহু আগুনের মধ্যে নামায পড়ছেন এবং আগুন তার কোনোই ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। একইভাবে আল্লাহ তা'আলা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য বিষের ক্রিয়াকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বিষটুকু খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি ঘূর্ণাক্ষরেও এ কথা মনে করেননি যে, যদি বিষ খেয়েও তিনি বেঁচে যান, তাহলে বিষয়টি কত গৌরবের হবে! যদি

তার অন্তরে লোকদেখানো কোনো মনোভাব কিংবা গৌরব অর্জনের চিন্তা থাকত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো বিষের স্বাভাবিক ক্রিয়ায়ই প্রতিফল ঘটাতেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া বিষের ক্ষতি থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন না। সুতরাং যা হয়েছিল, তা হলো : খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের কথাকে আক্রমণাত্মক মনে করেছেন যে, তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে। কারণ, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নির্ধারিত সময়ের আগে কেউ মরতে পারে না—এক মিনিট আগেও না, এক মিনিট পরেও না। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা এত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং এ ইয়াকীন তার অন্তরে এত মজবুত ছিল যে, আল্লাহ চাইলে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে—এজন্য তিনি বিষ পান করেছেন—অন্তরে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেছেন যে, বিষের কোনো ক্ষমতা নেই। এ পৃথিবীতে কারও কোনো ক্ষমতা নেই, শক্তি নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তিনি কেবল আল্লাহর ইচ্ছা করলেই মৃত্যুবরণ করতে পারেন, আর নতুবা নয়। ফলশ্রুতিতে, বরং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর ঈমানের কারণে, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের অলৌকিক বিষয় সংঘটিত করেছেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষ খেয়েও একইরকম সুস্থাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, তার উপর এর কোনোই প্রভাব পড়েনি।

উপরোল্লিখিত ঘটনার ব্যাপারে মুসলমানদের এ ধারণা রাখা উচিত যে, কেউ যেন নিজ বাড়িতে (বিষ খাওয়ার) এ চেষ্টা না করেন। এ সতর্কবাণীকে যদি মামুলি মনে করেন, তবু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমান যদি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহলে হয়তো মনে করতে পারেন, তার দৃঢ় ঈমান রয়েছে এবং তিনিও কোনো ক্ষতি ছাড়াই বিষ পান করতে পারবেন। তাহলে এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আর কারও উপর তার করুণা দান করবেন না। অবশ্যই তিনি তা দান করতে পারেন। কিন্তু এখানে মূল কারণ হচ্ছে, সে নিজের ঈমানকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমতুল্য মনে করে বলে আছে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেলাম যে ঈমানের অধিকারী ছিলেন, ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে যত সচেষ্ট ছিলেন, দীনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ঈমানের দাবিতে তারা যে ত্যাগ

স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা যে কত গভীর ছিল—এগুলো আমরা না মাপতে পারব, না লাভ করার আশা করতে পারি। সুতরাং যদি কেউ আন্তরিক হয় এবং এ বিশ্বাসও দৃঢ়ভাবে রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা বিষের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারেন, তারপরেও কারও জন্য এ রকম পরীক্ষা করা উচিত নয়। এ আশাও তার করা উচিত নয় যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো তিনিও একই কারামত লাভ করবেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান ছিল অনেক উর্ধ্বে, যে ঈমান কারও পক্ষে না হলেও অনেকের পক্ষেই অর্জন করার আশাই বৃথা।

ঘটনাক্রমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, হীরা বিজয়ের পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আট রাকাত নামায পড়েছেন। এ নামায তিনি দু-রাকাত কিংবা চার রাকাত করে পড়েননি। বরং একসঙ্গে পড়েছেন। কেবল শেষ রাকাতে তাসলিম করেছেন।

৬। আশ্বার বিজয়

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ইরাকে অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে কে আগে হীরায় পৌছতে পারেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের দক্ষিণ দিক থেকে এবং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করবেন। পরিশেষে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আগে হীরায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সেখানে পৌছার পথে শত্রুর সব বাধাকেই তিনি অতিক্রম করেন। অন্যদিকে ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু এ রকম সফল হতে পারেননি : জাম্দালে শত্রুদের মোকাবেলায় তিনি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এজন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হীরা ত্যাগ করে ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। কা'কা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হীরার শাসনভার প্রদান করে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু এ যাত্রাপথে আশ্বার নামক স্থানে শত্রুরা তার গতিরোধ করে। উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে আশ্বারের নিয়ন্ত্রণ নেয়াটাকেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জরুরি মনে করেন যাতে পশ্চাতে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো যায়।

এই শহরের অধিবাসীদের আত্মসমর্পণ করার কোনো লক্ষণ ছিল না। তারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এর আগে তারা শহরের চারিদিকে পরিখা খনন করে যাতে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সহজে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। স্বাভাবিকভাবে তাদের উপর অবরোধ আরোপিত হয় যদিও এটা বেশি দিন টেকেনি। কারণ, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্গ জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন। এজন্য তিনি এজন্য যা কিছু করা দরকার, তা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমে তিনি দলের দুর্বল উটগুলোকে জবাই করেন এবং তারপর এগুলো পরিখার সঙ্কীর্ণ জায়গায় ফেলে পথ তৈরি করেন। এ পথে তিনি আশ্বার শহরে প্রবেশ করেন।

তার পরিকল্পনা ছিল শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করা। কারণ, শত্রুরা নিশ্চিত ছিল যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যরা এ পরিখা অতিক্রম করতে পারবে না। মুসলমান সৈন্যরা যখন মৃত উটের স্বপে তৈরি ব্রিজ দিয়ে পরিখা পার হওয়া শুরু করলেন, তখন আশ্বার অধিবাসীরা উপায়ান্তর না দেখে দুর্গে আশ্রয় নিল এবং তাদের সেনাপতি শাহিরাজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো। আত্মসমর্পণের আগে শাহিরাজ তার দলবলসহ নিরস্ত্র অবস্থায় শহর ত্যাগ করার আশ্রয় প্রকাশ করে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ শর্ত মেনে নেন, তবে তার সঙ্গে কোনো টাকা বা সম্পদ নিতে পারবে না বলে জানান। শাহিরাজ কোনোমতে জ্ঞান বাঁচানোর আশায় ছিল। সে সব শর্ত মেনেই আশ্বার ত্যাগ করে।

দুর্গের ভেতর সব লোকই পার্সিয়ান ছিল না; তাদের মধ্যে কিছু আরবও ছিল যাদের সঙ্গে বনু ইয়াদ গোত্রের চুক্তি ছিল। বনু ইয়াদ গোত্রটি বাখতানসার যুগে ইরাকে প্রবেশ করেছিল। বিজয় অর্জিত হওয়ার পর মুসলমানদের অনেকে, যার মধ্যে অনেক সাহাবীও ছিলেন, আশ্বার অধিবাসীদের নিকট পড়তে ও লিখতে শেখেন।

৭। আইনুস্তামার

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যাবরকান ইবনে বদরকে আশ্বারের দায়িত্বে নিয়োজিত করে তিনি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পশ্চিমধ্যে আইনুস্তামার নামক স্থানে উক্বাহ ইবনে আবি উক্বাহর প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেন। উক্বাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে খালিদ

রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অপেক্ষায় ছিল। তার বাহিনীতে বনু তগলব, বনু নামের ও বনু ইয়াদ গোত্রের লোকেরাও যোগদান করে। তারা ছিল আরব। তারাই শুধু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি ছিল না, তাদের সঙ্গে ছিল মেহরানের নেতৃত্বে পার্সিয়ান সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী। আরব এবং পার্সিয়ান সৈন্যরা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ ছিল। মিলেমিশে একটি সুবিশাল বাহিনী গঠন করার পরিবর্তে আরব ও পার্সিয়ানরা দুটো আলাদা বাহিনী হিসেবেই রণক্ষেত্রে অবস্থান করছিল।

আবার ইরাকে শত্রুপক্ষ খালিদের বাহিনীকে দুর্বল মনে করে আত্মঘাতী কাজ করে বসল। এমনকি উক্বাহ এটাও মনে করেনি যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরাজিত করতে তার মেহরানের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য অহংকারবশত সে মেহরানকে এ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার কথা বলল : ‘অবশ্যই আরবরাই আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সবচেয়ে উপযোগী। সুতরাং খালিদকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।’ জবাবে মেহরান বলল, ‘ঠিক আছে। তারপরেও যদি আমাদের প্রয়োজন পড়ে, আমরা তোমাকে সাহায্য করব (মুসলমানদের বিরুদ্ধে)।’ পার্সিয়ান সৈন্যরা মেহরানের সিদ্ধান্তে আপত্তি জানালে মেহরানও অহংকারবশত বলে ওঠে, ‘উক্বাহ এবং সৈন্যদের যুদ্ধ করতে দাও। যদি তারা খালিদকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে সে তোমাদের (তোমরাই তাকে শাস্তি দিবে এবং হত্যা করবে)। আর যদি উক্বাহ পরাজিত হয়, তাহলে আমরা খালিদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ইতিমধ্যে খালিদ উক্বাহর সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়বে, অথচ আমরা তখন শক্তিশালী এবং সবল থাকব।’ এ কথা শোনার পর মেহরানের সৈন্যদের তার প্রতি অবজ্ঞা ভালোবাসায় পরিণত হয়।

একটু পরেই খালিদের বাহিনী এবং উক্বাহর বাহিনী মুখোমুখি হয়; এটা এমন একটা কঠিন মুহূর্ত যেজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই প্রতীয়মান হয়নি। আধুনিককালে এটাকে ‘আত্মঘাতী চুরি’ বলে অভিহিত করা যায়। এটা যারা বেসবল খেলেন, তারা ভালো বুঝবেন। ‘সুসাইড সিটল’ সম্পূর্ণভাবে হঠাৎ ঘটা একটি ব্যাপার।

যখন দু-টি বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, তার সামনে একটি ঝুঁকিপূর্ণ উপায় রয়েছে যা ব্যবহার করতে পারলে একমুহূর্তেই শত্রুদের ঘায়েল করা সম্ভব। উক্কাহ তার সৈন্যদের দিকে ফিরে তাদের সারিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সংক্ষেপে উক্কাহর বাহিনী নিজেদের যুদ্ধের জন্য তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে। ঐ মুহূর্তে শত্রুপক্ষের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। খালিদ তার দু-বাহুর সৈন্যদের তাদের অবস্থানে অবস্থান করতে আদেশ দিলেন। আর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে দ্রুত দু-বাহিনীর মাঝখানের খালি জায়গা অতিক্রম করলেন। শত্রুপক্ষের কাছকাছি পৌঁছেই হঠাৎ করে উক্কাহকে নিষ্কিণ্ত ফাঁসে বন্দী করে ফেলেন। তারপর তাকে নিয়ে আবার দ্রুত নিজেদের দিকে ফিরে আসেন। পুরো অপারেশনটি করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। এজন্য শত্রুসৈন্যরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতি বুঝতে পারলেও তাকে তাদের নেতাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে থামাতে পারেনি। যদি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ করতে গিয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে নিতেন, তাহলে উক্কাহ নয়, বরং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুই শত্রুদের কজায় বন্দী হয়ে যেতেন। তখন এটা মুসলমানদের চরম দুর্গতির কারণ হতো। পরিশেষে উক্কাহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যাওয়াতে তার সৈন্যরা আশা ছেড়ে দেয় এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এ সময় উক্কাহর পার্সিয়ান বাহিনী রণক্ষেত্রেও ছিল না। বরং তার নিরাপদ দূরত্বে আইনুত্তামারে দুর্গে অবস্থান করছিল। তারপর যখন সে উক্কাহর বাহিনীর পরাজয়ের খবর এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেছে বলে খবর পায়, তখন সে দুর্গ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; তার সৈন্যরা তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে। যখন দুর্গ খালি হয়ে যায়, তখন সেখানে থাকা কিছু খ্রিস্টান এসে এখানে আশ্রয় নেয়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দুর্গে পৌঁছলেন, তখন মেহরান এবং তার বাহিনী পালিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। সেখানকার অধিবাসী কিছু খ্রিস্টান দুর্গে আশ্রয় নিয়ে আছে। কিছুকাল অবরোধ করে রাখতেই খ্রিস্টানরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর উক্বাহ এবং অন্যান্য বন্দীদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানগণ সেদিন অনেক গনীমতের লাভ করলেন। এর বেশিরভাগই আইনুত্তামারের দুর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সেখানে কাছাকাছি একটি গির্জায় চল্লিশজন শিশু বাইবেল পড়াশোনা করছিল। এই শিশুদের খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সম্পদশালী লোকের দায়িত্বে অর্পণ করেন। এ শিশুরা সবাই ছিল গোলাম। এর মধ্যে একজনের নাম হুমরান। পরবর্তীতে তিনি উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুক্ত দাস হয়েছিলেন। আর তাদের মধ্যে আরেকজন সিরিনকে আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেয়া হয়। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এই সিরিনই মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. এর পিতা, যিনি পরবর্তীতে মুসলিম জাতির একজন বড় ফকীহ হন।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মদীনায় প্রেরণ করলেন। গনীমতের মাল এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিজয়ের সংবাদ পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালীদ ইবনে উক্বাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যার্থে কাজ করবেন। ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে দাওমাতুল জান্দাল অবরোধ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। শত্রুরা তার চারিদিকে সাপ্লাই-লাইন কেটে রেখেছিল। ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনোমতে ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। তখন ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘বিশাল বাহিনী গঠন করার চেয়ে অনেক সময় সামান্য উপদেশও খুব কাজে দেয়। এজন্য এ অবস্থায় আমার কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর?’ ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি লিখুন এবং তিনি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।’ ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠি লিখলেন। আইনুত্তামারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠি পান এবং এর জবাবে লেখেন, ‘আমি এখনই আপনার দিকে রওনা হচ্ছি।’

৮। দাওমাতুল জান্দাল

উওয়াইম ইবনে কাহিল আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আইনুত্তামার দুর্গের রক্ষণভার প্রদান করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দাওমাতুল

জান্দালের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমন-সংবাদে দাওমাতুল জান্দালের নেতারা আতঙ্কে কেঁপে উঠল। তারা দ্রুত তাদের মিত্র বাহরা, কালব, গাসসান এবং তানুখ গোত্র থেকে সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করল।

দাওমাতুল জান্দালের অধিবাসীদের নেতা ছিল দু-জন : উকাইদির ইবনে আব্দুল মালিক এবং জুদী ইবনে রাবীআ। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে লড়াই করার পদ্ধতি নিয়ে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে উকাইদির ইবনে আব্দুল মালিক বেশি আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে যুদ্ধের অতীত অভিজ্ঞতার জন্য তার এ ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। তাবুক যুদ্ধে সে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখোমুখি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উকাইদির ইবনে আব্দুল মালিককে বন্দী করে মুসলমানদের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। তাকে হত্যা কিংবা শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে একটি চুক্তির বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে সে চুক্তির শর্তসমূহ ভঙ্গ করে। ফলে ঐদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গের কারণে সে আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। কারণ, তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম হয় যে, এ চুক্তি ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ সে আগে কিংবা পরে হত্যার শিকার হবে।

এখন যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখযোগ্য সেনাবাহিনী নিয়ে দাওমাতুল জান্দালের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন উকাইদির মনে করল, তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে। এজন্য চরম হতাশা থেকে সে জুদীকে বলল, 'সবার চেয়ে আমি খালিদকে অধিক জানি। যুদ্ধে তার চেয়ে পারদর্শী কেউ নেই। যখনই কোনো বাহিনী তার চেহারা দেখে, তারা ছোট কিংবা বড় দল হোক, তারা খালিদের নিকট থেকে পালিয়ে যায় (কারণ, তারা তাকে ভয় পায়)। সুতরাং তার সঙ্গে সন্ধি করে নাও।' জুদী এবং তার সঙ্গীরা সবাই উকাইদিরের এ পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে। তারপর জুদী বলে ওঠে, 'তাহলে আমি তোমাকে খালিদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব না। তার সঙ্গে তোমারই মোকাবলো করতে হয়ে।' যখন শত্রুপক্ষ কারও সুনাম করে, তখন এটা নিশ্চিত যে, এ সুনাম সত্য।

উকাইদির খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে—শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করা এবং সামরিক কৌশলে ও যুদ্ধে তার পারদর্শীতা—পরিপূর্ণভাবে সত্য।

পরবর্তীতে যা হয়েছে তাতে এ বিষয়টিই মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে, কেউই মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময় পরিবর্তন করতে পারে না। যদিও উকাইদির দাওমাতুল জান্দাল ত্যাগ করেছিল, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যতদূর সম্ভব পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার এ পালানোর কথা দ্রুত পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কাছকাছি কোথাও উকাইদিরের উপস্থিতি টের পেয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আসিম ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাকে ধরে বন্দী করে নিয়ে আসার হুকুম দেন।

উকাইদিরকে খুঁজে পাওয়া এবং তাকে ধরে আনতে আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব বেশি সময় নেননি। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। অতীত চুক্তিভঙ্গ এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই উকাইদিরের জন্য এটা শাস্তিস্বরূপ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে দয়ার্দ্ৰ আচরণ করেছিলেন, শান্তির উপযুক্ত হলেও তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু উকাইদির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে যা ওয়াদা করেছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করে তা ভঙ্গ করেছে।^{১৯১}

দাওমাতুল জান্দালে পৌছে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গাড়েন। দাওমাতুল জান্দালের অধিবাসী এবং তাদের মিত্ররা তাদের সৈন্যদের দু'ভাগে ভাগ করে। প্রথম দল খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে মোকাবেলা করবে এবং দ্বিতীয় দল ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে মোকাবেলা করবে। সুতরাং দু-টি যুদ্ধ একই সময় সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং তা-ই হলো : জুদী ইবনে রাবীআ ও তার সৈন্যরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে এবং একই সময় ইবনে হাদরাযান, ইবনে আবহাম ও তাদের বাহিনী ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে এগিয়ে গেল।

^{১৯১} আত-তারিখ আল-ইসলামী (৯/১৩৬)।

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তুলনামূলক কম সময়ে জুদীর বাহিনীর উপর একতরফা বিজয় অর্জন করেন। ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুও শত্রুদের শেষ পর্যন্ত পরাজিত করতে সক্ষম হন, তবে তাকে একটু কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এ যুদ্ধে যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল এবং বন্দীও এড়াতে সক্ষম হয়েছিল, তারা দাওমাতুল জান্দালের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্গ ইতিমধ্যে লোকে লোকারণ্য ছিল। ভেতরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। একপর্যায়ে তারা দুর্গের গেট বন্ধ করে দেয়। ফলে পলায়নপর সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে পশ্চাতে ধাবমান মুসলমানদের সহজ শিকারে পরিণত হয়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্গের কাছকাছি এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর দুর্গের দরজা ভেঙে- ভেতরে শত্রুদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ করেন এবং শত্রু নিধন করে দুর্গে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।^{১৯২}

দাওমাতুল জান্দাল বিজয়ে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর মুসলমানদের করতলগত হয়। এ শহরের উপর দিয়ে তিনটি প্রসিদ্ধ রাস্তা অতিক্রম করেছে : দক্ষিণে আরব উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে ইরাক এবং উত্তর-পূর্ব দিকে শাম (সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ)। এজন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যত দ্রুত সম্ভব দাওমাতুল জান্দাল বিজয় করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু দাওমাতুল জান্দালকে পাশ কাটিয়ে চলে যাননি। বরং এখানে অবস্থান করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, অপেক্ষা করেছেন যাতে এ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়া যায়। ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, যতদিন পর্যন্ত দাওমাতুল জান্দাল মুসলমানদের হাতে না আসবে, ততদিন মুসলমানরা ইরাকে স্বস্তি পাবে না।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল ইরাকের দক্ষিণে অধিকাংশ এলাকা বিজয় করেননি, বরং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকের উত্তরে সামরিক কৌশলগত দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর বিজয় করতে সাহায্য

^{১৯২} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/১৯৬); আবু বকর আস-সিদ্দীক, খালিদ জিনানী (পৃ. ৫৪)।

করেন। আমরা যদি ইরাক-যুদ্ধে বীরত্ব, চমৎকার সমরকৌশল এবং শত্রুর অন্তরে ভয় সঞ্চারের ব্যতিক্রম সক্ষমতার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করি, তবে এ যুদ্ধে ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদানকেও কোনোভাবে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই—তার দৃঢ়তা, ধৈর্য, কষ্টকর পরিস্থিতি সহ্য করার ইচ্ছা, আল্লাহর উপর নির্ভেজাল বিশ্বাস এবং শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও অনবরত যুদ্ধ করে যাওয়ার দৃঢ় মনোবল সবই প্রশংসার দাবি রাখে।

ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু এত সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করেছেন যা হঠাৎ করেই তৈরি হয়নি। তিনি ছিলেন মুহাজিরীনদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী, কুরাইশ গোত্রের একজন সর্দার যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তার মহানুভবতা এবং সহজ-সরল চরিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং গভর্নরের দায়িত্ব পালনকালেও তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাপতিদের একজন ছিলেন এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সম্মুখ ফ্রন্টে লড়াই করেছিলেন। ইরাক ও শামের সীমান্ত-মধ্যবর্তী অঞ্চল বিজয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পুনঃনিয়োগ দেন। কিন্তু অন্যত্র তার প্রয়োজন বেশি হওয়ায় এ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। মূলত আরও বিদেশি ভূখণ্ড বিজয়ের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য গভর্নরের পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

৯। হুসাইদের যুদ্ধ

অনেকগুলো ঘটনার কারণে হুসাইদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি সিদ্ধান্ত। তিনি আকরা ইবনে হাবিস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আশ্বারে ফেরত পাঠান। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু আকরা ইবনে হাবিসের সঙ্গে যাননি, এজন্য মুশরিক আরবরা আশ্বারকে অরক্ষিত মনে করে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা আশ্বার আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। সর্বোপরি তারা চিন্তা করে যে, তাদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এখন নাগালের বাইরে অবস্থান করছে—দাওমাতুল জান্দালে।

তারপর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে। সব ঘটনাই হুসাইদের যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। এ এলাকায় মুশরিক আরবরা স্থানীয় পার্সিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হয়। তারা একসঙ্গে উক্কাহর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। মিত্রদের আহবানে পারসিক নেতা রায়মাহার এবং রউযাবাহ বাগদাদ থেকে আশ্মারের দিকে রওনা হয়। কিন্তু আশ্মারে পৌঁছার পথে তারা হুসাইদ এবং খানাকিস এলাকায় আরব মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। তাদের এ পরিকল্পনার খবর আশ্মারে সদ্যনিয়োজিত মুসলিম নেতা যাবারকান রায়িয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি দ্রুত হীরার দায়িত্বে নিয়োজিত কা'কা ইবনে আমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর নিকট সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। কা'কা সংবাদ পেয়েই আ'বাদ ইবনে ফাদাকী আস-সাদীকে হুসাইদ এলাকায় এবং উরওয়া ইবনে আবিল জা'দ আল-বারিকীকে খানাকিস অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে খালিদ রায়িয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, হুসাইদে রউযাবাহর বাহিনীর সঙ্গে অনেক গোত্র এসে মিলিত হতে আকাজ্জা করছে। তিনি এ বাহিনীকে শক্তিশালী হওয়ার আগেই ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইলেন। এজন্য শত্রুদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার আগেই খালিদ রায়িয়াল্লাহু আনহু তাদের আক্রমণ করতে চাইলেন এবং তিনি হাসীদে শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে সক্ষম হলেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি কা'কা রায়িয়াল্লাহু আনহুকে হুসাইদের সামরিক অধিনায়ক নিয়োজিত করেন; অধিকন্তু হীরার দায়িত্ব বুঝে নিতে ইয়ায রায়িয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেন।

মুসলমানরা যেমন শত্রুদের সমর পরিকল্পনার জানার চেষ্টা করত, তেমনি শত্রুরাও মুসলমানদের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। এভাবে রউযাবাহ জানতে পারে যে, কা'কা রায়িয়াল্লাহু আনহু তার দিকে এগিয়ে আসছে; তখন সে রায়মাহার সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে রায়মাহার দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে রউযাবাহর সাথে মিলিত হয়। এখন মুসলমানগণ এবং মুশরিকরা উভয়েই তাদের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দু-বাহিনী হুসাইদে এসে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মুসলমানরা যদিও উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হয়, তবু তারা বিজয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং মুশরিকদের

উভয় নেতাকে হত্যা করে। মুসলমানগণ এ যুদ্ধেও অনেক গনীমতের মাল লাভ করে।

১০। মুসাইয়্যাখের যুদ্ধ

হুসাইদে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ অবগত হয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিভিন্ন সেনাপতিদের মুসাইয়্যাখ নামক স্থানে একত্রিত হতে আদেশ দেন। মুসাইয়্যাখ এলাকাটি হুরানের নিকটবর্তী। মুসলমানদের কয়েকটি বাহিনী এখানে মিলিত হওয়ার পর তারা বিভিন্ন গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। তিন দিক থেকে আক্রমণ পরিচালিত করে তারা স্থানীয়দের বিরাট ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়।^{১৯৩}

এ ঘটনার কিছুদিন পরই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লক্ষ করেন যে, মুশরিকদের বিভিন্ন গোত্র দু-টি জায়গায় এসে প্রতিরোধের জন্য সমবেত হচ্ছে : রাক্কা এলাকার নিকটবর্তী আস্‌সানী এবং যুমাইলে। শত্রুদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয় স্থানেই একসঙ্গে আক্রমণ করে শত্রুদের পরাজিত করেন।^{১৯৪}

আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, এই যুদ্ধের সময় আমরা জনৈক ব্যক্তির কাছে যাই। তার নাম হারকুস ইবনুল নুমান আন-নামিরী। তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী তাকে ঘিরে বসেছিল। তার সম্মুখে ছিল একটি বড় পেয়ালা-ভর্তি মদ। কিন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, ওদিকে খালিদের সৈন্যবাহিনী আসছে। এ অবস্থায় কেউ মদ পান করতে পারে? উত্তরে হারকুস তাদের বলল, ‘তোমরা এই শেষবারের মতো পান কর। কেননা, আমার বিশ্বাস এরপর আর মদ পান করার সুযোগ পাবে না।’ ইত্যবসরে কিছু মুসলিম সৈন্য সেখানে পৌঁছে যায়। একজন হারকুসকে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে মদের সেই পেয়ালার উপর পড়ে যায়। তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে বন্দী করে আনা হয়।^{১৯৫}

^{১৯৩}আবু বকর আস-সিদ্বীক, খালিদ জিনাবী এবং নিহার হাদিসী (পৃ. ৫৫)।

^{১৯৪}তারিখ আত-তাবারি (৪/১৯৯, ২০০)।

^{১৯৫}তারিখ আত-তাবারি (৪/১৯৯)।

এই যুদ্ধে এমন দুই ব্যক্তি মারা যায়, যারা ইতিপূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছিল এবং তাদের কাছে খলীফার নিরাপত্তামূলক পত্রও ছিল। আর এ পত্র ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকেই। কিন্তু মুসলমানরা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। খলীফার নিকট এ সংবাদ গেলে তিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং নিহত দুই মুসলমানের সম্মানদের রক্তপণ দিয়ে সম্বলিত করার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নির্দেশ দেন। একইসাথে তিনি অমুসলিমদের সঙ্গে বসবাসরত মুসলিমদের প্রতি পরিকার বার্তাও পাঠান, বিশেষ করে ঐসব অমুসলিমদের সঙ্গে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তিনি বলেন, ‘মুসলমান হয়েও যারা মুশরিকদের সাথে একই জায়গায় বসবাস করে, তাদের অবস্থা এ রকমই হয়।’ ভিন্নভাবে বলা যায়, এই দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে মুসলমানরা কোনো অপরাধ করেননি— কারণ, তারা জানতেনই না যে, তারা মুসলমান—কিন্তু এটা ঐ দুই মুসলমান ব্যক্তিরই দোষ যে তারা শত্রুর ভূখণ্ডে বসবাস করছিলেন।

১১। ফিরাযের যুদ্ধ

ইরাকে বিভিন্ন আরব গোত্র বিজয়ের পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিরাযের দিকে দৃষ্টি দেন। এটা ছিল সামরিক কৌশলগত কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি সিরিয়া, ইরাক এবং জাযীরাতুল আরবের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। এ অঞ্চল বিজয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম সৈন্যবাহিনী যখন পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে, তখন তারা যেন পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুর কোনো আক্রমণের মুখোমুখি না হন।

ফিরাযে জমা হয়ে মুসলমানরা রোমানদের ক্রোধকে উৎসাহিত করে। রোমসম্রাট যখন জানতে পারল যে, খালিদ তাদের দেশের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছেন, তখন তারা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা যে কোনো উপায়ে মুসলমানদের গতিরোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রথমেই তারা একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারস্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। এ আহবানে পারস্যরা কোনো দ্বিধা করেনি। কারণ, তারাও তাদের সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের সমুচিত শিক্ষা দিতে উদগ্রীব ছিল। মুসলমানদের অবস্থা আরও কঠিন করার জন্য রোম ও পারস্যরা বিভিন্ন আরব গোত্রের নিকট সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠায়, যেমন, তাগলিব,

ইয়াদ ও তামার। আরব গোত্ররা পার্সিয়ানদের মতোই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে উৎসাহী ছিল, কারণ তারা মুসলমানদের হাতে তাদের নেতার মৃত্যুর কথা এখনও ভুলে যায়নি। এত বেশি শত্রুবাহিনী এ যুদ্ধে সমবেত হতে থাকে যে, মুসলমানগণ প্রথমবারের মতো এক বিশাল বাহিনী মোকাবেলা করতে যাচ্ছে যেখানে ছিল পারস্য সেনা, রোমান সৈন্য, পূর্ব সাম্রাজ্য, পশ্চিম সাম্রাজ্য এবং বিভিন্ন আরব গোত্রসহ রোম ও পারস্যের প্রতি নমনীয় অন্যান্য গোত্রের সদস্য।

শত্রুর বিশাল বাহিনী দেখে মুসলমানরা সামান্য বিচলিত হননি। ইউফ্রেটিস নদীর দুই তীরে দু-বাহিনী জমা হলে, রোমানরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, ‘হয় তোমরা নদীর পার হয়ে এপারে এসো, না হয় আমরা নদী পার হয়ে তোমাদের দিকে আসি।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তোমরা নদী পার হয়ে এপারে এসো।’ তখন তারা বলল, ‘তাহলে তোমরা এক পাশে সরে যাও। আমাদের নির্বিঘ্নে নদী পার হতে দাও।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমরা তা করব না। বরং আমরা যেখানে আছি, সেদিক দিয়েই তোমরা নদী পার হও।’

নদী পার হওয়ার আগে শত্রুবাহিনীর নেতারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে লড়াই করা ঠিক হচ্ছে কি না। তাদের একজন বলল, ‘সে এমন একজন মানুষ যে তার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে; তারপরে সে আবার বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। এখানেও আমরা সম্ভবত পরাজিত হব এবং সে জয়ী হবে।’ পরিশেষে এসব কথা যেন বধিরদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছিল! অনেক মানুষ প্রতিশোধ-স্পৃহায় মরিয়া ছিল এবং তাদের নেতাদের কথায় আরও উজ্জীবিত হয়ে নদী পার হয়ে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। রোম-পারস্য-আরব যোদ্ধারা যে স্পৃহা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর কাছে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ যুদ্ধে একজন মুজাহিদই অনেক শত্রুকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে তারা শত্রুদের অন্তরাত্মায় ভীতি কঠিনভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিন এক লাখ মুশরিক সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে বিজয়ের পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিরায়ে দশ দিন অবস্থান করেন এবং তারপর হীরায়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী ১২ সালের যিলক্বদ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা এর আগে অনেক যুদ্ধেই বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু এটি ছিল ব্যতিক্রম : এখানে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন : রোমান, পারস্য এবং আরব। নিশ্চিতভাবেই ফিরাযের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় যদিও এটা ঐ সময় সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধের মতো প্রসিদ্ধ নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ যুদ্ধ পরাজিত তিনটি শত্রুপক্ষের মনোবলকে একদম ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। আবার এটিই ইরাকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ যুদ্ধ ছিল। অন্য দুই পক্ষের চেয়ে পার্সিয়ানরাই মানসিকভাবে বেশি আঘাত পায়—এমন আঘাত যা তারা আর উত্তরণ করতে পারেনি। এ যুদ্ধের পর পার্সিয়ানরা বিশাল কোনো বাহিনী জমা করতে পারেনি যা মুসলমানদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। সুতরাং উপরোল্লিখিত কারণে ফিরায যুদ্ধ ইরাকে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে আছে।

তৃতীয়। খালিদ রা.-এর হজ্জ; আবু বকর রা. কর্তৃক তাকে শামে যাওয়ার আদেশ প্রদান; এরং ইরাকে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মুসান্না রা.-কে নিয়োগ

১। খালিদ রা.-এর হজ্জের সফর ১২ হিজরীতে; এবং আবু বকর রা. তাকে শামে যাওয়ার আদেশ দেন

যিলক্বদ মাসের আর পাঁচ দিন বাকি। ফুরাদের দশদিন অবস্থান করার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে হীরায় ফেরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ বাহিনীকে আসিম ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং পশ্চাতের বাহিনীকে শারজাহ ইবনে আ'য রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ন্যস্ত করলেন। সবার মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ বাহিনীর সঙ্গেই সফর করবেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট কয়েকজন সেনাপতিকে অবহিত করে গোপনে তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে যান। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে,

তিনি এমন এক পথে মক্কা রওনা হলেন যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। নিজ সৈন্যদের খবর না দেওয়া এবং অপ্রকাশ্য পথ অবলম্বন করার পেছনে সম্ভবত এই কারণ ছিল যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইরাক ত্যাগ করার ঘটনা শত্রুরা যেন টের না পায়।

১২ হিজরীর হজ্জ শুরু হওয়ার আগেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় পৌছতে সক্ষম হন। তিনি অন্যান্য হাজীদের সঙ্গে হজ্জ সমাধা করে আবার নিজ বাহিনী হীরায পৌছার আগেই তাদের সঙ্গে মিলিত হন। হাজীরা মদীনায় ফিরে আসার পরই কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই হজ্জ করার ঘটনা জানতে পারেন। অনেক হাজী এসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন যে, তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় দেখেছেন। অনুমতি ছাড়া এ হজ্জ করায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু এমনিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যক্তিগতভাবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি কেবল সন্তুষ্টই ছিলেন না, বরং ইরাকে তার অবিস্মরণীয় বিজয়ের জন্যও গর্বিত ছিলেন। সুতরাং সামান্য কয়েকটি কথাই তার জন্য বলা যথেষ্ট ছিল। তিনি কেবল তাকে বলে পাঠালেন যে, তার হজ্জের জন্য অনুমতি নেয়া জরুরি ছিল। কারণ, তার অনুপস্থিতিতে ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ মিশন বাধাগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। এখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যত্র প্রেরণের সময় হয়েছে। সেখানেই তার উপস্থিতি বড় বেশি প্রয়োজন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে শামে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আদেশ দিলেন। চিঠিতে যা ছিল, তার সারসংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো :

- আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের দিকে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার হাতে এবং তার নেতৃত্বে মুসলমানদের শাম বিজয়ের তাওফীক নসীব করবেন।

- আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার অনুমতি ছাড়া নিজ বাহিনীকে ত্যাগ করার জন্য তিরস্কার করেন এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করেন।

- দুনিয়ার কোনো লাভের জন্য নয়, বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অধিক পরিশ্রমের ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উৎসাহিত করেন।
- আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রাপ্ত বিজয় ও সাফল্যের জন্য অহংকারী অথবা ঔদ্ধত্যকারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেন; একইভাবে তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে এ বোধ থেকেও তাকে সতর্ক করেন। মূলত আল্লাহই বান্দাদের তার ইবাদতের তাওফীক নসীব করেন।

ইরাকে মুসলিম সামরিক বাহিনীর অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের সকল দিকই প্রশংসাযোগ্য : খুবই কম (যদিও বা থাকে) কৌশলগত ত্রুটি, সাহসী লড়াই, দক্ষ সামরিক পদক্ষেপ, বিজ্ঞ যুদ্ধকৌশল, শত্রুর গোপন ও কার্যকরী তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিটি পরিকল্পনাই অত্যন্ত সফল ও দক্ষভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়া। সংক্ষেপে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনীর ভূমিকাকে এ কথায় প্রায় ত্রুটিহীন বলা যায়। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর নতুন দায়িত্ব অর্পিত হয়—শাম দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

ইরাক অভিযানের পূর্বে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ছিলেন একজন পারদর্শী সামরিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ইরাকে বহু যুদ্ধ করার পর তিনি যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন, তাতে তিনি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি দক্ষ ও অনন্য সামরিক অধিনায়কে পরিণত হন। এটা কেবল তার সমসাময়িক যুগের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না, বরং অনাগত ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের জন্যও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এখন এখানকার মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য একজন সামগ্রিক অধিনায়ক নিয়োগ প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যার নাম উচ্চারিত হলো, তিনি হলেন মুসান্না ইবনে হারিসা শাইবানী রাযিয়াল্লাহু আনহু। এটা খুব যুক্তিসঙ্গতও ছিল। বিশেষ করে ইরাকের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান এবং অত্র এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পারস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি। এমনকি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু

সেনাপতি থাকাকালেও মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন বীর যোদ্ধা, সমরবিদ এবং নির্ভরযোগ্য সেনাপতি হিসেবে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ইরাকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেশিরভাগ রণ-কৌশল অকস্মাৎ আক্রমণের উপর নির্ভরশীল ছিল; এজন্য শত্রুর গতিবিধি জানার জন্য তার নির্ভরযোগ্য এবং পারদর্শী সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে যে ব্যক্তির উপর তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন, তিনি ছিলেন মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু।



দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু বকর রা.-এর শাম দেশ বিজয় (সিরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ)

শাম দেশের কিছু এলাকা রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং বাকি এলাকায় আরবরা বসবাস করত। আরবরা যদিও রোমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তবু তারা রোমান বাদশার অধীন এবং তার নিকট জবাবদিহিতায় আবদ্ধ ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়, যদিও তার মূল লক্ষ্য ছিল আরব উপত্যকায় ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা, তারপরেও তিনি শাম দেশকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এজন্য তিনি রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। একইভাবে তিনি শাম দেশের আরেকটি এলাকা বালাকায় বসবাসরত গাস্‌সান গোত্রের বাদশা হারিস ইবনে আবু শাম্মার গাস্‌সানীর নিকটও পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হারিস ছিল আরবদের জন্য রোমানসম্রাটের প্রতিনিধি। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র পাঠ করে অহংকার আর ঔদ্ধত্যে জ্বলে ওঠে। এমনকি সে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু রোমান সম্রাটের নিষেধাজ্ঞার কারণে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামের উদ্দেশে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এ বাহিনীর জন্য তিনি একজন নয়, বরং তিনজন সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন; যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তখন সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। বাস্তবে

তিনজনই শহীদ হয়ে যান। তখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দায়িত্ব নেন। তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাথে মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসেন। সত্যিকার অর্থে শত্রুবাহিনীর তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। এ পরিস্থিতিতে তিনি সফলভাবে পিছু হটে শত্রুর উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন।

যদিও এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারেননি, কিন্তু এটাই ছিল রোমানদের ধ্বংস করার প্রথম পদক্ষেপ—পুরো রোম সাম্রাজ্য না হলেও তাদের অধীনস্থ শাম দেশের একটি অংশ অবশ্যই। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব উপত্যকা ও শাম দেশের আরবদের প্রতি পরিকার বার্তা পাঠিয়েছেন : রোমান সাম্রাজ্য শক্তিশালী হলেও অবিনাশী নয়।

পরবর্তীতে শাম বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এক অভিযান পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটা ‘তাবুকের অভিযান’ হিসেবে বিখ্যাত। মুসলিম বাহিনী এবং রোমানদের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন সংঘর্ষ ও সংঘাত থেকে মুসলমানগণ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে—বিশেষ করে রোমানদের যুদ্ধকৌশল এবং তাদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে। একইভাবে এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শাম দেশের জনগণও ইসলাম ধর্ম ও তার শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। ফলশ্রুতিতে তাদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতকালে রাসূল যেখানে যা রেখে গিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেকেই শুরু করেন। প্রথমে তিনি শামের দিকে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী প্রেরণ করেন এবং একইভাবে আরও অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি করে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদের শাম দেশের উঁচু ভূমিতে অগ্রসর হতে বলেন। তারপর তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ‘তাইমায়’ অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীকে সামরিক সাহায্য দিতে বলেন। সেখানেই তাকে অবস্থান করতে বলেন এবং শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হলে নিজ থেকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার এলাকায় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতি টের পেয়ে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন যার সব সৈন্যই ছিল আরব এবং তারা সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল। এসব আরব বহরা, সালেহ, কালব, লাখম, জুযাম এবং গাসসান গোত্রভুক্ত ছিল। পশ্চাদপসরণের পরিবর্তে তিনি এ আরব বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলেন। শত্রুবাহিনীর সব গোত্র কেবল নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ বিজয়ের খবর অবগত হন, তখন তিনি তাকে চিঠির মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে রোমান সম্রাটের শক্তিশালী বাহিনীর নিকটবর্তী হতে আদেশ দেন যাতে শত্রুবাহিনী প্রস্তুতির সময় না পায়।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যে পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সে পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (যেন প্রয়োজনে পেছনে ফিরে আসা সম্ভব হয়) এবং শত্রুভূমির বেশি ভেতরে প্রবেশ না করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দেন। রোমীয়দের বিশাল বাহিনীর কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বাঙ্গিক শক্তি প্রয়োগ করে একবারে আক্রমণ করার চেয়ে ধীরে ধীরে শত্রুভূমির অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। রোম বিজয় করার জন্য হয়তো এক বাহিনীর পর আরেক বাহিনীকে প্রেরণ করতে হবে; অধিকন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল ধৈর্য এবং এটা অনুধাবন করা যে, একদিনে রোমসাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি, রোম সম্রাটকে একদিনে পরাজিত করাও সম্ভব নয়, এমনকি হয়তো কয়েক সপ্তাহেও সম্ভব হবে না। এখানে সময় প্রয়োজন। ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং দূরদর্শী ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রুভূমির বেশি ভেতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হতেই লাগলেন। খলীফা তাকে এটাও বলেছিলেন যে, ‘খবরদার কখনও শত্রুদের উপর আগে আক্রমণ করো না। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে থেকো।’

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে লোহিত সাগর তীরবর্তী এলাকা ‘কাস্তাল’ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার বাহিনী পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকায় সংঘটিত যুদ্ধে রোমক বাহিনীর একটি দলকে

পরাজিত করে। তিনি আরও সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। একপর্যায়ে রোমানরা সতর্ক হয়ে ওঠে। তারা তায়মায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী থেকে আরও বড় এক বাহিনী গড়ে তোলে।

রোমান সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য এবং ক্রমবর্ধমানতা দেখে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন পাঠান। অধিক সেনা নিয়েই কেবল তিনি রোমসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আক্রমণ করার ঝুঁকি নিতে পারেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার সাহায্যে আরও দু-টি বাহিনী শামের দিকে প্রেরণ করেন : প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যটির নেতৃত্বে ছিলেন ওলীদ ইবনে উকবা রাযিয়াল্লাহু আনহু। যখন এই দু-টি দল শামে পৌঁছায়, তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের আক্রমণ করার আদেশ দেন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী করা সম্ভব হয়নি। রোমান সৈন্যদের সেনাপতি মাহান একজন অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞ। দ্রুত আক্রমণ না করে সে মুসলমানদের তার ভূখণ্ডে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয় যাতে মুসলমানরা যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ইত্যবসরে সে অতর্কিতে প্রতিআক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এভাবে সে মুসলমানদের ফাঁদে ফেলে এবং তাদের ফিরে যাওয়ার পথ সংকুচিত করে তোলে। প্রতীক্ষিত সুযোগ এলে সে তার লোকজনকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শানাতে বলে এবং সে তার কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভ করে। রোমানদের আরেকটি দল মাহানের নেতৃত্বে পুরো মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে রাখে। তারপর তারা মুসলিম বাহিনীর সব সদস্যকে হত্যা করে। এতে খালিদ ইবনে সাইদের ছেলে সাইদ ইবনে খালিদ ইবনে সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও শাহাদাতবরণ করেন। কিছুক্ষণ পরে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পেলেও তার কিছুই করার ছিল না। কারণ, তিনি মুসলমানদের আরেকটি দলের সাথে ছিলেন এবং তিনিও শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি এবং তার বাহিনীর সদস্যদের যারা অশ্বারোহী ছিলেন, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ইকরিমা অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পিছিয়ে এসে কৌশলে শামের সীমান্ত এলাকায় ফিরে আসেন।

প্রথম। রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পথ উন্মোচন এবং এ পথে উৎসাহ-উদ্দীপনা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম আক্রমণ করার চিন্তায় বিভোর ছিলেন। আর এর যৌক্তিক কারণও ছিল। শাম দেশ রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব-বাহু হিসেবে বিবেচিত হতো। ইতিমধ্যে আরব উপত্যকায় সব গোত্রই ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণে ইয়েমেনের অবস্থাও শান্ত হয়েছে। এখন বহির্বিপক্ষে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। এর মানে ইরাকে পারস্যের সম্রাট এবং শাম দেশ ও তার মিত্রদের উপর আক্রমণ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু শাম দেশ বিজয়ে খলীফার ইচ্ছা বাস্তবায়ন সহজসাধ্য কোনো বিষয় ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন কৌশলী ও সাহসী পরিকল্পনা, বিশাল রসদভাণ্ডার সংগ্রহ, দৃঢ় মনোবল এবং সর্বোপরি দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করার ধৈর্যধারণ করার মানসিকতার কোনো বিকল্প ছিল না। তিনি কোনো ক্ষুদ্র বাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলেন না, বরং তিনি বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি, রোমান সম্রাট, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম দেশে যুদ্ধকৌশল নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একজন অবিসংবাদিত কমান্ডার গুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি কি নিজেই নিজের সাথে তর্ক করছেন যে, শামে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবেন কি করবেন না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ.. তবে আমি তো কাউকে এ বিষয়ে আমার এ চিন্তা-ভাবনার কথা বলিনি! তুমি নিশ্চয়ই জেনেশুনেই আমাকে এ প্রশ্ন করেছ।’ গুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ. হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি কিছু একটা দেখেছি। আমি ‘দেখেছি’ মানে স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম আপনি লোকজনসহ একটি অমসৃণ এবং অসমতল গিরিপথে হাঁটছেন এবং পাহাড়ের খুব উঁচুতে চূড়ায় উঠার আগ পর্যন্ত হাঁটতেই থাকলেন। আপনি উপর থেকে মানুষজনকে দেখলেন এবং আপনার সাথে আপনার সঙ্গী-সাথীরা ছিল।

তারপর আপনি পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি উর্বর, সমতল ভূমিতে নামলেন—ঐ ভূমি মাঠ, গ্রাম এবং দুর্গবেষ্টিত ছিল। আপনি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আল্লাহর শত্রুদের আক্রমণ কর এবং আমি তোমাদের বিজয় ও গণীমতের মালের ওয়াদা করছি।’ আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম এবং আমার নিকট ছিল পতাকা। আমি পতাকা নিয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করি এবং তারা আমার কাছে নিরাপত্তা চায় এবং আমি তাদের নিরাপত্তা দিই। তারপর আমি আপনার কাছে ফিরে দেখি আপনি একটি বিশাল দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে বিজয় দান করলেন এবং লোকেরা (দুর্গের অভ্যন্তরে) আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করল। আল্লাহ তা’আলা তখন আপনাকে একটি কুরসি দান করলেন এবং আপনি তাতে বসলেন। তারপর কেউ একজন আপনাকে বলল, ‘আল্লাহ আপনাকে জয়যুক্ত করেছেন এবং আপনার নিকট সাহায্য এসেছে, তাই আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং তার অনুগত হোন।’ ঐ একই লোক একটি আয়াত তিলাওয়াত করল,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।^{১১৬}

শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তারপর আমি জেগে উঠি।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি (স্বপ্নে) কিছু ভালো জিনিস দেখেছ এবং (তোমার এই দেখার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে) ভালো কিছু সংঘটিত হবে।’ তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘(তোমার স্বপ্নে) তোমাকে বিজয়ের শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং একইসাথে আমার মৃত্যুসংবাদও দেয়া হয়েছে।’ এ কথা বলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখ থেকে কান্না ঝরে পড়ে। তারপর তিনি বলেন, ‘তুমি যে অমসৃণ এবং অসমতল গিরিপথে আমাদের হাঁটতে দেখেছ এবং যেখান থেকে আমি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছি, যেখান থেকে আমি লোকজনকে

উপর থেকে দেখেছি—এর মানে আমরা অনেক বেশি কষ্ট এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব এবং একই সাথে শত্রুরাও একই অবস্থার সম্মুখীন হবে। পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ মানে আমরা শত্রুর উপর বিজয়ী হব এবং আমাদের নেতৃত্বই প্রভাব বিস্তার করবে। পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঠ, গ্রাম এবং দুর্গবেষ্টিত উর্বর, সমতল ভূমিতে নেমে আসা মানে আমাদের ফল-ফসলাদি উৎপাদন, জীবন-ধারণ ও অবস্থা আগের তুলনায় সহজ হবে। আর আমি যে বলেছি, ‘আল্লাহর শত্রুদের আক্রমণ কর এবং আমি তোমাদের বিজয় ও গণীমতের মালের ওয়াদা করছি’—এর মাধ্যমে মুসলমানরা মুশরিকদের ভূখণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছবে। আমি তাদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করব এবং আমি তাদের জিহাদের পুরস্কার ও গণীমতের মালের কথা মনে করিয়ে দেব। তারপর তারা আমার কথা অনুসরণ করবে। তুমি তোমার হাতে যে পতাকা দেখেছ, যা বহন করে তুমি গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে তাতে প্রবেশ করেছ, তারপর তারা তোমার কাছে নিরাপত্তা চাইলে তুমি তার নিশ্চয়তা দিয়েছ—এগুলো সবকিছুই এ বিজয়ে একজন মুসলিম কমান্ডার হিসেবে (শাম বিজয়ে) তোমার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং আল্লাহ তোমার হাতেই বিজয় দান করবেন। আমার হাতে যে দুর্গসমূহের পতন দেখেছ, এগুলো হচ্ছে ঐসব এলাকা যেগুলোর উপর আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করবেন। আর আমাকে যে চেয়ারের উপর বসা দেখেছ, এর মানে আল্লাহ আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং মুশরিকদের পতন ঘটাবেন। আল্লাহ বলেন,

وَرَفَعَ أَبْوِيَهُ عَلَى الْعَرْشِ

এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন।^{১৯৭}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেই চললেন, ‘যে ব্যক্তি আমাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে আদেশ দিচ্ছিল এবং কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছিল, সত্যিকার অর্থে সে আমার আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছিল। এই একই সূরা যখন আল্লাহ তা’আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করলেন, তখন এর মাধ্যমে তার আসন্ন মৃত্যুর কথাই ঘোষণা করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও (সূরা নসর থেকে) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকে আসন্ন মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘অবশ্যই আমি সৎ কাজের আদেশ দেব এবং মন্দ কাজ প্রতিহত করব। যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হব এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, আমি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করব। তারা দুনিয়ার যেকোনো ঠাকুর না কেন—পূর্বে অথবা পশ্চিমে, আমি তাদের সাথে লড়াই যতক্ষণ না তারা কালিমা পড়বে অথবা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হবে। এটাই আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত। (আমিও তা-ই করব) যাতে আল্লাহ তা’আলা আমাকে যখন মৃত্যুদান করবেন, তখন তিনি আমাকে দুর্বলতা ও অলসতায় দেখবেন না (মুশরিকদের সাথে আমার আচরণে) এবং তিনি আমাকে মুজাহিদদের সামান্য পুরস্কারের আশায় ব্যাপ্ত দেখবেন না।’^{১৯৮}

এ ঘটনায় গুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেখা একটি ভালো স্বপ্নের কথা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং এটা এমন একধরনের স্বপ্ন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ:
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

নবুওয়াত প্রক্রিয়ার কিছুই বাকি থাকবে না, কেবল শুভ সংবাদ ছাড়া।’ সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ শুভ সংবাদগুলো কী?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, ‘ভালো (এবং সত্য) স্বপ্ন।’

নবুওয়াতের জীবনে বিভিন্নভাবে অহী নাযিল হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভালো এবং সত্য স্বপ্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তত একবার স্বপ্নে যা যেভাবে ঘটেছে বাস্তবে তা কিভাবে ঘটবে, তার বিবরণ দিয়েছেন। উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে অহী নাযিলের সব দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে তবে কেবল সত্য স্বপ্ন ছাড়া। একজন নেককার বান্দা যদিও আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অহী লাভ করতে সক্ষম নন যেভাবে

^{১৯৮} তারিখ দামেস্ত, ইবনে আসকির (২/৬১-৬২); ফতেহ আশ-শাম, আজাদী (পৃ. ১৪); তারিখুল ইসলাম, হুমাইদি (৯/১৭৯)।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম অহী নিয়ে নাযিল হতেন, যদি আল্লাহ চান তাহলে তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে পারেন যেমন করে গুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বর্ণনা করেছেন।

স্বপ্ন এমন একসময়ে এল যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণের সিদ্ধান্তকে কল্পনা থেকে বাস্তবে পরিণত করতে অতিরিক্ত মনোবলের প্রয়োজন ছিল। তার অন্তর এখন তৈরি এবং নিশ্চিতভাবেই গুরাহবিলের স্বপ্ন বাস্তব হতে যাচ্ছে—আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে তিনি রাসূলের সুন্নাতকেই অনুসরণ করলেন। তিনি তার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন। রোম সাম্রাজ্য আক্রমণে তাদের অভিমত জানার চেষ্টা করলেন।

দ্বিতীয়। উপদেষ্টাদের সঙ্গে আবু বকর রা.-এর পরামর্শ এবং তারপর ইয়েমেনবাসীকে যুদ্ধে যোগদানের আদেশ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টাদের ডাকলেন। তাদের মধ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা ইবনে যাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে অন্যান্য সেনাপতিবৃন্দসহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ডাকলেন। এসব মহান সাহাবীদের উপস্থিতিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্য শুরু করলেন, ‘আল্লাহ মহা বরকতময়, মহা সম্মানিত এবং তার দয়া ও অনুগ্রহ এত বিশাল যে, তা পরিমাপ করে শেষ করা যাবে না। তার দয়ার তুলনায় কোনো আমলই যথেষ্ট নয়। তার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি তোমাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তোমাদের হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি তোমাদের নিকট থেকে শয়তানের প্ররোচনাকে প্রতিহত করেছেন; তোমাদের শিরকে লিপ্ত করতে অথবা এক আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে ইলাহ

হিসেবে গ্রহণে উদ্ধৃত করতে শয়তানের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আরবরা এখন এক জাতি, একই পিতা-মাতার সন্তান। আমি তোমাদের শাম দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করছি। এ যুদ্ধে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু হবে এবং এটা নেককারদের জন্য বিরাট পওয়া। আর যে কেউ জীবিত থাকবে, সে তার ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই বেঁচে থাকবে। আল্লাহ এটা তার জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন যে, কেউ যদি তার জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে তাকে পরিপূর্ণভাবে পুরস্কৃত করবেন। এটাকেই আমি যথোপযুক্ত কাজ বলে মনে করি। এখন আপনারা আমাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করুন।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়লেন, তারপর বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা নেয়ামত দান করেন (এখানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশেষভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে কথা বলা শুরু করেন)। আল্লাহর শপথ! আমরা যখনই কোনো ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করেছি, আপনি (আবু বকর রা.) সব সময়ই আমাকে পরাজিত করেছেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ করুণা—তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহর শপথ! আপনি যা বললেন, আমিও একই কথা পেশ করার ইচ্ছা নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ তা’আলা আমাকে তা বলতে বিরত রেখেছেন যতক্ষণ না আপনি প্রথমে একই মতামত পেশ করেন। বস্তুত আপনিই সঠিক। আল্লাহ তা’আলা আপনার মাধ্যমে সবাইকে নেক পথে পরিচালিত করুন। তাদের জন্য অশ্বারোহীর পর অশ্বারোহী প্রেরণ করুন, মুজাহিদদের দলের পর দল প্রেরণ করুন, সেনার পর সেনা প্রেরণ করুন। অবশ্যই আল্লাহ তার ধর্মকে বিজয় দান করবেন। তিনি ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মানিত করবেন। তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন।’

তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তারা রোমান, হলুদ রঙের সন্তান। তাদের

রয়েছে ভারী অস্ত্র-সস্ত্র এবং দক্ষ সামরিক বাহিনী। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি না যে, আপনি প্রথমেই অনেক অশ্বারোহী সেখানে প্রেরণ করবেন। এর পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহীদল প্রেরণ করুন। তাদের শত্রুর নিটকবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করতে দিন, শত্রুর ভূখণ্ডে ঢুকে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে ফিরে আসবে। আপনার অশ্বারোহী বাহিনী যখন বারংবার এ রকম আক্রমণ পরিচালনা করবে, তখন তারা শত্রুকে অনেকটাই ঘায়েল করতে পারবে এবং তাদের ভূখণ্ড থেকে গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। ফলে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আরও মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। তারপর আপনি সুদূর ইয়েমেন এবং রাবেআহ ও মুযার গোত্রের লোকদের কাছে বার্তা পাঠাবেন। তাদের আপনার নিকট নিয়ে আসবেন (এবং তাদের শাম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করবেন)। ঐ সময় আপনি যদি চান, তাহলে নিজেই সরাসরি রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেন। অথবা অন্য কাউকে সেনাপতি নিয়োগ করে এ আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেন।’ তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ-রাযিয়াল্লাহু আনহু বসলেন এবং মজলিসের আর কেউ কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণ এ রকম নীরবতার পর যখন কেউ আর মতামত দিতে অগ্রসর হলো না, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলের উদ্দেশে বললেন, ‘আল্লাহ আপনাদের সবার উপর রহম করুন। আপনারা সবাই এ বিষয়ে কী মনে করেন?’

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করলেন, তারপর বললেন, ‘আপনি ইসলামের সর্বদা মঙ্গলচিন্তাই করে থাকেন। আপনি ইসলামের তথ্য মুসলমানদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, কেউ তার বিরোধিতা করবে না। আপনার সিদ্ধান্তের ফলাফল যাই হোক, আমরা সেটাকে দেশের জন্য মঙ্গলজনকই মনে করি। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন।’ তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা ইবনে যাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সাইদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং বাকি সবাই যারা ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, বললেন, ‘উসমান ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি আমাদের যে কোনো আদেশ প্রদান করবেন,

আমরা সর্বান্তঃকরণে তা পালন করে যাব। আমরা আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না, আপনার উপর কোনো দোষারোপও করব না।’ তারপর একে একে সবাই এ রকম উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিতে থাকেন।

ঐ মজলিসে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি পুরো মজলিসে চুপ থাকেন। যখন সবাই তাদের বক্তব্য পেশ করা শেষ করেছে, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে ফিরে বললেন, ‘হে আবুল হাসান, আপনি কী মনে করেন?’

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমি মনে করি আপনার মতামত এবং দৃষ্টিকোণ বরকতময়।’ ‘অবশ্যই আপনি নিজে অথবা আপনার পক্ষ থেকে অন্য যে কেউ এ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিক না কেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহে তো) আপনি জয়ী হবেন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ আপনাকে শুভসংবাদ দান করুন। কিন্তু আপনি এটা কীভাবে জানলেন?’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ نَازَاهُ حَتَّى يَقُومَ الدِّينُ وَأَهْلُهُ

ظَاهِرُونَ

ইসলামের বিরোধিতাকারীদের উপর ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না ইসলাম এবং মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়।”

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ কতই না পরিপূর্ণ! এবং আপনি কতই না সুন্দর কথা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন! বস্তুত আপনার কথা আমাকে আনন্দ দিয়েছে; আল্লাহ তা’আলা আপনাকেও দুনিয়া ও আখিরাতে খুশি করুন।’ তারপর তিনি লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

”” সহীহ বুখারী, কিতাবুল এইতিসাম (৭৩১১); সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমরাহ (১৫৩৩); মুসনাদে আহমাদ (৫/৮৭)।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করে বললেন, ‘হে লোকসকল! আল্লাহ তা’আলা তোমাদের ইসলামে দাখিল করে করুণা করেছেন, জিহাদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তোমাদের এই ধর্মের কারণে অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই হে আল্লাহর বান্দারা প্রস্তুতি গ্রহণ কর—শাম দেশে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি কুঠারাঘাত করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের জন্য কয়েকজন সেনাপতি নিয়োগ করে দিচ্ছি এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা যুদ্ধের পতাকা দিচ্ছি। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতাদের অমান্য করো না। তোমাদের নিয়ত ও কাজকে ঠিক করে নাও এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করো। বস্তুত আল্লাহকে যারা ভয় করে এবং সংকর্মশীল, আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন।’^{২০০} তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করতে বললেন, ‘তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হও—রোমানদের বিরুদ্ধে, শাম দেশে।’^{২০১}

এ ঘটনায় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি জানা যায়। তিনি কোনোভাবেই এককভাবে তার সিদ্ধান্তকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেননি এবং তারপর তিনি তাদের কাছ থেকে তার বাস্তবায়ন আশা করেননি। এর পরিবর্তে তিনি তার বিশুদ্ধ সঙ্গীদের জমা করেছেন, তাদের পরামর্শ চেয়েছেন এবং তারপর সমস্যার সকল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ কর্মপদ্ধতি আসলে রাসূলের সুন্নাতেরই অনুসরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আলোচনা করার সময় আমরা এটা দেখেছি।^{২০২} আমরা যখন উক্ত ঘটনার বিস্তারিত দিক পর্যালোচনা করব, তাহলে আমরা দেখব যে সাহাবীরা আসলে একটি বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করেছেন : তারা সবাই একমত হয়েছেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা। রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য তৈরি হয়নি, বরং কীভাবে

^{২০০} তারিখ দামেস্ক, ইবনে আসকির (২/৬৩-৬৫)।

^{২০১} তারিখ দামেস্ক, ইবনে আসকির (২/৬৪-৬৫)।

^{২০২} এখানে লেখক তার বিখ্যাত সীরাত বিষয়ক বই, দি নোবল লাইফ অব দি প্রফেট ﷺ, এর দিকে ইশারা করেছেন (দারুসসালাম কর্তৃক প্রকাশিত)।

আক্রমণ করা হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত হয়েছে। উমর রাযিয়াল্লাহু এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, শামসীমান্তে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা না পর্যন্ত খলীফার জন্য অশ্বারোহীর পর অশ্বারোহী, দলের পর দল, সেনার পর সেনা প্রেরণ করা উচিত; তাতে মুসলমানরা বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করতে পারবে এবং তাদের পরাজিত করা সহজ হবে। অন্যদিকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রথমে ছোট ছোট দল দিয়ে শত্রুদের অতর্কিতে আক্রমণ করে শাম দেশের অভ্যন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা উচিত। তারা নিকটস্থ শত্রুভূমিতে আক্রমণ করে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। তার মতে, এ রকম বারংবার আক্রমণে কয়েকটি উপকার বয়ে নিয়ে আসবে : শত্রুদের অন্তঃকরণে আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করবে, রোমান সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়বে এবং মুসলিম বাহিনী কেবল গণীমতের মালই লাভ করবে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। পরিশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শকে গ্রহণ করেছেন এবং ইত্যবসরে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শকেও কাজে লাগিয়েছেন। তিনি ইয়েমেনে খবর পাঠিয়েছেন তারা যেন শাম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নিমিত্ত মুজাহিদ প্রেরণ করে।

১। ইয়েমেন অধিবাসীদের যুদ্ধে শরীক হওয়ার আহ্বান

উপরের সমরকৌশল নির্ধারণী পরামর্শসভার পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেন অধিবাসীদের উদ্দেশে চিঠি প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের মধ্যে আগ্রহীদের আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন; অথবা তাদের আসন্ন শাম দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে বললেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, তিনি সব সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্দেশে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করেননি; বরং তিনি তাদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেনা চাইলেন যেন তারা ইয়েমেন থেকে নিজের আগ্রহে যুদ্ধে শরীক হয়। ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, বাজারে এবং জনসভাস্থলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পড়ে শোনানো হয়। চিঠির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর রাসূলের খলীফার পক্ষ থেকে ইয়েমেন অধিবাসী যে কোনো ঈমানদার ও মুসলমানের প্রতি যার কাছে এ চিঠি পঠিত হয়। আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের বলছি যে, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। পরসমাচার এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ করয করেছেন। সংখ্যার প্রাচুর্য এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামের আধিক্য থাকুক বা না থাকুক যে কোনো অবস্থায় ধর্মের শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। আল্লাহ তার বান্দাদের আদেশ করেছেন যে, নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। জিহাদ করয। এর সওয়াব যে কত বেশি তা কেউ অনুমান করতে পারে না। তোমাদের যেসব ভাই আমার সম্মুখে ছিল, সিরিয়ায় জিহাদের আহবান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরাও আমার আহবানে সাড়া দাও এবং আল্লাহ তা'আলার ফরযকৃত জিহাদের প্রতি আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হও। তোমরা তোমাদের নিয়তকে সহীহ করে নাও। তাহলে তোমরা দু-টির যে কোনো একটি নেয়ামত লাভ করবে : হয় শহীদ হবে নতুবা গাজী হয়ে গনীমতের মাল লাভ করবে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমল ছাড়া কেবল কথা দ্বারা খুশি হন না। আমরা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই যাব যতদিন না তারা সত্যের কাছে মাথানত করে এবং কুরআনকে মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দীনকে হেফাজত করুন, অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমলকে দুরন্ত করে দিন এবং যথাযোগ্য পুরস্কার দান করুন তাদের মতো যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও ধৈর্যধারণ করে।^{২০৩}

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রের মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খেলাফতকালে বড় ধরনের যুদ্ধে মুসলমানদের সরাসরি উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়।

ইয়েমেনবাসীর প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, দু-টি উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য জিহাদ করতে হবে: একটি হচ্ছে

^{২০৩} তারিখ কতেব আশ-শাম, আজদী (পৃ. ৮০); তাহযীব তারিখ নামেক (১/১২৯)।

দাবির সত্যতা বা আইনগত বাধ্যবাধকতা। মুসলমানমাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি সম্মুখ নন যে আমল না করে কেবল মুখে ইসলামকে স্বীকার করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি বলেছেন যে, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না তারা ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং কুরআনের আইন মেনে চলে। এ দু-টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইয়েমেনের মুসলমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাকে সাড়া দেন—দশ কিংবা একশ দল নয়, বরং হাজার হাজার দল জিহাদের ডাকে ছুটে আসে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, এ বিপুলসংখ্যক ইয়েমেনবাসী মুজাহিদদের কাউকেই জোরপূর্বক জিহাদে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। ঐতিহাসিক ও হাদীসের কিতাব থেকে এটাই জানা যায় যে, তারা সবাই স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে উত্তরদিকে শাম দেশের দিকে দীর্ঘ পদব্রজে গমন করেছিলেন এবং সঙ্গে তাদের পরিবারও নিয়ে গিয়েছিলেন। সংক্ষেপে, ইয়েমেনবাসীই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাকে সবচেয়ে দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন। এটা তারা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর কালামকে সমুন্নত করার তাগিদেই করেছিলেন।

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, জিহাদের প্রতি ইয়েমেনবাসীকে এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা বিভিন্ন সময় বর্ণনা করেছেন যা হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে তিনি এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে, এক দল থেকে আরেক দলের লোকদের নিকট সফর করেছেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পত্রটি ইয়েমেনের স্থানীয় ভাষায় পড়ে শুনিয়েছেন এবং তাদের মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে বলেছেন, ‘যার কাছেই আমি এ পত্র পাঠ করেছি, সে-ই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বলেছে, আমিও যাব...।’ এটা অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না আমরা যিল-কিলা নামে এক লোকের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। যখন তার কাছে আমি চিঠি পড়ে শোনালাম এবং আমার যা বলার বললাম, তখন তিনি তার ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে ওয়াদা করল এবং তখনই স্বগোত্রের লোকদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন (এবং যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন)। তিনি বিন্দুমাত্র দেরি করেননি : তিনি তখনই দ্রুত একটি তাঁবু তৈরি করতে বলেন এবং আমরা তাকে ও তার লোকজনকে

তাঁর বানানো শেষ করা পর্যন্ত ত্যাগ করিনি (তারা তখনই পরিপূর্ণভাবে শাম দেশের দিকে যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছিল)। তিনি তার লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কথা বলেছিলেন। আর তা হলো, ‘অবশ্যই তোমাদের নেককার ভাই তোমাদের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন এবং এভাবে আল্লাহর কাছ থেকে অশেষ প্রতিদান পাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং যারাই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চান, এখনই আমার সাথে রওনা হন।’^{২০৪}

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু আনুমানিক ১২ হিজরীর ১১ই রযব মদীনাতে ফিরে আসেন। মদীনাতে পৌঁছার পর পরই তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিহাদের প্রতি ইয়েমেনবাসীর অবিশ্বাস্য আগ্রহ ও উৎসাহের কথা বলেন এবং খুব শীঘ্রই তাদের জামাত এসে মদীনাতে পৌঁছবে বলেও জানান। বর্ণনায় এসেছে, তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘অবিন্যস্ত অবয়ব এবং ধূলোয় আচ্ছাদিত একদল মানুষ খুব শীঘ্রই আপনার নিকট এসে হাজির হবে; তারা ইয়েমেনের সাহসী ও বীর সন্তান। তারা তাদের সন্তান, স্ত্রী এবং যাবতীয় সম্পদ নিয়ে আপনার দিকে দৌড়ে আসছে।’^{২০৫} কয়কদিন পরই যিল-কিলা হিময়ার গোত্রভুক্ত তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনাতে এসে হাজির হলো—আনুমানিক ১২ হিজরীর ১৬ই রযব।^{২০৬} এ রকম সানন্দচিত্তে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাকে সাড়া দেয়া কেবল হিময়ার গোত্রের লোকদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, বরং ইয়েমেনের সব এলাকা থেকে যারাই মদীনাতে এসে পৌঁছেছিল, সবাই এ রকমই উৎসাহ-উদ্দীপনায় আপ্লুত ছিল এবং শাম দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য ছিল উদগ্রীব। হামযা ইবনে মালিক হামদানীর নেতৃত্বে হামাদান গোত্রের দু’হাজারের বেশি মুজাহিদ এসেছিল।^{২০৭} ইয়েমেন থেকে আগত সব মুজাহিদ মদীনাতে পৌঁছে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনে আল্লাহর ভয়ে তাদের দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে এবং ঐশ্বিক করুণায় কান্না শুরু করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি

^{২০৪} আল-কামিল, ইবনে আসির (২/৬৪); আল-ইয়েমেন ফি সাদরিল ইসলাম (পৃ. ৩০১-৩০২)।

^{২০৫} আল-ইয়েমেন ফি সাদরিল ইসলাম (পৃ. ৩০২)।

^{২০৬} প্রাপ্ত।

^{২০৭} প্রাপ্ত।

এবং বলেন, ‘আমরা এমনই ছিলাম এবং তারপর আমাদের অন্তঃকরণ
শক্ত হয়ে গিয়েছে।’^{২০৮}

মদীনায় পৌঁছে যিল-কিলা লক্ষ করলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু
একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, হালকা-পাতলা গড়ন, তার চোখগুলো কোটরগত
এবং তিনি খুবই সাধারণ মানের পোশাক পড়ে আছেন। তার পোশাকে
কোথাও দামি মেডেলস, মূল্যবান রত্ন কিংবা কোনো অলংকার নেই; যা
কিছু তিনি পরে আছেন তা সবই খুবই সাধারণ। কেবল তার চেহারাটাই
দীপ্তমান ছিল যাতে তার বিনয় ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছিল। অন্যদিকে যিল-
কিলাও খুব সাধারণ ব্যক্তিই ছিলেন; তবে তার চারিদিকে এক হাজার
গোলাম বেষ্টন করে রেখেছিল এবং তার মাথায় একটি মুকুট ছিল। তার
পোশাক ছিল স্বর্ণের কারুকাজখচিত এবং তাতে ছিল অনেক মূল্যবান
রত্ন। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পোশাক, সারল্য এবং তার
বিনয় দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি শুধু তার নেতাই ছিলেন না, বরং তিনি
ছিলেন পুরো মুসলিম জাতির নেতা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর
সারল্যই তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল এবং তার জীর্ণ বস্ত্র
একজনের মনেও ঘৃণা যা মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তনে উৎসাহিত
করেনি, বরং তার অন্তরে ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্মানবোধের সৃষ্টি করেছিল।
অন্যভাবে বলা যায়, যিল-কিলা একজন গরিব মানুষকে অবলোকন
করেনি, কিন্তু তিনি এমন একজনকে দেখেছেন যে তার বিনয়ের উঁচু
মাত্রায় দীপ্তমান ছিলেন। যিল-কিলা এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন
যে, তিনি তার দেহ থেকে সব অলংকারখচিত পোশাক খুলে ফেলেন
এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুকরণে সাধারণ পোশাক পরিধান
করেন। একই সাথে তার দলের লোকজনও তাকে অনুসরণ করে। এর
কয়েকদিন পর, একবার যিল-কিলাকে মদীনার এক বাজারে দেখা যায়
এবং তার কাঁধে ভেড়ার চামড়ার তৈরি পদমর্যাদাসূচক গাউন ছিল—অন্য
কথায় এমন পোশাক যা নিম্নমানের কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তার
গোত্রের লোকেরা তাকে এ অবস্থায় দেখে খুব হতাশ হলো এবং বলে
উঠল, ‘তুমি মুহাজির ও আনসারদের সামনে এভাবে আবির্ভূত হয়ে
আমাদের অপমানিত করেছ।’ জবাবে যিল-কিলা বললেন, ‘তোমরা কি

চাচ্ছ আমি ইসলামে দাখিল হয়েও জাহিলিয়াতের যুগের মতো স্বৈরশাসকের বেশ ধারণ করি?’ না, আল্লাহর শপথ, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বিনয় ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এ দুনিয়া থেকে খুব সামান্য কিছু নেওয়ার চেষ্টার মধ্যেই তা নিহিত।^{২০৯}

ইয়েমেনের বাদশাও যিল-কিলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল : সবাই তাদের অলংকারখচিত দামি পোশাক খুলে ফেলল এবং এর পরিবর্তে নিম্নমানের কাপড়ে তৈরি সাধারণ পোশাক ক্রয় করল। আর তারা যা কিছু খুলে ফেলল, তা সবই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করল এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা বাইতুল মালে জমা করে দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামের সর্বোত্তম প্রতীক ছিলেন। তার সব আচরণ, কাজ এবং বলা ছিল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আহ্বান। তার বক্তব্যের চেয়ে আচরণই নসীহতের জন্য যথেষ্ট ছিল, অন্যভাবে বলা যায়, লোকেরা তাকে দেখে নিজেদের ভুল চিহ্নিত করত। যারা কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে নসীহত প্রদান করেন তাদের নসীহতই শ্রেষ্ঠ এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ শ্রেণির মধ্যে সর্বোত্তম। ইয়েমেনের শাসনকর্তা যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলেন, আল্লাহর রাসূলের খলীফাকে দেখলেন এবং সারা মুসলিম জাহানের শাসককে দেখলেন যে, তিনি বাজারে হাঁটছেন, জীর্ণ পোশাক পরিধান করে আছেন, তারা জানতেন যে, অলংকারখচিত জামা-কাপড় পড়ার চেয়েও জীবনে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। এসবের মধ্যে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ভালো অন্তঃকরণের অধিকারী হওয়ার চেয়ে বিকল্প কিছু নেই যা দৃঢ় ঈমান এবং বিনয়ের ঔজ্জ্বল্য ছড়াবে। একইসাথে, তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুকরণের চেষ্টা করেছেন এবং তারা দামি অলংকার ও তারকাখচিত পোশাক পরিধান করে খলীফার সামনে হাজির হওয়াতে লজ্জা অনুভব করেছেন। তারা বিনয়ের অভিজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের অন্তরে সূর্যের সামনে তারার আলোর মতো পূর্বকার সব অহংকার-দম্ভ

নিঃশেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর রহম করুন। বস্তুত তিনি বিনয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠত্বে বিনয়ী ছিলেন।

তৃতীয়। আবু বকর রা. কর্তৃক সেনাপতিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা অর্পণ এবং সেনাবাহিনীর যুদ্ধে যাত্রার আদেশ

শাম দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীর চারটি দলের সেনাপতিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা অর্পণ করেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর চারটি দলের বিবরণ নিম্নরূপ :

১। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রা.-এর সেনাবাহিনী

মুসলিম সেনাবাহিনীর এটিই প্রথম দল যেটি শাম দেশের উদ্দেশ্যে প্রথম যাত্রা করবে। তাদের টার্গেট ছিল দামেস্ক পৌছা এবং তা বিজয় করা। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য বাহিনীগুলোকে প্রয়োজনসাপেক্ষে সামরিক সাহায্য এবং রসদ সরবরাহ করা। প্রাথমিকভাবে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও অধিক সৈন্য প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে একসময় তা সাত হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়। যাত্রার প্রাক্কালে ইয়াজিদ বাহিনীকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সমর ও শান্তিতে করণীয় সম্পর্কে নসীহত করেন। ইয়াজিদ বাহিনীকে বিদায় দেয়ার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশাপাশি হাঁটছিলেন। তখন তিনি তাকে বললেন,

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাকে নিয়োগ দিয়েছি : তোমাকে এবং তোমার তেজস্বিতাকে পরখ করার জন্য। যদি তুমি ভালো কর, তাহলে আমি তোমাকে তোমার পদে বহাল রাখব এবং এমনকি আরও অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করব। কিন্তু তুমি যদি যথাযথভাবে তোমার দায়িত্ব

পালন করতে না পার, তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি যেমন তোমার বাইরের আমল ও আচরণকে দেখেন, তেমনি অন্তরের অবস্থাও জানেন। যে যত বেশি আল্লাহর নৈকট্যশীল, অবশ্যই সে তত বেশি তার অনুগত এবং সে কেবলই তার সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি নেক আমল করে। আমি তোমাকে খালিদের দায়িত্ব দিচ্ছি (এখানে খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা বলা হয়েছে যিনি সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা অনুমোদন করেছেন)। সাবধান! জাহিলিয়াতের যুগের আচার-আচরণে ফিরে যেয়ো না। আল্লাহ সেনাবাহিনী ঘৃণা করেন এবং যারা তা অনুসরণ করে, তাদের ও ঘৃণা করেন। তুমি তোমার সেনাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। ভালোভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি কর এবং তাদের আসন্ন বিজয়ের সুসংবাদ দাও। আর তাদের উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন হলে তা স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে দাও। বস্তুত বক্তব্যের দীর্ঘসূত্রিতায় এক অংশ আরেক অংশকে ভুলিয়ে দেয়। নিজেকে সমুন্নত কর এবং এতে সেনারাও নিজেদের উন্নত করতে সচেষ্ট হবে। সময়মতো এবং খুশু-খুয়ুর সাথে নামায আদায় করবে। যদি শত্রুপক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি আসে, তাকে সম্মান করবে এবং সংক্ষীপ্ত সময়ের সাক্ষাতে তাকে বিদায় করবে (যাতে তোমাদের সৈন্যসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য জানতে না পারে)। তুমি যা-ই কর না কেন, তোমার দুর্বল দিক তাদের বুঝতে দিয়ো না। যদি তাদের তা জানার সুযোগ দাও, তাহলে এ জ্ঞান দিয়ে তারা তোমার বিরুদ্ধে কাজ করবে। যখন তারা তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় বসতে দাও (যাতে তুমি তোমার শক্তিমত্তা ও সক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলতে পার)। তোমার সৈন্যদের তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলবে। মূলত তুমি একাই তাদের সাথে কথা বলবে। তাদের সামনে তোমার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করো না; তাহলে তুমি তোমাকেই আঘাত করবে এবং নিজেকে দুর্বল করে ফেলবে। যখন তুমি কারও পরামর্শ চাইবে, সততার সঙ্গে চাইবে এবং তোমাকে এর পরিবর্তে ভালো উপদেশ লাভের সৌভাগ্য দান করা হবে। তোমার পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে মূল তথ্য গোপন করবে না যা তোমার কাছে রয়েছে; তা করলে তুমি শুধু নিজেকে প্রকাশ করবে (নিজের অযোগ্যতাকে তুলে ধরবে)। ভোর রাতে সঙ্গীদের নিয়ে জাগ্রত হবে যেন তারা তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ফলে তোমার এবং তাদের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে তা ডিঙানো সহজ হবে। অনেক পাহারাদার রাখবে এবং তাদের পুরো ক্যাম্পে বিভিন্ন

জায়গায় নিয়োগ করবে। অকস্মাৎ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। যদি কোনো পাহারাদারকে অমনোযোগী দেখে, তাহলে তাকে সতর্ক করবে এবং প্রয়োজনে সীমা অতিক্রম না করে তাকে শাস্তি দেবে। সারারাত ধরে পাহারাদারদের পালাক্রমে বদল করবে এবং প্রথম প্রহর দ্বিতীয় প্রহর থেকে দীর্ঘ করবে। কারণ, প্রথম প্রহর (প্রথম পালা) তুলনামূলক সহজ, এ অনুভূতি জাগ্রত রাখবে যে, এটা দিনের তুলনায় নিকটে (রাত যতই গভীর হবে, ততই দায়িত্বকে কঠিন মনে হবে)। যে শাস্তির যোগ্য, তাকে শাস্তি দিতে ভয় পেও না এবং তোমান সেনাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না। তাদের নিকট অথবা অন্য কারও কাছে তাদের গোপন দোষ প্রকাশ করো না। তারা যা প্রকাশ করে, তার মধ্যেই নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সংযত রাখবে। বোকাদের সঙ্গে বসবে না যারা কেবল কালক্ষেপণ করে; বরং বিশুদ্ধ ও নেককারদের সঙ্গে বসবে। শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ় ও সাহসী থাকবে। কাপুরুষতা অবলম্বন কর না; তাহলে তোমার সেনারাও কাপুরুষ হয়ে যাবে। অবৈধ গনীমতের মাল লাভ করতে চেয়ো না। যদি তা কর, তাহলে তুমি দারিদ্র্যতায় ভুগবে এবং বিজয় থেকে ছিটকে পড়বে। তুমি দেখবে একদল লোক ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের বিরক্ত করবে না এবং তাদের তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে।’

ইবনে আসির বলেন, ‘এটা ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা উপকারী নসীহত যা একজন নেতাকে (গভর্নর অথবা সেনাপতিকে) করা হয়েছিল।’^{২১০}

ইয়াজিদ রা.-এর প্রতি আবু বকর রা.-এর উপদেশ থেকে শিক্ষা ও নৈতিকতা

- ✓ সামাজিক মর্যাদা কিংবা বংশগৌরবের ভিত্তিতে সরকারি পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া উচিত নয় —এমনকি উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেও নয়। কেবল প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতেই মানুষকে সরকারি পদে নিয়োগ দেয়া উচিত। তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়ার পর কেউ তার পদকে দায়িত্বহীন এবং কেবলই মর্যাদার বস্তু মনে করতে পারে না। আবার দায়িত্বকে সামান্য কাজ বিবেচনা করা এবং জবাবদিহিতা থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবাও ঠিক নয়। তার পদকে

সমুন্নত রাখতে তাকে অবশ্যই তার যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে, এটা কেবল একদিনই নয়, বরং অনবরত তা একই দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার সাথে করে যেতে হবে —এটা এমন এক নৈতিক শিক্ষা যা আজকের সমাজে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ঠিকই প্রচলিত ছিল। নেতাকে অবশ্যই তার লোকদের উপর নজরদারি রাখতে হবে যেন এটা সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি কেউ সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। এ রকম দায়িত্বশীলতা গভর্নরের কাজকে সুচারুই রাখবে না, বরং তাদের কাজের গতি ও যোগ্যতাকেও বৃদ্ধি করবে। যদি কারও চাকরিকে স্থায়ী করে দেয়া হয়, স্বভাবতই তার মধ্যে অলসতা কাজ করবে এবং অকর্মণ্য হয়ে উঠবে যে কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

- ✓ তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোনো যোগ্যতাই একজনের প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে না। আরেকভাবে বলা যায়, এমন মানুষ হও যে আল্লাহকে ভয় করে। যে কেউ গোপনে আল্লাহকে ভয় করে, এটা খুব স্বাভাবিক যে, সে প্রকাশ্যেও আল্লাহকে ভয় করে চলবে।
- ✓ সবচেয়ে জঘন্য কাজ হচ্ছে জাহিলিয়াতের যুগের শিক্ষা ও আচরণে ফিরে যাওয়া যা বাপ-দাদাদের অনুসরণীয় ছিল। কোনো গোত্র বা বাপ-দাদাদের নিয়ম-নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং এর পরিণতি নিশ্চিত দুর্ভোগ।
- ✓ যখন কেউ কাউকে উপদেশ দেবে, তখন তার বক্তব্যকে সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা উচিত। যদি কেউ দীর্ঘ বক্তব্য দেয়, তাহলে তার শ্রোতারা কিছুই মনে রাখতে পারবে না। তার ভূমিকা মনে রাখতে গিয়ে উপসংহার ভুলে যাবে। আর বক্তব্যের সারকথা মনে রাখতে গিয়ে ভূমিকা ভুলে যাবে এবং এ রকম আরও অনেক অবস্থার সৃষ্টি হবে। দীর্ঘ ও বিরক্তিকর বক্তব্য শুনে একজন হয়তো কোনো কিছু মনে না রেখেই মজলিস ত্যাগ করবে। যদি কেউ বক্তা হিসেবে খুব বাগ্মী হয়, তাহলে লোকেরা শুধু তার বাগ্মীতার কথাই মনে রাখবে— বক্তব্যের মূল শিক্ষার চেয়ে কথায় ভাষাশৈলীর দিকই মনে রাখবে। আর যদি তার বক্তব্য দীর্ঘ ও অপরিপক্ব হয়, তাহলে শ্রোতারা বিরক্তিতে তার কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে না।
- ✓ নিজের কাজের প্রতি জবাবদিহিতা, নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রেখে তা সংশোধনের চেষ্টা করা এবং অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করে

একজন সহজেই তার অধীনস্থদের আচরণ ও চরিত্রে উন্নতিসাধন করতে পারে।

- ✓ একজন শুধু সময়মতো নামাযই পড়বে না, বরং খুশু-খুযু সহকারে তা আদায় করবে। নামাযকে নামাযের মতো পড়লে যে কেউ কঠিন ও কষ্টকর পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ও সাহস অর্জন করতে পারে। আর কষ্ট ও দুর্ভোগের সময় সকল ঈমানদারদের জন্য নামাযই সবচেয়ে বড় আশ্রয়।
- ✓ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিদেশি প্রতিনিধিদের সম্মান করতে বলেছেন যার মাধ্যমে তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া হয়ে যাবে। একই সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সতর্ক করেছেন, তিনি যেন তার সাথে নিজেদের কোনো স্পর্শকাতর গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা না করেন, বিশেষ করে সামরিক বিষয়ে। যদি তাদের নিজেদের দুর্বল দিক বুঝতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা এর সুবিধা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। এর বিপরীতে ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এসব বিষয়াদি দেখাতে বলা হয়েছে যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ও শক্তিমত্তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়।
- ✓ যখন সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের প্রসঙ্গ আসে, তখন শত্রুর নিকট সমাজের গোপন তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হয়ে, অথবা এমন কারও কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করা উচিত নয় যার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।
- ✓ অনুকূল ফলাফল পাওয়ার জন্য অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করার সঠিক পদ্ধতি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানী লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা হলেও ব্যক্তি উপকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে যদি সমস্যাসমূহ তার কাছে পরিকারভাবে বর্ণনা না করা হয়; আবার পরামর্শদাতাকে যদি অবহেলা করা হয়, তাহলেও সে উপকৃত হতে পারবে না—এ অবহেলা লজ্জা-শরমের কারণে হতে পারে অথবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে। পরামর্শকের কাছে সমস্যার মূল বিষয় তুলে ধরা না হলে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যাবে না।
- ✓ প্রত্যেক নেতাকে তার নিকটস্থ পদবীর লোকদের ছাড়াও অধীনস্থ সকল সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যে নেতা নিজেকে সবার থেকে আলাদা ভাববে, সম্ভাবনা রয়েছে তার অধীনস্থ লোকেরা এমনভাবেই তাকে বয়কট করবে। অথবা যদি সে তার নিকটস্থ পদবীর

লোকদের সঙ্গে কেবল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে বাস্তবতা থেকে দূরে থাকবে কিংবা তার অধীনস্থদের সমস্যাসমূহ তার কাছ পৌঁছবে না। ফলশ্রুতিতে তার অধীনস্থ নিম্ন পদবীর লোকজন তাকে স্বৈরশাসক মনে করবে যে কিনা অন্যদের ব্যবহার করে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে।

✓ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এটা পরীক্ষার করে তুলে ধরেছেন যে, বিপদের সময় গার্ডদের সংখ্যা বাড়ানোই শুধু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, বরং তাদের পরীক্ষা করাও প্রয়োজন যেন কারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে তা জানা যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন: খোঁজখবর না নিলে একজন গার্ড হয়তো অলস হয়ে উঠবে, অথবা ঘুমিয়ে পড়তে পারে এবং এভাবে শত্রুরা মুসলিম সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

✓ অধীনস্থদের মধ্যে যারা আইন ভঙ্গ করে, তাদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে নেতাকে অবশ্যই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। অপরাধীকে কিছুতেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না; যদি শাস্তি প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে সে অপরাধ করাকে সাধারণ বিষয় মনে করবে এবং সম্ভবত আরও মারাত্মক অপরাধ করে ফেলবে। আবার শাস্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে কারও জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। অতিরিক্ত শাস্তি প্রয়োগে অধীনস্থরা নেতার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে অথবা তাকে হৃদয়হীন পাষাণ স্বৈরশাসক মনে করবে। এ ধরনের শাস্তি প্রদানে নেতাকে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দ্রুততার সাথে তাকে সমস্যার সমাধান করতে হয়ে, কিন্তু অপরাধীর বিচার করার জন্য সময় নিতে হবে। তাহলে রাগ প্রশমিত হয়ে বিচার করার উপযুক্ত মানসিকতা তৈরি হবে, অপরাধীর ভুল নিয়ে সে সঠিকভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে শাস্তির পরিমাণ ও ধরন নিয়েও ভাবার অবসর পাবে।

✓ নেতাকে অবশ্যই তার অধীনে সংঘটিত সবকিছুর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। আর তিনি যে সবকিছুর ব্যাপারে সজাগ, এ বিষয়টি অধীনস্থদের জানাতে হবে। তাতে অধীনস্থরা কাজ-কর্মে আরও সতর্ক হবে এবং মারাত্মক অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। একইসাথে নেতার জন্য উচিত নয় অধীনস্থদের গোপন তথ্য তাল্লাশ করা, বিশেষ করে যখন তারা দায়িত্বে নিয়োজিত নয়। তারা তখন নিজের ঘরে অথবা বসবাসের অন্য কোনো জায়গায় (সফরের সময় তাঁবুতে)

গোপনীয়তা আশা করে এবং এটা তাদের প্রাপ্য। নেতা হিসেবে কারও ব্যক্তিগত দোষ প্রকাশ করা সমীচীন মনে করা উচিত নয়। যদি কেউ বুঝতে পারে যে, তাদের নেতা তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে, তাহলে তারা কোনোভাবেই তার প্রতি আশ্রিত থাকবে না এবং তারা বিভিন্নভাবে তার অগোচরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। তখন তার অধীনস্থদের তাকওয়া-পরহেজগারীর অবনতি হবে এবং তারা ভালো-মন্দ বিবেচনা না করেই তাদের স্বার্থের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করবে। একজন নেতাকে অবশ্যই পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসায় অধীনস্থদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আর যখন বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা হারিয়ে যাবে, তখন সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে।

✓ একজন নেতাকে অবশ্যই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠাবান লোকদের সাথে উঠা-বসা করতে হয়ে। যদি সে তাদের কাছ থেকে কোনো সমালোচনা শোনে, তাহলে সে নিজেকে ব্যক্তি এবং নেতা হিসেবে শোধরানোর সুযোগ পাবে। অপরদিকে তাকে দুনিয়াদার বা লক্ষ্যহীন মানুষদের সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। যদিও তাদের সঙ্গে খুব আনন্দদায়ক হয় কিংবা তারা তাদের নেতার খুব প্রশংসা করে, তাদের বিযাক্ত সঙ্গে—বিযাক্ত এ কারণে যে, যেমন বর্তমান যুগের টেলিভিশন মানসিকতাকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে—নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি চিন্তা করা থেকে বিরত রাখবে। তাদের হাস্যকলরব সখে সে মাতালের মত আচরণ করবে যে নিজেকে এমন করুণ অবস্থার সম্মুখীন করবে যে, যখন জেগে উঠবে তখন এটা অনেক দেরি হয়ে যাবে—যখন চারিদিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠবে যার আর কোনো সমাধান অবশিষ্ট থাকবে না।

✓ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সতর্ক করে। সেটি হলো, যুদ্ধে সেনাপতিকে অবশ্যই খুব সাহসী এবং দৃঢ় থাকতে হবে। কারণ, সেনাপতির অন্তঃকরণে কাপুরুষতার ভাব থাকলে তা সহজেই সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রণাঙ্গনে যখন সাধারণ সেনারা তাদের সেনাপতিদের মধ্যে ভয় ও হতচকিতভাব লক্ষ্য করে, তখন তারা চিন্তা করে এবং তা করাই উচিত যে, সম্ভবত যুদ্ধে তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ এবং তখন তারাও ভয় ও কাপুরুষতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তা ছিল অর্থবহ। তার কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তার অধীনস্থদের মঙ্গলচিন্তায় এবং

ইসলামের উন্নতিতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। আগে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করার ফলে তিনি জানতেন তার সেনাপতিরা যুদ্ধক্ষেত্রে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে। তিনি এও জানতেন যে, এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা বা অতিক্রম করার জন্য তাদের ব্যক্তিগতভাবে সময়ের প্রতি সচেতন এবং তাদের নেতৃত্বের কৌশলে আরও দক্ষ হতে হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে কী ঘটে তা নয়, বরং প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয় যার প্রতি সেনাপতির দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—যেমন : সেনাদের মনোবল রক্ষা, শত্রুদের সাথে সমঝোতার শর্তসমূহ, সাধারণ সেনাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধ, শত্রুদের প্রতিনিধিদের সাথে আচরণ এবং এ রকম আরও অনেক বিষয় তার বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার এটা কেবল তার সামরিক বিষয়াদিতে পারদর্শিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি যা করতেন সবকিছুতেই এ পরিমিতিবোধের বিকাশ ঘটত। একজন শাসক হিসেবে তিনি জানতেন কীভাবে অধীনস্থদের নেতৃত্ব দিতে হয়, তিনি ছিলেন ব্যক্তি নির্বাচনে একজন বিচক্ষণ বিচারক, এজন্য তিনি জানতেন কোনো দায়িত্বে কাকে নিয়োগ দিতে হবে; তিনি ছিলেন একজন মানবিকতার প্রতীক এবং জনহিতৈষী ব্যক্তি, যে তার জীবনের অনেক সময় দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবায় ব্যয় করেছেন। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির সর্বোত্তম জ্ঞানী; তিনি ছিলেন অধিক ও নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী; সংক্ষেপে, তিনি যা কিছু করেছেন, ভালো করেছেন। আল্লাহ তার উপর এবং সকল সাহাবীদের উপর রাজি থাকুন!

২। শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রা.-এর সেনাবাহিনী

ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনী প্রেরণের তিনদিন পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তাদের যাত্রার সময় চলে এল, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিদায় জানালেন এবং বললেন, ‘হে শুরাহবিল, আমি ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে যে উপদেশ দিয়েছি, তা কি তুমি শুনেছ?’ তিনি বললেন,

‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘নিশ্চয়ই একই উপদেশ তোমার জন্যও প্রযোজ্য। তবে তোমাকে কিছু গুণাগুণ সম্পর্কে বলব যা আমি ইয়াজিদকে বলিনি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, নামায সময়মতো আদায় করবে, যুদ্ধের দিন ধৈর্যধারণ করবে যতক্ষণ না তুমি বিজয় অর্জন কর অথবা শহীদ হয়ে যাও; অসুস্থদের দেখভাল করবে এবং শহীদদের দাফন কার্য সমাধা করবে এবং সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবে।’ শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি সাহায্য করেন (সাফল্য অথবা লক্ষ্যে পৌঁছতে) এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়।’^{২১১}

শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার সৈন্য ছিল। তিনি তার বাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে তাবুক এবং আল-বালকা যেতে আদেশ দিলেন এবং তারপর বুশরা রওনা হতে বললেন। বুশরাই তার সর্বশেষ গন্তব্য।

শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-বালকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন এবং ধারণার চেয়ে কম সময়ে সেখানে পৌঁছলেন। কারণ, তিনি পথিমধ্যে খুব সামান্যই বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আল-বালকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং একসময় তিনি বুশরা পৌঁছে গেলেন। বুশরার অধিবাসীরা তার আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজেদের তাদের উঁচু এবং অজেয় দুর্গের ভেতর বন্দী করল। শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যরা দুর্গগুলোকে অবরোধ করে রাখল। তারা দুর্গ ভেদ করতে পারলেন না এবং বুশরা অধিবাসীদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতেও সক্ষম হলেন না।

৩। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর সেনাবাহিনী

অন্যান্য সেনানায়কের মতো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তার বাহিনী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করার জন্য তৈরি হলেন আবু

^{২১১} কতেহ আশ-শাম, আল-আজদি (পৃ. ১৫)।

বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিদায় জানালেন। বিদায়ের আগে সামান্য সময়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘এমনভাবে অন্যের কথা শুনবে যেমন করে কেউ কোনো কিছু বোঝার জন্য শুনে থাকে এবং তাকে যা করার জন্য আদেশ করা হলো তা বাস্তবায়নের পূর্ণ নিয়ত থাকে। তুমি অবশ্যই আরবের সম্রাট লোকদের সাথে রওনা হচ্ছ—তারা আজকে মুসলিম সমাজের সবচেয়ে নেককার মানুষ এবং জাহিলিয়াতের যুগে তারা ছিল সবচেয়ে দুঃসাহসিক যোদ্ধা। জাহিলিয়াতের যুগে তারা গোত্রপ্রীতির বন্ধনে যুদ্ধ করত, আজ তারা নেক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া তাদের আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। যারা তোমার সঙ্গী হচ্ছে, তুমি তাদের সর্বোত্তম সঙ্গীতে পরিণত হও। আর যখন সত্য সামনে আসে, তখন সবার সাথে সমান ব্যবহার করবে। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং মনে রাখবে তিনিই একাই তোমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর উপর ভরসা করবে। অভিভাবক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আগামীকাল রওনা হয়ে যাও ইনশাআল্লাহ।’^{২১২}

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে মোট তিন হাজার থেকে চার হাজারের মতো সৈন্য ছিল এবং তাদের টার্গেট শহর ছিল হিমস। তিনি মদীনা থেকে ওয়াদি আল-কুরার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে আল-হাজর (সালেহ-এর পূর্বের শহর), যাত মানার, জিজা শহর হয়ে শেষ পর্যন্ত মামোআব শহরে পৌঁছে যান। সেখানে তিনি শত্রুর মুখোমুখি হন, তাদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং শান্তিচুক্তি করতে সম্মত হন। এটাই মুসলমান এবং শাম দেশের জনগণের প্রথম চুক্তি।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর সামনের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এবার তিনি আল-যাবিয়াহর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ পর্যায়ে আগে রওনা হওয়া দু-টি সেনাবাহিনীর মাঝামাঝি তার অবস্থান হয়। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলে প্রচণ্ড সাহসী এবং প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া চালাতে সক্ষম একজন মুজাহিদ ছিলেন। তার নাম কাইস ইবনে হুবাইরাহ ইবনে মাসউদ আল-মুরাদি রাযিয়াল্লাহু

আনহু। মদীনা থেকে রওনা হওয়ার আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার দলের সাহসী বীর যোদ্ধাদের সম্মান করতে বলেছেন, আর বলেছেন, 'তোমার সঙ্গে অবশ্যই একজন সম্মানিত, বিখ্যাত ও সাহসী আরব যোদ্ধা রয়েছে। তোমার বাহিনীর মুসলিম মুজাহিদরা তার পরামর্শ ও শক্তিমত্তার সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হতে পারবে না। সুতরাং তাকে তোমার পরম সঙ্গী করে নাও, তার প্রতি দয়াদ্র্ণ ও বিনয়ী আচরণ কর এবং তাকে এ অনুভূতি দাও যে, তাকে ছাড়া তোমার চলবে না। এটাও প্রমাণ করতে হয়ে যে, তুমি তাকে সামান্যতমও অসম্মান কর না। তোমাকে যা বলেছি তা যদি তুমি কর তাহলে তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পাবে; স্বাভাবিকভাবেই সে তোমার হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করবে।'

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর খোঁজ করেন এবং তার সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আমি তোমাকে আবু উবাইদার সঙ্গে প্রেরণ করছি যিনি 'বিশ্বস্ত', এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে কেউ সীমাতিক্রম করলে তিনি সীমা অতিক্রম করেন না। যদি কেউ তার সাথে মন্দ আচরণ করে (ব্যক্তিগত ব্যাপারে), তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। যদি কেউ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তিনি সম্পর্ক গড়েন (পারস্পরিক হৃদয়তার সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে যত্নবান)। তিনি ঈমানদারদের প্রতি দয়ালু, কাফেরদের প্রতি কঠোর। তার আদেশ অমান্য করো না, তার মতের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বস্তুত তিনি তোমাকে ভালো কাজের দিকেই আদেশ দিবেন। আমি তাকে তোমার কথা শুনতে আদেশ করেছি। সুতরাং তাকে কেবল আল্লাহকেই ভয় করার পরামর্শ দেবে। আমরা তোমার বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা শুনে এসেছি, তুমি জাহিলিয়াতের যুগে অভিজ্ঞ সর্দার ও নেতা ছিলে। আমি 'জাহিলিয়াত' এজন্য বললাম কারণ, তখন মানুষ অন্যায় ছাড়া আর কিছুই করত না। সুতরাং তোমার শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে ইসলামের স্বার্থে অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার কর। যারা আমার এই কথা মেনে চলবে—যারা তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে ইসলামের উন্নতিতে ব্যবহার করবে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োগ করবে—তাদের জন্য আল্লাহ বিরাট সম্মান ও পুরস্কারের ওয়াদা

করেছেন। মনে রাখবে, সম্মান মুসলমানদেরই।’ কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি আপনি জীবিত থাকেন (যখন যুদ্ধের খবর মদীনায পৌছবে)—আল্লাহ আপনাকে হায়াতে রাখুন—তখন আপনি আমার ব্যাপারে শুনবেন, আমি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় কী পরিমাণ যত্নশীল ছিলাম এবং অবিশ্বাসীদের কী পরিমাণ ক্ষতি করতে সচেষ্ট ছিলাম যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে এবং আপনাকে খুশি করবে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তা-ই কর এবং আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।’

পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যাবিয়াহতে মুশরিকদের দু-জন বিখ্যাত যোদ্ধার সঙ্গে কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বৈতযুদ্ধের খবর এবং তাদের হত্যা করার সংবাদ পেলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কাইস সত্য বলেছিল এবং সে তার ওয়াদাকে সম্মান ও পূর্ণ করেছে।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হয়তো সরাসরি শাম অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি যেভাবে মুসলিম সৈন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন, মনে হয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন। তিনি প্রতিটি সৈন্যকে ইসলামের স্বার্থে নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্যই কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে পুরো অভিযান জুড়েই তার অনুপ্রেরণা কাজ করেছে এবং তার ভেতরকার সুষ্ঠু দক্ষতা ও ক্ষিপ্ততাকে বের করে এনেছে। কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন, জাহিলিয়াতের যুগে যত যুদ্ধকৌশল ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তার সবই ইসলামের উন্নতিতে প্রয়োগ করেছেন। এখানে মূল কথা হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে হয় এবং তাদের সর্বোচ্চ মেধাকে কাজে লাগাতে হয়। কাইস ইবনে হাইবারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অতীতকে সামনে এনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তার কাছ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হবে, তাকে সম্মান করতে হবে এবং তাকে এ অনুভূতি দিতে হবে যে, তার সাহায্য মুসলমানদের জন্য ভীষণভাবে প্রয়োজন। বীরদের যখন এভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তখন তারা

মানবিকতার বৃহত্তর স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি হয়ে যায়।

৪। আমর ইবনুল আস রা.-এর সেনাবাহিনী

শাম অভিযানে, অস্ত্র এ অভিযানের পরিকল্পনা করার সময়, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একটি মুসলিম প্রদেশের শাসনকার্যে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং গভর্নর হিসেবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে সে দেশের শাসনভঙ্গ কায়েম করা। এটা এমন একটি কাজ যা সব শক্তি ও সময় নিয়ে নেয়। কিন্তু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শান্তির সময় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই বেশি উপযোগী ছিলেন। এর মানে এটা নয় যে, তিনি অপারদর্শী গভর্নর ছিলেন; সত্য হচ্ছে তিনি ছিলেন গভীরভাবে সম্মানিত এবং দায়িত্ববান। তিনি তার কাজ সততা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদনে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে, তখন গভর্নরের দায়িত্ব থেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি জরুরি।

এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে যে কোনো একটি বেছে নিতে বললেন: তিনি চাইলে গভর্নর হিসেবে থেকে যেতে পারেন (কারণ, তাকে গভর্নর পদে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই নিয়োগ দিয়েছিলেন); অথবা দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য মঙ্গলজনক হবে এমন কাজ—শাম দেশের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে পারেন। যুদ্ধের শুরুতে সন্তোষ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জানালেন যে, যদি তিনি গভর্নর হিসেবেই থেকে যেতে চান, তাহলে তার সে অধিকার রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট চিঠিতে জবাব লিখে পাঠালেন। প্রথমে তিনি অলংকারিত শব্দে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, এ সিদ্ধান্ত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে খলীফাকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। তিনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা-ই হবে। খলীফা লিখলেন, ‘অবশ্যই ইসলামের তীরগুলোর মধ্যে আমি একটি তীর। আল্লাহর শপথ! তুমি হচ্ছে দক্ষ তীরন্দাজ যে ইসলামের এই তীর নিক্ষেপ করে এবং

এগুলোকে আবার একত্রিত করে। সুতরাং সবচেয়ে উত্তম, শক্তিশালী এবং তাকওয়াসম্পন্ন তীর অনুসন্ধান কর এবং শত্রুদের দিকে সেগুলো নিক্ষেপ কর (অথবা সবচেয়ে যোগ্য এবং উপযোগী মুজাহিদ তালাশ কর এবং তাকে রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করার জন্য সিরিয়ার দিকে প্রেরণ কর)।’

এ ঘটনার পর পরই আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায়ে এসে হাজির হন। আর কালক্ষেপণ না করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মদীনার বাইরে গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে বলেন এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। মক্কার অনেক বড় বড় সর্দার আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাদের মধ্যে হারিস ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু, সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু।

যখন তার বাহিনী তৈরি হয়ে গেল এবং তিনি মদীনা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তাকে মূল্যবান উপদেশ দিতে এবং তাকে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন। তাদের ঐ সর্বশেষ মুহূর্তে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘হে আমর, যুদ্ধে তোমার দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তুমি মুসলিম সমাজের সবচেয়ে মহান নেককার ব্যক্তিদের নিয়ে রওনা হচ্ছ। যুদ্ধপ্রসঙ্গ এলেই তোমার অনেক মতামত উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে এবং বিজয়ের জন্য যা অনুকূল হয়ে ওঠে।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমি অবশ্যই আপনাকে আশাহত হওয়া থেকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করব এবং আমার ব্যাপারে আপনার সুউচ্চ ধারণাকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকব।’

ছয় থেকে সাত হাজার সৈন্য নিয়ে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রওনা হয়ে গেলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল প্যালেস্টাইন দখল করা। প্রথমে তারা লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে যাত্রা করেন। তারপর আরবাহ উপত্যকায় পৌঁছেন। এ জায়গাটি মৃতসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত। সেখানে পৌঁছে আমর

রাযিয়াল্লাহু আনহু এক হাজার সৈন্যের একটি অগ্রগামী দল নির্বাচন করেন এবং তাদের রোমান সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। এই অগ্রগামী দলের নেতা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সৈন্যরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং অবশিষ্ট শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারা তাদের সাথে অনেক যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসে। আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব বন্দীদের কথা বলতে বাধ্য করে। ফলে তিনি রোমানদের অবস্থান, সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের নেতা রোইস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করেন। শত্রুবাহিনী রোইসের নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনীর উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কার্যকরী যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করেন। শত্রুরা আক্রমণ করার আগেই তাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ আক্রমণে আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করে। মুসলমানদের এ অকস্মাৎ আক্রমণ এত বেশি ফলপ্রসূ হয় যে, অনেক শত্রুসেনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়; অধিকন্তু হাজার হাজার শত্রু মুসলমানদের হাতে নিহত হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) সহজেই অনুমেয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চারটি সেনাবাহিনীকে চারটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়েছেন যদিও তাদের সবার সর্বশেষ গন্তব্য মূলত একই : শাম দেশের ভূখণ্ড। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যেমন তার ছেলদের বেলায় যে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, এখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। কুরআন মাজীদে পরিষ্কার উল্লেখিত হয়েছে,

وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

তিনি (ইয়াকুব) বললেন, হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তারই উপর আমি ভরসা করি এবং তারই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।^{২১৩}

চার। শামে সংকটের উৎপত্তি

সাধারণভাবে বলা যায় যে, শাম দেশ বিজয়ের জন্য যেসব মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের লক্ষ্য পূরণে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাদের এমন এক বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেটা কোনো একটি শহর বা প্রদেশ কিংবা একটি দেশের সেনাবাহিনী নয়, বরং পুরো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল সেনাবাহিনী। এ বাহিনী তাদের উন্নত সামরিকশক্তি ও সংখ্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত ছিল; এমন বাহিনী যারা সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। তারপরেও আরও একটি দিক ছিল যে, তারা এমন একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল যেখানে সবাই যোদ্ধা। তা না হলে এত বড় বিশাল ভূখণ্ড তাদের পক্ষে করায়ত্ত করাও সম্ভব হতো না।

তারা যে কোনো দেশ দখল করার জন্য ভালোভাবেই তৈরি ছিল। তারা দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে বড় বড় দুর্গ ও উঁচু উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করেছিল। শাম দেশে এ সাম্রাজ্যের পূর্ববাহুতে রোমানরা দু-টি বড় সেনাবাহিনীর ছাউনি স্থাপন করেছিল; একটির অবস্থান ছিল প্যালেস্টাইনে, আরেকটি ছিল আনতাকিয়াহ। এ দু-টি বাহিনীর সৈন্যরা ছয়টি এলাকায় বিভক্ত ছিল :

১। আনতাকিয়াহ : রোমান রাজত্বের সময় এটি শাম দেশের রাজধানী ছিল।

২। কানসারিন : এটি হুমাত এবং হালেব এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আরও পরিষ্কারভাবে হালেব থেকে এটির অবস্থান দক্ষিণ-

পশ্চিম দিকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। কানসারিন শামের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত, এর বিপরীত দিক হলো পারস্যের উত্তর-পশ্চিম এলাকা।

৩। হিমস : এ এলাকায় যে পরিমাণ সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল তা দিয়ে পুরো রোমান সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো—সুদূর তাদমির এবং শামের মরুভূমি পর্যন্ত। হিমসও শামের সীমান্ত এলাকা বরাবর ছিল এবং বিপরীত দিকে ছিল পারস্যের উত্তর-পূর্ব দিক।

৪। আশ্মান : আল-বালকা এলাকার সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি। এ শহরের অভ্যন্তরে রোমানরা একটি দুর্জয় দুর্গ তৈরি করেছিল।

৫। আজনাদাইন : পুরো দক্ষিণ প্যালেস্টাইন এলাকায় সামরিক কমান্ডের ঘাঁটি। এ শহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিক আরব ভূমি দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এর কিছু অংশ মিশরের সীমান্ত দ্বারাও বেষ্টিত ছিল।

৬। কাইসারিয়াহ : উত্তর প্যালেস্টাইনের একটি শহর যা হাইফা থেকে আনুমানিক তের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

পুরো রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হয় আনতাকিয়াহ অথবা রোমে অবস্থিত ছিল। রোমানদের বাদশা এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হীরাকল যখন দেখল যে মুসলিম বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে, সে তখন তার বাহিনীকে মুসলমানদের আক্রমণ করে পরাজিত করার আদেশ জারি করে। নিচে তার উদ্দেশ্য সাধনে গৃহীত কয়েকটি সামরিক কৌশল বর্ণনা করা হলো :

✓ হীরাকল প্রথমে মুসলিম বাহিনীকে সীমান্ত দিয়ে শাম দেশের মধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশের সুযোগ দিতে তার সেনাপতিদের আদেশ দেয়। ফলে মুসলিম বাহিনী যেন শাম দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং এভাবে তাদের ফাঁদে ফেলা সম্ভব হয় অথবা নিদেনপক্ষে তাদের মধ্যে মিথ্যা নিরাপত্তার অনুভূতি প্ররোচিত করা যায়।

✓ সে তার সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়ানকে সিরয়ূনের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে সমবেত হতে আদেশ দেয়।

✓ সে তার সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ানকে তিদেরের নেতৃত্বে আনতাকিয়াহতে সমবেত হতে আদেশ দেয়।

✓ সে তার সেনাপতিদের মুসলিম বাহিনীর চারটি দলকে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করার আদেশ দেয়। এটা ছিল তার সামরিক কৌশলের মূল চাবিকাঠি: সে ভেবেছিল মুসলিম বাহিনীর চারটি দল একসাথে আক্রমণ করার চেয়ে যে কোনো একটি দলকে প্রথমে আক্রমণ করে পরাজিত করা সহজ হবে। এ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য হীরাকল তার নিম্নলিখিতভাবে তার বাহিনীকে মোতায়েন করে :

ক। সে তার ভাই তাযারিকের নেতৃত্বে নব্বই হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে।

খ। সে ইবনে তাওয়ারের নেতৃত্বে একটি দলকে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে।

গ। কাবকার ইবনে নানতুসকে ষাট হাজার সৈন্য দিয়ে আবু উবাইদার বাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে।

ঘ। পরিশেষে দারকাসের নেতৃত্বে একটি দলকে সে শুরাহবিল ইবনে হাসানাহর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য পাঠায়।

যদি রোমানরা এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে যেখানে মজবুত, দুর্জয় এবং বাহ্যিকভাবে নিবেদিত সামরিক বাহিনী দ্বারা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুরক্ষিত, সেখানে মুসলমানরা একেবারে আনাড়ি নয়, বিশেষ করে যখন যুদ্ধকৌশলের প্রসঙ্গ আসে। সত্যিকার অর্থে মুজাহিদরা আরও বেশি শক্তিশালী হওয়ার পরও পরিস্থিতিসাপেক্ষে তারা বলিষ্ঠ অবস্থানে ছিল না এবং রোমানদের তুলনায় তারা সংখ্যা ও অস্ত্র-শস্ত্রেও ছিল অনেক কম। সুতরাং মুসলমান সৈন্যসংখ্যার তুলনায় রোমান শত্রুসংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও এ যুদ্ধের ফলাফল আগেই নির্ধারিত ছিল।

মুসলমানদের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তারা শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণে পারদর্শী ছিলেন। আশ-শামের যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মুসলিম নেতারা দ্রুত হেরাকলের যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে সক্ষম হন; তারা জানতেন শত্রুপক্ষের কোন বাহিনী কোথায় মোতায়েন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কাকে কোন বাহিনী আক্রমণ

করতে বলা হয়েছে। মুসলিম নেতারা হেরাকলের এ কৌশলও বুঝতে পারেন যে, সে মুসলমানদের সব বাহিনীকে একসাথে আক্রমণ করবে না। বরং একবারে একটি দলকেই আক্রমণ করবে।

মুসলিম নেতারা মদীনায় আবার চিঠি পাঠিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ চিঠিতে সরাসরি আরও সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ না করে তাদের বিপজ্জনক অবস্থার বিবরণ দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর একটি দলের প্রধান আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে লেখেন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। প্রতি, আবু বকর, আল্লাহর রাসূলের খলীফা; হইতে, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ: আসসালামু আলাইকুম। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। পরসমাচার এই যে, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মানিত করেন এবং সহজ বিজয় দান করেন। আমার কাছে খবর এসেছে যে, রোমের সম্রাট হীরাকল শাম দেশের একটি শহর আনতাকিয়াহতে ঘাঁটি গেড়েছে। সে তার রাজ্যে সব বাসিন্দাদের যুদ্ধে যোগদান করতে আদেশ জারি করেছে এবং তারাও তার ডাকে সাড়া দিয়েছে (বিশাল সংখ্যায়)। তারা সহজ অথবা কঠিন বাহনে করে তার কাছে ছুটে আসছে। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আপনাকে এ পরিস্থিতি অবহিত করি যেন আপনি সঠিক যুদ্ধকৌশল নির্বাচন করতে পারেন। আল্লাহ আপনার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠান : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আপনার চিঠি আমার নিকট পৌঁছেছে এবং রোমের বাদশা হীরাকল সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। নিশ্চিতভাবে তার আনতাকিয়াতে ঘাঁটি স্থাপন প্রমাণ করে যে, সে ও তার বাহিনী পরাজিত হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ও মুসলমানদের বিজয় হবে। আপনি উল্লেখ করেছেন যে, সে তার রাজ্যের লোকজনকে জমা করছে এবং আপনাকে আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যে যুদ্ধের জন্য উনুখ জনতার পর জনতা একত্রিত করেছে। যাহোক, এটা যে হবে আপনি এবং আমি উভয়ে তা ভালো করেই

জানতাম; তাদের কাছে আমরা এটা আশা করেছিলাম। কোনো জাতিই তাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব যুদ্ধ ছাড়া ত্যাগ করবে না। বস্তুত আপনি জানেন, আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা, অনেক মুসলমান সৈন্য তাদের আক্রমণ করছে, তারা মৃত্যুকে ভালোবাসে যেমন শত্রুরা জীবনকে ভালোবাসে এবং এ যুদ্ধের বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছ থেকে বিরাট পুরস্কারের আশা রাখে। তারা এসব মানুষ যারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে ভালোবাসে, এ ভালোবাসা তাদের যুবতী স্ত্রী এবং মূল্যবান সম্পদের ভালোবাসা থেকে বেশি। যুদ্ধের সময় তাদের একজন শত্রুদের হাজার লোকের সমান। সুতরাং আপনার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং যেসব মুসলমান আপনার সঙ্গে নেই, তাদের জন্য দুঃখিত বা অস্বস্তিবোধ করবেন না। কারণ, আল্লাহ আপনার সঙ্গে আছেন। উপরে বা বললাম তা সত্ত্বেও আমি আপনার জন্য আরও অধিক সৈন্য প্রেরণ করব। এত সৈন্য প্রেরণ করব যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন এবং ইনশাআল্লাহ আর সৈন্য চাইবেন না। আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।”^{২১৪}

শাম অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আরেকজন সেনাপতি ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুও খলীফার নিকট পত্র লিখেছিলেন এবং তাতে আবু উবাইদার পত্রের মতো একই বক্তব্য ছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লেখেন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আপনার পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে। তাতে আপনি লিখেছেন যে, কীভাবে রোম সম্রাট আনতাকিয়াহতে ঘাঁটি গেড়েছে এবং মুসলমানদের বিরাটসংখ্যক মুজাহিদদের সমাবেশে আল্লাহ তা’আলা তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, আল্লাহ তা’আলা এ ভয় সঞ্চারের মাধ্যমেই (যা তিনি শত্রুদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিতেন) আমাদের বিজয় দান করতেন এবং তিনি আমাদের সম্মানিত ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করতেন। আমরা যে ধর্ম অনুসরণ করতাম এবং যে কারণে আমাদের অনুরূপ সাহায্য করা হয়েছিল, অবশ্যই আমরা আজকে ঐ একই ধর্মের উপর মানুষকে আহ্বান করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের

^{২১৪} আত-তারিখ আল-ইসলামি (৯/২১৩); ফতেহ আল-শাম, আল-আজদি (পৃ. ৩০-৩১)।

অপকর্মকারী অথবা মুশরিকদের মতো পরিণতি দেবেন না। সুতরাং যখনই শত্রুর মুখোমুখি হন, আপনার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের মোকাবেলা করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনি যদি তা করেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ছোট দল দিয়ে বড় দলকে পরাজিত করতে পারেন। তবুও আমি ইনশাআল্লাহ আরও সৈন্য প্রেরণ করব : সৈন্যের পর সৈন্য পাঠাব যতক্ষণ না আপনার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে এবং যতক্ষণ না আপনার মনে হয় যে, আর একজন সৈন্যেরও প্রয়োজন নেই। আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।' আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত সামানি রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠি প্রেরণ করেন। যখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠি নিয়ে পৌঁছেন, তখন ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের সামনে সেটি উচ্চস্বরে পড়ে শোনান এবং এতে সবাই খুশি ও আনন্দিত হন।^{২১৫}

শাম দেশের ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে আমরা ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জবাবে লেখেন : আসসালামু আলাইকুম। আপনি যে চিঠিতে রোমানদের সৈন্য সমাবেশের কথা লিখেছেন, তা আমার কাছে পৌঁছেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিজয় দান করেছিলেন, কিন্তু সেটা সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে নয়। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে যুদ্ধ করতাম যখন আমাদের সঙ্গে ছিল কেবল দু-টি ঘোড়া এবং পালাক্রমে আমরা উটের উপর চড়তাম। উহুদের দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে কেবল একটিমাত্র ঘোড়া ছিল যার উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ার ছিলেন। তারপরেও আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিপরীতে আমাদের সাহায্য করেছেন। মনে রাখবেন, আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই বেশি পছন্দ যে

^{২১৫} ফতেহ আশ-শাম, আল-আজদি (পৃ. ৩০-৩৩)।

গোনাহ থেকে বেশি দূরে থাকে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য করুন এবং আপনার সঙ্গীদেরও তার আদেশ মেনে চলতে বলুন।”^{২১৬}

এই চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিজয়ের জন্য তাদের অধিকসংখ্যক সেনার প্রয়োজন নেই, তবে দৃঢ় ঈমান প্রয়োজন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তার সব তিনি নিজে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এটা প্রমাণ করেছেন যে, সংখ্যাধিক্যের চেয়ে ঈমান দামি; তিনি নিজে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু তারপরেও আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন। তিনি নিজে সাক্ষী যে, কীভাবে আল্লাহ তা’আলার সাহায্যে মুসলমানরা তাদের তুলনায় অনেক বেশি শত্রুদের বদরের যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, কীভাবে খন্দকের যুদ্ধে মুশরিক সেনাবাহিনী—যারা রাসূলের বাহিনী থেকে অনেক বেশি ছিল—অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে পরাজয় স্বীকার করে মদীনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, এতসব দুঃসংবাদে পরও মুসলমানরা শামে রোমানদের পরাজিত করবে।

তারপরেও অন্তরের এই আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করেছিলেন যে, বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তাকে আরও কিছু করতে হবে। এ চেতনা ও সেনাপতিদের সাথে কৃত ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যত সম্ভব সৈন্য সংগ্রহে প্রচারণা শুরু করলেন যাতে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীগুলোকে অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে শক্তিশালী করা সম্ভব হয় এবং এটা তাদের জন্য ভীষণভাবে দরকার ছিল। তিনি কেবল মানুষই প্রেরণ করার চিন্তা করেননি, সঙ্গে অস্ত্র ও ঘোড়া পাঠাতে মনস্থির করেছিলেন এবং অতিরিক্ত আরও কোনো সামগ্রী যা তার বাহিনীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাশিম ইবনে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন; এবং যখন চিঠি এল, আবু বকর

^{২১৬} খুতাব আবু বকর আস-সিদ্দীক, মুহাম্মাদ আহমাদ আশোর (পৃ. ৯২)।

রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘হে হাশিম, এটা তোমার পিতামহের জন্য আনন্দদায়ক...তুমি তাদের মধ্যে একজন হয়ে যাও যাদের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য চাওয়া হয়েছে। অধিকন্তু তোমার জন্য সুসংবাদ যে, তোমার পরামর্শ, নিষ্ঠা, আনুগত্য, ত্যাগ এবং সামর্থ্যের প্রতি খলীফার বিশ্বাস রয়েছে। মুসলমানরা (শাম থেকে) মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমার কাছে সাহায্যের জন্য খবর পাঠিয়েছে। আমি লোকজনকে তোমার সাথে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান করব (তোমার বাহিনীর জন্য)। যখন তোমার সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে, তখন তুমি হয় আবু উবাইদা অথবা ইয়াজিদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।’ হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি আবু উবাইদার সঙ্গে যোগ দেয়ার ইচ্ছা রাখি।’ আব বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে আবু উবাইদার কাছেই যাও।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর লোকজনের সামনে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের মুসলমান ভাইয়েরা (বিদেশের মাটিতে) ভালোভাবেই লড়াই করছে এবং (আল্লাহর অনুগ্রহে) নিরাপদ আছে। অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা শত্রুদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। এজন্য তারা তাদের দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে, দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যেন (আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা) ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ না পায়। তোমাদের মুসলমান ভাইদের কাছ থেকে আমার কাছে দূত এসেছে, সে খবর দিয়েছে কীভাবে রোমান সম্রাট হীরাকল বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং এমন জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে যেটা শাম দেশের মধ্যে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। মুসলমানরা জানিয়েছে, হীরাকল তার নিরাপদ ঘাঁটি থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিভাবে সৈন্য পাঠিয়েছে। এজন্য আমি মুসলিম বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করব—তোমাদের সমন্বয়েই সাহায্যকারী একটি বাহিনী গড়ে তুলব। আল্লাহর ইচ্ছায় তা মুসলমানদের শক্তিকে বৃদ্ধি করবে এবং শত্রুতে প্রতিহত করতে তা সহায়তা করবে। আমাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কারণে আল্লাহ তা’আলা শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেবেন। সুতরাং এগিয়ে এসো, নিজেকে পেশ করো—আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন—এবং হাশিম ইবনে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথে যোগদান কর। যদি স্বেচ্ছায় যোগদান কর,

তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার পাবে। অবশ্যই যদি তোমরা সাহায্যকৃত হও (আল্লাহর সাহায্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে), তাহলে অবশ্যই বিজয় ও গনীমতের মাল লাভ করবে। আর যদি মৃত্যুবরণ কর, তাহলে শাহাদাত ও সম্মান লাভ করবে।’

যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে ফিরে এলেন, কিন্তু তার কথাগুলো শ্রোতাদের অন্তরে তখনও বাজছিল। লোকজন এত বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তারা কোনো সময় নষ্ট না করেই হাশিমের বাহিনীতে নাম লেখালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা এক হাজারে উপনীত হলো। এ অবস্থা দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাদের শাম অভিযুগ্মে রওনা হওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, ‘হে হাশিম, অতীতে আমরা বৃদ্ধব্যক্তির পরামর্শ, সান্ত্বনা ও নিখুঁত পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হতাম; এবং প্রয়োজনে যুবকদের ধৈর্য, সামর্থ্য ও শক্তি দ্বারা উপকৃত হতাম। মহান আল্লাহ তা’আলা এ সবগুলো যোগ্যতাই তোমার মধ্যে দিয়েছেন। তুমি বয়সে যুবক এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষমাণ। সুতরাং যখন তুমি শত্রুর মুখোমুখি হবে, ধৈর্যধারণ করবে এবং তোমার সৈনিকদের মধ্যে ধৈর্যের শিক্ষা দেবে। মনে রাখবে, আল্লাহর পথে প্রতিটি পদক্ষেপ যা তুমি নিবে, প্রতিটি সম্পদ যা তুমি খরচ করবে, প্রতিটি মুহূর্ত যখন তুমি পিপাসার্ত, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হবে—আল্লাহ তোমাকে প্রচুর নেকী দান করবেন। আল্লাহ তা’আলা সৎকর্মশীল বান্দার পুরস্কার ধ্বংস করেন না।’ হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি আল্লাহ আমার সহায় হন, তাহলে আপনি যা করতে আদেশ দিয়েছেন, তা করার তাওফীক নসীব করবেন। আমি এগুলো করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করব এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। আমি যদি শহীদ না হই (যুদ্ধের প্রথম ভাগে), আমি দু-টি জিনিস আশা করি : আমি শত্রুদের হত্যা করব এবং নিজেকে মৃত্যুর কাছে সোপর্দ করব ইনশাআল্লাহ।’

হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রওনা হওয়ার আগে তার চাচা সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, ‘হে আমার ভাইয়ের ছেলে,

আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশা ছাড়া কাউকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত অথবা হত্যা করো না (যা কিছু কর কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে এবং লোক দেখানোর জন্য করবে না)... আর মনে রাখবে শীঘ্রই তুমি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া থেকে আখেরাতের জন্য কেবল দু-টি জিনিস নিয়ে যেতে পারবে : একটি হচ্ছে সত্যের উপর দৃঢ় থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা নেক আমল যা তুমি করবে।' জবাবে হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আমার চাচা! আপনি যা বলেছেন তা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমি ভয় পাই না। আমার বাড়িতে অবস্থান করা এবং বিদেশে যাওয়া, আমার সব আসা-যাওয়া, আমার ছুরি দিয়ে কাউকে আঘাত করা অথবা আমার তলোয়ার দিয়ে কাউকে আঘাত করা— এগুলো যদি লোক দেখানোর জন্য করি তাহলে অবশ্যই আমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব।'

হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পথ ধরেই শামের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তারা যখন গন্তব্যে পৌঁছলেন, তখন হঠাৎ করেই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যরা আশা এবং আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠল যেন তারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্টসংখ্যক সঙ্গী পেয়ে গেছেন।^{২১৭}

হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুভব করেন যে, এখন মুজাহিদদের আরেকটি দল গঠন করার জন্য প্রচারণা শুরু করা প্রয়োজন। এ দলকে দিয়ে তিনি ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। নতুন এই দলের নেতা হিসেবে সাইদ ইবনে আমির ইবনে হুদাইম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঠিক করলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লোকজনকে ডাকতে বললেন এবং তাদের মধ্যে ঘোষণা করতে বললেন যে, তারা যেন সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে শাম দেশে জিহাদে

আগ্রহী হিসেবে নাম লেখায়। যখন সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা ছাড়ার জন্য তৈরি হলেন, তখন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি যদি আমাকে আযাদ করে থাকেন আপনার সঙ্গী বানানোর জন্য এবং আমি স্বাধীনভাবে যেসব নেক আমল করতে চাই তা থেকে বিরত রাখার জন্য, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে থাকব। কিন্তু যদি আপনি সত্যিই আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে থাকেন যেন আমি আমার নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাই, যা আমাকে সত্যিকার অর্থে বেশি উপকৃত করবে তা করার সুযোগ পাই, তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার প্রতিপালকের পথে জিহাদে শরীক হতে চাই। নিশ্চয়ই এখানে থাকার চেয়ে জিহাদ আমার কাছে বেশি প্রিয়।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি জিহাদই তোমার লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি তোমাকে এখানে থাকতে বাধ্য করব না, বাধ্য করতেও পারি না। আমি তোমাকে আযানের জন্যই রাখতে চেয়েছিলাম। হে বেলাল, যখনই আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবি, তখনই আমাকে একাকীত্ব পেয়ে বসে। যাহোক, আমি জানি, আগে হোক পরে হোক, একদিন আমাদের বিচ্ছিন্ন হতেই হবে এবং কিয়ামত দিবসের আগে আর দেখা হবে না। সুতরাং নেক আমল কর, হে বেলাল : সেগুলো তোমার আসল সম্বল হবে। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে আল্লাহ তোমার নাম সমুন্নত রাখবেন এবং যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন পুরস্কৃত করবেন।’ বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শোকর আদায় করলেন, তার জন্য দুআ করলেন এবং মুসলমানদের সর্বদা ধৈর্য, আল্লাহর আনুগত্য, নেক আমল ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকার আহ্বান করার জন্য তার প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আর কারও জন্য আযাদ দিতে চাই না।’ বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার আগ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার আদেশ অনুসরণ করেন এবং ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আল-

আরবাহ ও আদ-দাসিনাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সময়মতো শাম দেশে গিয়ে পৌঁছলেন।^{২১৮}

তারপর বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে লোক মদীনায় এসে জমা হতে লাগল। তাদের একটাই উদ্দেশ্য : শাম দেশে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। যখনই কোনো মুজাহিদ দল এসে হাজির হতো, জিহাদে শরীক হওয়ার আবেদন করত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের শাম দেশে পৌঁছে কোথায় কার সাথে যোগদান করতে হবে বলে দিতেন।

অনেক মুজাহিদ দলের সদস্যরা ছিল প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসী। ইসলামী আচার-ব্যবহারে তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল না। ফলে তাদের আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি, ঔদ্ধত্য ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়। মদীনার সাহাবী ও তাবেঈনদের এসব লোকদের অসদাচরণ সহ্য করতে হতো এবং একপর্যায়ে তারা খলীফার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনাবাসীদের জমা করলেন এবং তাদের ধৈর্যধারণ করতে বললেন। এসব অবুঝ গ্রাম্যসঙ্গীদের আচরণ সহ্য করতে পরামর্শ দিলেন যদি না তারা সীমা অতিক্রম করে। মদীনাবাসীর প্রতি দেয়া ভাষণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আপনাদের মধ্যে যারা মনে করেন যে, তার উপর আমার অধিকার রয়েছে, তাহলে তারা যেন এসব গ্রাম্য মুসলমানদের কঠোরতা এবং রুষ্ঠতায় ধৈর্য ধারণ করে যতক্ষণ না তাদের কাজ শান্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এসব লোক, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা আমাদের শত্রু রোমসম্রাটের সম্মিলিত বাহিনীকে নির্মূল করবেন : অবশ্যই তারা আপনাদের ভাই। যদি তাদের মধ্যে কেউ কঠোর হয়, তাহলে সেটা সহ্য করুন। তাদের ছাড়া বিজয়ের আশা করার চাইতে দীর্ঘ মেয়াদে এটা কি উত্তম নয়? শ্রোতারা সবাই একসাথে বলে উঠল, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, ‘তারা আপনাদের দ্বীনি ভাই, আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আপনাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের দিকে চেয়ে তাদের অবস্থাকে মেনে নিন।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বলতে চেয়েছিলেন, বলা হয়ে গেল। তারপর তিনি মিসর থেকে নেমে গেলেন।

পাঁচ। শাম অভিযুখে খালিদ রা.-কে প্রেরণ;
আজনাদাইন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধ

মুসলমানদের চারটি সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা সর্বক্ষণ রোমান সৈন্যদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তারা যা দেখলেন ও বুঝতে পারলেন, তা তাদের বিস্মিত করল। মুসলমানরা ইতিপূর্বে কখনও এ রকম বিপদের মুখোমুখি হননি। এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তারা প্রায় যুদ্ধেই শত্রুসেনাদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিলেন; আরও সত্য যে, মুরতাদরা মুসলমান জাতির জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ইরাক বিজয় কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। কিন্তু কোনো বিপদই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চারটি সেনাবাহিনী আশ-শামে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তার চেয়ে মারাত্মক নয়। তাদের প্রতিপক্ষ রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি; অধিকন্তু প্রতিটি মুসলিম সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। সুতরাং এককভাবে কোনো একটিকে যদি আক্রমণ করা হয় এবং রোমানরা তাদের ঘিরে ফেলতে পারে তাহলে বাকি তিনটির কোনোটিই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না।

মুসলমান সেনাবাহিনীর চার সেনাপতি জুলানে জরুরি বৈঠকে সমবেত হন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট শামের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেননি; এর পরিবর্তে বাকি তিন সেনাপতির সাথে পরামর্শ করে একমাত্র উপায় সাব্যস্ত করেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাম দেশ পশ্চাদপসরণ করে সকল মুসলমান সৈন্য প্রত্যাহার করা। এখানে আমি কোনো সাধারণ পশ্চাদপসরণের কথা বলছি না, কিন্তু এমন পশ্চাদপসরণ যাতে চারটি সেনাবাহিনী পেছনে যেতে যেতে শামের সীমান্তে গিয়ে অবস্থান নেবে এবং অধীনস্থ শহর ও এ রাজ্যের প্রথম বিজিত গ্রামের নিয়ন্ত্রণও ছেড়ে নেবে।

বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছিল মুসলমানরা পরাজয়কে মেনে নিয়েছে, কিন্তু সেটা আসল অবস্থান থেকে ছিল অনেক দূরে। বিজিত এলাকা থেকে

পশ্চাদপসরণ তাদের স্বার্থেই জন্য ছিল সবচেয়ে উপযোগী সিদ্ধান্ত, তাদের বিজয়ের দিকে এক ধাপ উন্নতি, পরাজয় নয়। সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং এ জায়গায় অবস্থান নিয়ে মুসলমানরা বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে। এভাবে তারা একসাথে শত্রুদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করার কৌশলকেই পছন্দ করে নিয়েছে। এটা ছিল হেরাকলের পরিকল্পনার বিপরীত কৌশল; সব সময় হীরাকল মুসলমান সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন রাখারই আশা করেছিল এবং এক এক করে চারটি সেনাবাহিনীকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

মুসলমানরা যেহেতু পশ্চাদপসরণ করে এক জায়গায় অবস্থান করতে চেয়েছিল, এজন্য সতর্কতার সঙ্গে ঐ অবস্থানস্থল নির্বাচন করার প্রয়োজন ছিল। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বাকি তিন সেনাপতিকে ইয়ারমুকে মিলিত হওয়ার কথা প্রস্তাব করেন। একটু পরেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পত্র হাতে এসে পৌঁছে। তিনি মুসলমানদের পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন এবং সবাইকে তিনিও ইয়ারমুকে একত্রিত হতে বলেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-জন যে ইয়ারমুকে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন, এটার মূল কারণ ছিল ইয়ারমুকের কৌশলগত অবস্থান, যাতে বিজ্ঞ ব্যক্তির একই চিন্তা করে—এরও আকস্মিক মিল পাওয়া যায়।^{২১৯}

ইয়ারমুকে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর চার সেনাপতিই সৈন্য প্রত্যাহারের সময় নিজেদের স্বার্থেই যতদূর সম্ভব শত্রুদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার ব্যাপারে রাজি হন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমস থেকে, শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু জর্দান থেকে এবং ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেস্ক থেকে তাদের স্ব স্ব সৈন্যদের প্রত্যাহার করেন। যেখানে এই তিন সেনাপতি সফলভাবে ইয়ারমুকে তাদের সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হন, সেখানে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এতটা ভালোভাবে তা করতে পারেননি। তিনি প্যালেস্টাইন থেকে ধাপে ধাপে সৈন্য প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি

^{২১৯} আল-আমালিয়াত আত-তাআরুদিয়াহ ওয়াদ-দিফাইয়াহ ইনদাল-মুসলিমিন (পৃ. ১৪৭)।

সম্পূর্ণভাবে তখনই সব সৈন্যকে ইয়ারমুকে জমা করতে সক্ষম হন যখন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ সময়ে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনবরত শত্রুদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। একটার পর একটা আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে আজনাদাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় (যে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ একটু পরেই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)।^{২২০}

আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু শামে তার বাহিনী নিয়ে যে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এ ব্যাপারে যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথম চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, তখন প্রতিউত্তরে আবু বকর লেখেন : অবশ্যই তোমার মতো মানুষ কখনও পরাজিত হয় না, কারণ এ রকম মানুষ খুব কমই রয়েছে। যখন দশ হাজার সৈন্য একত্রিত হয় (যেমন তোমরা হয়েছ), তারা কেবল তাদের গোনাহের কারণেই পরাজিত হয়। সুতরাং গোনাহ থেকে বেঁচে থাক এবং ইয়ারমুকে এসে একত্রিত হও যাতে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পার। প্রত্যেক নেতা যেন তার সঙ্গীদের (তার দলের সেনা সদস্যদের) নিয়ে নামাযে ইমামতি করে।^{২২১} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চার সেনাপতিকে নিয়ে যখন চিন্তা করছিলেন, তখন তিনি অনুধাবন করলেন যে, চার সেনাবাহিনীকে এক জায়গায় একত্রিত করা প্রয়োজন যাতে তারা একত্রে এক জায়গা থেকে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারে এবং বিচ্ছিন্ন জায়গায় নয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করলেন, ‘তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে, আর তাকে পরিত্যাগ করেন যে তাকে ছেড়ে দেয়।’^{২২২}

মদীনায় অবস্থান করেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ (সর্বাধিনায়ক) হিসেবে তার উপস্থিতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিকই উপলব্ধি করিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশ, জটিল পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া, যুদ্ধের গতিকে ঘুরিয়ে দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত

^{২২০} হুরব আল-ইসলাম ফিশ-শাম, আহমাদ মুহাম্মাদ (পৃ. ৪৫)।

^{২২১} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/২১১)।

^{২২২} আত-তারিখ আত-তাবারী (৪/২১১)।

শ্রেরণ, সেনাপতি নির্বাচনে বিচক্ষণতা এবং সামগ্রিক যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করে তিনি তার উপস্থিতিতে জানান দিয়েছেন। মদীনা অবস্থান করেই তিনি সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে যখনই সুযোগ পেয়েছেন যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন। তার কাছ থেকে বার্তা এত বেশি এবং এত দ্রুত আসত যে মনে হতো তিনি যেন প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করছেন। যখন সময়-সুযোগ কঠিন হয়ে পড়েছিল, তার সেনাপতিরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল, তখন তারা পারস্পরিক চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতির উপর নির্ভর করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুরও সিদ্ধান্ত এবং মূলত তিনি তাদের সঙ্গে থাকলে একই সিদ্ধান্ত নিতেন।

সুনির্দিষ্ট যুদ্ধকৌশল ছাড়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পরামর্শের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন। উপরে বর্ণিত চিঠিটি এর বাস্তব উদাহরণ। এটা তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন যেখানে তিনি মুসলমান সেনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বিজয় আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি পরাজয় ডেকে নিয়ে আসে—আল্লাহ তা'আলা তাদের ত্যাগ করেন।

চার সেনাপতিকে এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার আদেশ দেয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য একজন সেনাপতি নির্বাচন করার প্রয়োজন ছিল যাতে সব বাহিনীকে একই প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত করা যায়। প্রাথমিকভাবে তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এই দায়িত্ব খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিতে মনস্থ করলেন, যিনি তখন ইরাকে যুদ্ধরত ছিলেন। রোমানদের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর জন্য একজন সেনাপতি নির্বাচন কোনো সহজ বিষয় ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এমন একজন সেনাপতি দরকার ছিল যার মধ্যে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো যোগ্যতা রয়েছে, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ক্ষিপ্রতা রয়েছে, ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো পার্থিব বোধশক্তি রয়েছে এবং ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহস রয়েছে। একজনই কেবল এ চারগুণের

অধিকারী ছিলেন, এর সাথে ছিল তার দীর্ঘদিনের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অপূর্ব যোগ্যতা, এমন আরও অনেক গুণাবলি যা উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না—তিনি হলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে শামে যাত্রা করার আদেশ পেলেন, তখন তিনি এক দীর্ঘ এবং বিপদসংকুল সফরে রওনা হলেন যা একটু পরেই আলোচনা করা হবে।

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেনা পাঠানো অব্যাহত রাখলেন। রোমানরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শুরুতেই পরাভূত করার যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল যাতে তিনি মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধিতে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতে সময় না পান। সত্যিকার অর্থে তাদের নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল : ‘আল্লাহর শপথ! আমরা আবু বকরকে এত ব্যস্ত (যুদ্ধক্ষেত্রে) রাখব যে তিনি আমাদের ভূমিতে অতিরিক্ত অশ্বারোহী পাঠাতে সময়ই পাবেন না।’^{২২০} এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! খালিদ বিন ওয়ালীদদের মাধ্যমে আমি খ্রিস্টানদের আগে করায়ত্ত করব (শামে) যাতে তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা শোনার জন্য খুব কমই সময় পাবে।’^{২২১}

খুবই সামান্য সময়ের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অনেক লক্ষ্যই পূরণ করতে পেরেছিলেন। তিনি তার চারটি সেনাবাহিনীকে এক জায়গায় সমবেত করতে সমর্থ হন, ফলে তিনি অবস্থান ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একই প্রেরণা সৃষ্টি করেন; তিনি তার বাহিনী চতুষ্টয়ের জন্য সর্বাধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও যোগ্য ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন, এবং যুদ্ধের স্থানও নির্ধারণ করেন যেখান থেকে তার বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিত করবে। এভাবে যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন যে,

^{২২০} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/৫)।

^{২২১} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/৫)।

কীভাবে শামকে জয় করতে হবে এ ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকার ধারণা ছিল এবং তিনি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, আসন্ন জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ তার পক্ষ থেকেই হতে যাচ্ছে, হীরাকল এবং তার সেনাপতিদের পক্ষ থেকে নয়।

শামে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পৌঁছার আগে এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুই এ এলাকায় পুরো মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার অধিকার রাখেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ পদে নিয়োগের ব্যাপারে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই শুধু নির্দেশ দেননি, বরং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও এ ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এ কাজ তার দায়িত্বে নয়। অবশ্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচনের এ জটিল কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়েছে। ব্যাপারটি এ রকম ছিল না যে, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে খুব আশাহত হবেন, কারণ তিনি ছিলেন বিনয়ের পাহাড়; এটা ছিল ব্যক্তির আরও গভীর অনুভূতিকে বিবেচনায় আনা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে লেখেন : ‘আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে নিয়োগ করেছি, সুতরাং তাকে অমান্য করবেন না; বরং তার কথা শুনবেন এবং তার নির্দেশকে মেনে চলুন। আমি তাকে আপনার উপর নিয়োগ করেছি যদিও আমি জানি যে, আপনি তার চেয়ে উত্তম। আমি এ রকম করেছি কারণ, যুদ্ধের ব্যাপারে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে যা আপনার নেই। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে এবং আমাকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন। আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।’^{২২৫}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একাই শুধু আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুভূতির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন, তা নয়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি চিঠি লেখেন এবং তাতে লেখা ছিল : ‘খালিদ ইবনে ওয়ালীদদের পক্ষ থেকে আবু উবাইদার প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি প্রার্থনা করি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এবং আমাকে কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিন এবং দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচিয়ে দিন। আল্লাহর রাসূলের খলীফার নিকট থেকে আমি নির্দেশ পেয়েছি, আমি যেন শামের উদ্দেশে যাত্রা করি, সেখানকার সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধান করি এবং সব বিষয়ে দায়িত্ব নেই। আল্লাহর শপথ! আমি এ পদের জন্য কোনো অনুরোধ করিনি এবং এজন্য আমার কোনো ইচ্ছাও ছিল না। আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ ব্যাপারে কিছু লেখিনি। তবে এতে আপনার মর্যাদার সামান্যতম কমতি হবে না : আপনার আদেশ মেনে চলা হবে, আপনার মতামত গৃহীত হবে এবং আপনার পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া হবে না। সর্বোপরি আপনি হচ্ছেন মুসলিম নেতাদের নেতা এবং কেউই আপনার উচ্চ গুণাবলির কথা অস্বীকার করতে পারবে না এবং আমাদের কেউই আপনার পরামর্শ ছাড়া চলতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যে নেয়ামত দিয়েছেন, তা পূর্ণ করুন। আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিন। আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও শাস্তি বর্ষিত হোক।^{২২৬}

আমর ইবনে আত-তুফাইল ইবনে আমর আল-আজদি রাযিয়াল্লাহু আনহু এ চিঠির বাহক ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আরেকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা ছিল শামের মুসলমান সৈন্যদের প্রতি। সে চিঠিতে লেখা ছিল : আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাদের ইসলাম কবুল করার তাওফীক নসীব করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থাকা এবং তার উপর ঈমান আনার সুযোগ দিয়েছেন। এটা সত্যিকার অর্থেই বিরাট সৌভাগ্য এবং আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক অনেক বড় নেয়ামত। হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় কর এবং তার প্রশংসা কর। এতে তিনি তোমাদের আরও নেয়ামত দান করবেন। আমি তোমাদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থাস্থ্যের কামনা করি এবং সেই মহান সত্তা তা তোমাদের জন্য বহাল রাখবেন। তার কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আমি খলীফার পক্ষ থেকে আদেশ পেয়েছি তোমাদের

সাথে মিলিত হওয়ার। আমি খুবই আশাবাদী, আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তোমাদের উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তোমাদের এবং আমাকে ঈমানে হেফাজত করুন এবং ইসলামের উপর সুদৃঢ় রাখুন। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, তাদের তিনি যে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, তা আমাদেরও দান করেন। মা'আসসালাম।^{২২৭}

আল-জাবিয়ায় অবস্থান করার সময় আবু উবাইদা এবং তার সৈন্যবাহিনী এ দু-টি চিঠি গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের প্রতি চিঠি পড়ে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের খলীফার উপর এই সিদ্ধান্তের কারণে রহম করুন; স্বাগতম হে খালিদ এবং আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।'^{২২৮}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি এবং তার প্রতি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিক্রিয়া থেকে সহজেই এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মাহাত্ম্য বোঝা যায়—এটা এত উচ্চ মর্যাদার যে তাতে সত্যিকার অর্থে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মূর্ত হয়ে ওঠে। সাহাবীরা একে অন্যের সঙ্গে ঈমানের কারণেই সম্পর্কিত ছিলেন এবং ইসলামের মহান শিক্ষার আলোকেই একে অন্যের সঙ্গে লেনদেন করতেন। ইরাক ও অন্যান্য যুদ্ধে এত উচ্চমর্যাদার বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও এবং রোমানদের মতো বিশাল ক্ষমতাধর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে তার অন্যান্য মুসলিম ভাইদের থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবেননি। বরং তিনি ছিলেন বিনয়ী, যারা যোগ্য তাদের প্রশংসা করেছেন, নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি এবং তাকে মেনে চলার ওয়াদা করেছেন, যদিও তিনি খলীফা কর্তৃক নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছেন। এটা পারস্পরিক সম্মানবোধ। এজন্য আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দুআ করেছেন এবং বিনয় ও সম্মানের সঙ্গে

^{২২৭} কতেহ আশ-শাম, আল-আজদি (পৃ. ৬৮-৭২)।

^{২২৮} প্রাপ্ত।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগত জানিয়েছেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু দুজনেই আত্ম-অহংকার ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ছিলেন; তারা তাদের কাজ-কর্মে কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করতেন এবং দু'জনেই জাতীয় স্বার্থকে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার ঘটনা এবং তাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিক্রিয়া একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা থেকে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, ধর্মপ্রচারক, নেতা এবং জনগণের স্বার্থে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ শিক্ষা নিতে পারেন। জীবনে সফল হওয়ার জন্য নিজের স্বার্থকে ঠিক রেখে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন। মূল শিক্ষা হচ্ছে, যখন জনগণের স্বার্থে কাউকে নিয়োগ, ভাড়া বা পদচ্যুত করার প্রশ্ন আসে, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা না করে সকলের জন্য কল্যাণকর চিন্তাই করা উচিত, সকল মুসলমানদের জন্য, মুসলিম জাতির জন্য। এ নীতি প্রয়োগ করার সময় হয়তো বিশেষ কাউকে কোনো পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে না, কারণ অন্য কেউ হয়তো এ পদের জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এটা বাস্তবায়ন করা যতই কঠিন হোক না কেন, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

১। আজনাদাইনের যুদ্ধ

শাম রাজ্যে অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশে পশ্চিমধ্যে বুশরা করায়ত্ত করার জন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যাত্রা বিরতি করলেন। তারপর তিনি সোজা ইয়ারমুকের দিকে রওনা হন এবং সেখানে পৌঁছে মুসলিম বাহিনীর চার সেনাপতির তিনজনের সাক্ষাৎ পান; আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু, শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনও পশ্চাদপসরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। তিনি ইয়ারমুকে আসার জন্য জীবন-মরণ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শত্রুবাহিনী তাকে বাধা দিচ্ছিল, তার চলাচল সীমিত করে ফেলেছিল এবং অনবরত একটি পূর্ণ যুদ্ধের দিকে আহ্বান করছিল। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ

করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না, কারণ তারা সংখ্যায় রোমানদের তুলনায় অনেক কম। আবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ না করে ইয়ারমুক পৌছে সম্মিলিতভাবে রোমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে বলেছিলেন।

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কার্যত শামের একপ্রান্তে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন, আর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শামের আরেক দিকে সামরিক কৌশল, নিজ ও শত্রু বাহিনীর সক্ষমতা ও দুর্বলতা নিয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপরেও তিনি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা ভুলে যাননি যিনি তখনও জর্ডান নদীর উপকূল ঘেঁষে পশ্চাদপসরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং যিনি রোমানদের অনেক বড় ও শক্তিশালী এক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধোন্মুখ ছিলেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তার সামনে দু-টি পথ খোলা রয়েছে : হয় তিনি তাড়াতাড়ি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে হাজির হবেন এবং তার সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, অথবা তিনি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বার্তা পাঠাতে পারেন যে, তিনি যেন নিজস্ব বাহিনী নিয়েই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বেশ কিছু কারণে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমটি পছন্দ করেন। প্রথমত, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল; যদি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার নিজের সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেয়া হয়, ইয়ারমুকে ফিরে আসতে তার দীর্ঘ সময় লাগবে এবং বিষয়টি কঠিনও হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলিত হয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি যুদ্ধ করে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন, তাহলে রোমানদের সামগ্রিক শক্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে এটা একটি সফল প্রচেষ্টা হবে। অধিকন্তু রোমান বাহিনীকে ছত্র-ভঙ্গ করে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি ও গতি আনা সম্ভব হবে যাতে আসন্ন জয়-পরাজয়ের লড়াইয়ে নতুন উদ্যমে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে পারে। তৃতীয়ত, যদি তিনি ও আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের পরাজিত করতে পারেন, তাহলে এ পয়েন্টে রোমান বাহিনীকে শেষ করে দেয়া সম্ভব হবে এবং মুসলমানরা তখন বিভিন্ন দিক দিয়ে রোমানদের আক্রমণ করতে পারবে। ফলে রোমান সেনাপতিরা সব পয়েন্টে নিজেদের বাঁচানোর জন্য তাদের যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। সামগ্রিকভাবে এতদিন

পর্যন্ত আক্রমণাত্মক অবস্থায় থাকলেও এখন রক্ষণাত্মক হয়ে উঠবে এবং তা পুরো যুদ্ধের উপরই প্রভাব ফেলবে।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধীরগতিতে এবং সতর্কতার সঙ্গে পশ্চাদপসরণের কথা লিখে পাঠালেন যতক্ষণ তিনি এসে পৌঁছেন এবং তখন তারা একসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রোমান সৈন্যরা যখন যুদ্ধ করতে উদ্যত, তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছেন। এতে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মোট সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে উপনীত হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু পরিশেষে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বই পার্থক্য তৈরি করে। মুসলমানদের বাহিনী উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে। তাদের একদল মুজাহিদ শত্রুদের সারি ভেদ করে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং শত্রু সেনাপতিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। সেনাপতির মৃত্যুতে শত্রুরা আশাহত হয়ে যায় এবং দিগ্বিদিক পালাতে থাকে।^{২২৯}

আজদানাইনের যুদ্ধই শামে মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে প্রথম বড় যুদ্ধ। নিরাপদ ঘাঁটিতে অবস্থানরত রোমসম্রাট হীরাকল শীঘ্রই তার বাহিনীর পরাজয়ের কথা জানতে পারে। কেবল সম্রাট হিসেবেই নয়, বরং একজন যোদ্ধা হিসেবে এ পরাজয়ের পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এ রকম আরেকটি পরাজয়ই তার সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।^{২৩০}

মদীনার মুসলমানদের নিকটও এ যুদ্ধের ফলাফল পৌঁছে যায়। তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি থেকে এ খবর পান। এ চিঠিতে লেখা ছিল : আল্লাহর রাসূলের খলীফার প্রতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (‘আল্লাহর তরবারি’ যা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার)-এর পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি ছাড়া আর কোনো মা’বুদ নেই...হে আস-সিদ্দীক! আমরা মুশরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—এটা জানানোর জন্য লিখছি; তারা আজদানাইনে

^{২২৯} আবু বকর রা., নিযার আল-হাদিসি (পৃ. ৭০)।

^{২৩০} প্রাক্ত (পৃ. ৭১)।

আমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবহর একত্রিত করেছে। তারা তাদের ক্রস উঁচু করে ধরেছে, তাদের কিতাব খুলে হাতে নিয়েছে এবং আল্লাহর শপথ করেছে যে, তারা আমাদের ধ্বংস না করে অথবা তাদের ভূমি থেকে আমাদের বিতাড়িত না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হই। আমরা প্রথমে তীর দিয়ে যুদ্ধ শুরু করি এবং তারপর তরবারি চালাই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি পাহাড়-উপত্যকার গিরিপথে লড়াই করি। আমি আল্লাহর শৌকর আদায় করি তিনি তার ধর্মকে সম্মানিত করেছেন, শত্রুদের অপদস্থ করেছেন। আর তার নিবেদিত বান্দাদের সাহায্য করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত আপনার উপরও বর্ষিত হোক।’ এ চিঠি পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে বলে ওঠেন, ‘আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি মুসলমানদের সাহায্য করেছেন এবং যিনি এ বিজয় দান করেছেন যাতে খুশিতে আমার মন ভরে গেছে।’^{২৩}

২। ইয়ারমুকের যুদ্ধ

অপ্রতিরোধ্য বিজয় অর্জন করার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইয়ারমুকে এসে অন্যান্য মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন। মুসলিম সেনাশিবিরে নতুন করে প্রাণের ছোঁয়া লাগল। সবাই আনন্দিত হলো, যদিও যুদ্ধের তখনও অনেক বাকি। তাইদরের নেতৃত্বে রোমানদের বিশাল বাহিনী এসে ইয়ারমুকের নিকটবর্তী ‘ওয়াকওয়াসায়’ জমা হয়। সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে মুসলমানদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার। সুতরাং রোমানরা মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা থেকে ছিল ছয় গুণ বেশি।

ইয়ারমুকে মুসলমানদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রোমানরা নিকটস্থ নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থান নেয়। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, শত্রুরা

পেছনে নদীর কারণে ইতিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বললেন, ‘হে লোকসকল! আনন্দিত হও। বস্তুত আল্লাহ রোমানদের অবরুদ্ধ করে ফেলেছেন; আর অবরুদ্ধ কোনো বাহিনী ভালো কিছু আশা করতে পারে না।’^{২৩২}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের এমন কৌশল প্রয়োগ করলেন যা আরবরা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। তিনি পুরো বাহিনীকে অনেক দল ও উপদলে বিভক্ত করেন। তিনি নিম্নোক্তভাবে তার বাহিনীকে সাজিয়েছিলেন :

- ✓ তিনি কয়েকটি দল তৈরি করেন এবং প্রতিটি দলে একজন সেনাপতি নিয়োগ করে দেন। আবার প্রতিটি দলের মধ্যে দশ থেকে বিশটি উপদল তৈরি করেন।
- ✓ এভাবে তিনি মোট চল্লিশটি উপদল তৈরি করেন; প্রতিটি উপদল কোনো না কোনো দলের অধীনে ছিল; প্রতিটি উপদলেই একজন নেতা ছিল এবং প্রত্যেকটি উপদলে ছিল এক হাজার সৈন্য।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে তিনি তার বাহিনীকে এভাবে ভাগ করেছিলেন :

১। মুসলিম বাহিনীর মূল দলে আঠারোটি উপদল ছিল (মানে মোট আঠারো হাজার সৈন্য)। এই দলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার সঙ্গে ছিলেন ইকরিমা ইবনে আবি জাহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং কা'কা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু।

২। মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুতে ছিল দশটি উপদল (মানে দশ হাজার সৈন্য) এবং এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর তার সহযোগিতায় ছিলেন গুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

৩। আর বামবাহুতে ছিল দশটি উপদল এবং এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু।

৪। সম্মুখ দল : যুদ্ধের প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোনো অকস্মাৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাহারার প্রয়োজনে এই বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল। এতে সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল না।

৫। পশ্চাত দল : এই দলে পাঁচটি উপদল ছিল (মানে মোট পাঁচ হাজার সৈন্য) এবং এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সাইদ ইবনে যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। তবে এর সঙ্গে তিনি সৈন্যদের মধ্যে খাবার বণ্টন ও গণীমতের মাল সংগ্রহের কাজেও নিয়োজিত ছিলেন।

আরেকজন প্রসিদ্ধ সাহাবী এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু। আল মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (যিনি পরিকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করায় প্রসিদ্ধ ছিলেন) সৈন্যদের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে সূরা আনফাল এবং জিহাদ সংবলিত অন্যান্য আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতেন। তিনি তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুসলিম বাহিনীর বক্তা ছিলেন সুফিয়ান ইবনে হারব রাযিয়াল্লাহু আনহু; তিনি মুসলিম বাহিনীর এক সারি থেকে আরেক সারিতে গিয়ে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাতেন। পুরো সামরিক বাহিনীর সামগ্রিক নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তা বাহিনীর মধ্যখানে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বিখ্যাত সাহাবী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

যুদ্ধ একটু পরেই শুরু হবে। এটা বুঝতে পেরে প্রতিটি সাবডিভিশনের আমীর সৈন্যদের সারির মধ্যে আগে-পেছনে হেঁটে হেঁটে তাদের সাহস জোগাচ্ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকা ও ধৈর্যধারণ করার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিগণ আসন্ন যুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তারা জানতেন, এ যুদ্ধের ফলাফল শুধু ইয়ারমুক অথবা

তার নিকটবর্তী শহর কিংবা ঐ এলাকার ভাগ্যনির্ধারণ করবে না, বরং পুরো রোমান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশেষভাবে জানতেন যে, যুদ্ধের গতি যেকোনো যাক না কেন, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কারণে এতে অবশ্যই জয় অথবা পরাজয় নিশ্চিত হবে। মুসলমানরা যদি আসন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তাহলে শাম রাজ্যের অন্যান্য এলাকা বিজয়ের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে : তারপর হয়তো মুসলমানরা বাধার সম্মুখীন হবে, কিন্তু সেটা তাদের বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে এবং রোমানদের শাম রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে এত মারাত্মক সমস্যা হবে না। এ বিজয় মুসলমানদের এশিয়া এবং ইউরোপ অভিযানের পথকে সুগম করবে। বিপরীত দিকে তিনি এও জানতেন যে, মুসলমানরা যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহলে শাম রাজ্যের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে, চিরকালের জন্য না হলেও দীর্ঘকাল অবশ্যই।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সর্বশেষ তেজোদ্দীপ্ত ভাষণসমূহ

অনেক প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীই ইয়ারমুক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই কম অভিজ্ঞ মুসলমান সৈন্যদের সাহস জোগানোর জন্য বক্তব্য দিতে বলা হয়। এ উদ্দেশ্যে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যে বলেন,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন এবং আপনাদের স্থির ও অবিচল রাখবেন। হে মুসলিমগণ! ধৈর্য অবলম্বন করুন, কারণ ধৈর্য হলো কুফরী থেকে মুক্তির উপায়, প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যম এবং অপমান ও লজ্জা দমনকারী। আপনারা সারি ত্যাগ করবেন না। সাধারণ অবস্থায় শত্রুদের দিকে এক কদমও অগ্রসর হবেন না। প্রথমে নিজেরা যুদ্ধের সূচনা করবেন না। শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর তাক করে থাকবেন। ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করবেন। অবশ্যই নির্বাক ও নীরব থাকবেন। মনে মনে আল্লাহর যিকির করবেন। আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন।

আরেকজন প্রসিদ্ধ সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুও সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,

হে কুরআন অনুসারী লোকজন! কিতাব রক্ষাকারী মানুষগণ! সত্য হিদায়াতের সাহায্যকারীগণ! জেনে রাখুন, শুধু কামনা ও বাসনা দিয়ে আল্লাহর রহমত ও জ্ঞানাত পাওয়া যায় না। সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলা তার মাগফিরাত ও প্রশস্ত রহমত দান করেন না। আপনারা কি শোনেননি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُنْكِحَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই যেমন তিনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী।^{২৩৩}

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

হে মুসলিম জনতা! দৃষ্টি অবনত রেখো। সওয়ারীতে বস মজবুতভাবে। তীর তাক করে থেকো। শত্রুরা তোমাদের উপর হামলা করলে তাদের একটু সুযোগ করে দেবে। তারা যখন তোমাদের বর্শার নাগালে এসে যাবে, তখন সিংহের ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কসম সেই মহান সত্তার যিনি সত্যবাদিতাকে পছন্দ করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। যিনি মিথ্যাবাদিতাকে ঘৃণা করেন। তিনি সৎকর্মের প্রতিদান সৎকর্ম দিয়েই প্রদান করেন। আমি শুনেছি মুসলমানগণ এই দেশ জয় করবে। প্রত্যেক কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। প্রতিটি প্রাসাদ দখল করবে। সুতরাং শত্রুপক্ষের বিশাল সমাবেশ ও সংখ্যাধিক্য তোমরা

ভীত হয়ো না, ভয় পেয়ো না। এটা নিশ্চিত যে, তোমরা যদি যথোচিত হামলা চালাতে পার, তবে তারা উড়ে যাবে, ডাহুকের বাচ্চার ন্যায় পালিয়ে যাবে।

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যে বলেন,

হে মুসলমানগণ! আপনারা আরব জাতি। এখন আপনারা অবস্থান করছেন অনারব অঞ্চলে। তবে পরিবার-পরিজন থেকে এখন আপনারা বিচ্ছিন্ন। মুসলিম শহর নগর থেকে এবং আমীরুল মু'মিনীন খলীফা থেকে এখন আপনারা দূরে, বহু দূরে। এখন আপনারা শত্রুদের মুখোমুখি। শত্রু সংখ্যা বহু বেশি। আপনাদের প্রতি তারা খ্যাপা, মহাখ্যাপা। ইতিপূর্বে আপনারা তাদের দেশে এসে তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট এসে তাদের মালের ক্ষতি করেছেন, তাদের উপর আক্রমণ করেছেন। মনে রাখবেন, সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের মোকাবেলা না করলে এবং বিপদসংকুল স্থানে ধৈর্য না ধরলে আল্লাহ আপনাদের তাদের হাত থেকে মুক্তি দেবেন না। এবং তিনি আপনাদের প্রতি সম্বন্ধিতও হবেন না। সুতরাং আপনারা নিজ নিজ তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষা করুন এবং একে অন্যকে সাহায্য করুন।' তারপর আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের নিকট যান এবং তাদের নসীহত করে ফিরে এসে বলেন, 'হে মুসলিম জনতা! উপস্থিত হয়ে গিয়েছে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জান্নাত আপনারদের সম্মুখে। শয়তান ও জাহান্নাম আপনারদের পেছনের দিকে।' তারপর আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বস্থানে ফিরে গেলেন।^{২৩৪}

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

‘মুসলিমগণ! দ্রুত অগ্রসর হোন আয়তলোচনা হুরদের প্রতি এবং আপন প্রতিপালকের সান্নিধ্য অর্জনের দিকে, নেয়ামতে ডরপুর জান্নাতের দিকে। এখানে আপনারা আপনাদের প্রতিপালকের যত প্রিয় স্থানে অবস্থান করছেন অন্য কোনো স্থানে তা হয় না। জেনে রাখুন, ধৈর্যশীলদের জন্য তাদের মর্যাদা রয়েছেই।’

^{২৩৪} তারদিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (পৃ. ১৬৩)।

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল ডিভিশনে গিয়ে গিয়ে বলছিলেন,

আল্লাহ, আল্লাহ, হে সৈনিকগণ! তোমরা আরবদের প্রতিনিধি এবং ইসলামের সাহায্যকারী। তারা খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি এবং শিরকবাদের সাহায্যকারী। হে আল্লাহ! আপনার দিনগুলোর মধ্যে আজকের এই দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের উপর আপনার সাহায্য নাযিল করুন।^{২৩৫}

যখন দু-প্রতিপক্ষ মুখোমুখি, তখন একজন খ্রিস্টান আরব খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, ‘হায়! রোমানগণ সংখ্যায় কত বেশি! আর মুসলমানগণ কত কম!’ সংখ্যানির্ভর তার মন্তব্যের সত্যতার মতোই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, সংখ্যার উপর যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে না। তিনি বলেন, ‘তুমি কি আমাকে রোমানদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা ভয় দেখাচ্ছ? সত্যিকার অর্থে, জয়-পরাজয় সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং তা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। আল্লাহর সাহায্য পেলে কমসংখ্যক সৈন্য বেশিসংখ্যক সৈন্যে পরিণত হয় আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা এসে গেলে বহুসংখ্যক সৈন্যও কম সংখ্যার ন্যায় হয়ে যায়।’^{২৩৬}

মু’আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখনই খ্রিস্টান যাজক ও পাদরিদের শব্দ শুনতেন, তখনই বলতেন, ‘হে আল্লাহ! তাদের পা টলায়মান করে দিন। তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দিন। আমাদের উপর শাস্তি নাযিল করুন। আমাদের তাকওয়ার উপর অবিচল থাকতে দিন। শত্রুর মুখোমুখি হওয়াকে আমাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিন এবং আপনার ফায়সালায় রাজি ও সম্মত থাকার তাওফীক দিন।’^{২৩৭}

৩। রোমান বাহিনী

রোমানরা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্য তাদের স্বর্ণের মেডেল ও তারকাখচিত পোশাক পড়ে জাঁকজমকভাবে বের হতো। তাদের সঙ্গে ধর্মযাজক ও পাদরিরা ছিল। তারা ইনজিল পাঠ করে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত

^{২৩৫} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/১০)।

^{২৩৬} প্রাগুক্ত।

^{২৩৭} আবু বকর রা., রাজদৌলা (পৃ. ৮৮)।

করছিল। প্রচণ্ড বীরত্ব ও অহংকারের সঙ্গে তারা সংখ্যাগু ছিল অনেক। মুসলমানদের অবস্থান থেকে তাদের দিগন্তে কালো মেঘের মতো মনে হচ্ছিল; উচ্চস্বরে হাঁক-ডাকে তাদের সংখ্যাও অগণিত মনে হচ্ছিল।

রোমান বাহিনী ওয়াকওয়াসায় ক্যাম্প স্থাপন করে। এটি ইয়ারমুকের কাছেই ছিল। মুসলমান ও রোমানদের মাঝে ছিল একটি উপত্যকা। এটি উভয় বাহিনীর জন্য কৌশলগত অবস্থানের সূচনা করে। এ উপত্যকা ছিল একটি গভীর গর্ত অথবা পরিখা যা অতিক্রম করতে রোমানদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

রোমানরাও তাদের সৈন্যবহরকে অনেকগুলো ডিভিশনে ভাগ করেছিল। তারা মূলত দু-টি লাইনে ডিভিশন তৈরি করেছিল। প্রথম লাইনে ছিল বৃত্তাকার ডিভিশন। প্রতিটি বৃত্তে ছিল পাঁচটি ডিভিশন। আর প্রতিটি বৃত্ত থেকে অন্যটি উল্লেখযোগ্য দূরত্বে পৃথক অবস্থানে ছিল। দ্বিতীয় লাইনেও একই সংখ্যক ডিভিশন ছিল। একটাই পার্থক্য ছিল। সেটা হচ্ছে, তারা প্রথম লাইনে বৃত্তদের মধ্যে যে গ্যাপ ছিল, সেখানে দ্বিতীয় বৃত্তের ডিভিশনের অবস্থান ছিল।

রোমান সেনাবাহিনীর অবকাঠামোর আরও বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। তীরন্দাজ : তারা ছিল পুরো বাহিনীর অগ্রভাগে এবং বাতাসে একগুচ্ছ তীর নিক্ষেপ করে তাদের উপর যুদ্ধ শুরু করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তারপর তারা যখন তাদের দায়িত্ব পালন শেষ করবে, তখন তারা দুই লাইনে সাজানো বাহিনীর পেছনে অবস্থান করবে।

২। অশ্বারোহী : তারা বাহিনীর দুই বাহু বরাবর অবস্থান করছিল এবং তীরন্দাজদের রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত ছিল যতক্ষণ না তারা পশ্চাতে নিরাপদে ফিরে যায়।

৩। পদাতিক বাহিনী : তাদের কাজ ছিল সাধারণ। সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের আক্রমণ করা এবং শত্রুর ব্যুহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া।

রোমান বাহিনীর সম্মুখভাগের নেতৃত্বে ছিল জারাহ এবং দু-বাহুর নেতৃত্বে ছিল মাহান ও দারাকাস।

শেষ মুহুর্তে সমঝোতার চেষ্টা

মুসলিম ও রোমান সৈন্যগণ যখন মুখোমুখি, তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে একদল প্রতিনিধি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে গেল। এ দলে ছিলেন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু, দিরার ইবনে আযওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হারিস ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারা এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল যেন বোঝা যায় যে, তারা যুদ্ধ করার জন্য আসেননি এবং তারা রোমানদের আহ্বান করে বললেন, ‘আমরা তোমাদের সেনাপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং কথা বলতে চাই।’ তাদের অনুমতি দেয়া হলো। তাদের বিশেষ পাহারায় রোমান সেনাপতি তাযারুক-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। তাযারুক রেশমের তৈরি এক তাঁবুর মধ্যে বসে ছিল। মুসলিম প্রতিনিধিরা এই বলে তাঁবুতে প্রবেশ করতে অনীহা প্রকাশ করল, ‘এমন স্থানে প্রবেশ করা আমরা বৈধ মনে করি না।’ তারপর তাদের জন্য রেশমের তৈরি একটি কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হলো। সাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন, ‘আমরা এটার উপর বসব না।’ তারপর সাহাবায়ে কেরামের পছন্দমতো ব্যবস্থাপনায় তাযারুক তাদের সাথে আলোচনায় বলল এবং উভয় পক্ষ সন্ধিস্থাপনে রাজি হলো। কিন্তু যেহেতু তাযারুক ইসলামধর্ম কবুল করা অথবা জিয়িয়া ট্যাক্স প্রদান করা—উভয়টাকেই অস্বীকার করল, আলোচনা আর বেশি দূর এগুলো না এবং মুসলিম প্রতিনিধিদল নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এলেন।^{২৩৮}

ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে, রোমানরাও সন্ধি স্থাপনে চুক্তির শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। মাহান খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উভয়পক্ষের মাঝখানে এসে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। মাহান এই বলে তার বক্তব্য শুরু করে, ‘আমরা জানি যে, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ আপনাদের এই কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং

আসুন আমরা এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হই যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দশ দিনার, কিছু জামা-কাপড় ও খাদ্য প্রদান করব আর আপনারা তা নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন। আগামী বছরও আমরা আপনাদের জন্য অনুরূপ দান-দক্ষিণা প্রেরণ করব।’ মাহান খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, কিন্তু খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জবাব ছিল এর অনেক উর্ধ্বে। তিনি বললেন,

আপনি যা বলেছেন মূলত আমরা সেজন্য বের হইনি। আমরা বরং এজন্য বের হয়েছি যে, আমরা রক্ত পিপাসু জাতি। আর আমরা জানতে পেরেছি যে, রোমানদের রক্ত খুব ভালো ও মজাদার। আমরা এই রক্ত পান করার জন্য এসেছি।^{২৩৯}

যুদ্ধের শুরু

শান্তিচুক্তি করার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীর দু-বাহুর সেনাপতি ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং কা'কা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। তারা প্রথমে শত্রুদের দৈত লড়াইয়ের আহবান করলেন এবং তারপরই পূর্ণরূপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে এক রোমান সেনাপতির ইসলামগ্রহণ

রোমানদের অন্যতম সেনাপতি জুরজা তার বাহিনীর সম্মুখভাগে অগ্রসর হয়ে দু-পক্ষের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব দিলেন। উভয়পক্ষের সব সৈন্যদের সামনে তাদের দু-জনের কথা বলার প্রক্রিয়ায় মনে হচ্ছিল জুরজা শান্তিচুক্তি করার জন্য শেষ চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেনাবাহিনী কিংবা যুদ্ধ সম্পর্কে তার মনে চিন্তা খুব কমই ছিল, বরং তিনি কিছু প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ছিলেন।

^{২৩৯} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/১০)।

তারা যখন একসঙ্গে মিলিত হলেন, তারা এত কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন যে, উভয়ের ঘোড়ার কাঁধ মিলে গেল। জুরজা বললেন, ‘হে খালিদ, আমি আপনার কাছে কিছু তথ্য জানতে চাই। আপনি আমার সাথে সত্য বলবেন, মিথ্যা নয়। কারণ, স্বাধীন ও সাহসী ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না। আমার সাথে প্রতারণা করবেন না। কারণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা করে না। বলুন তো, আল্লাহ তা’আলা কি আপনাদের নবীর নিকট আকাশ থেকে কোনো তরবারি নাযিল করেছিলেন যে, নবী নিজে ঐ তরবারি আপনাকে হস্তান্তর করেছেন। আর ঐ তরবারি আপনি যার উপর চালান সেই পরাজিত হয়—পরাস্ত হয়।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘না (তা সত্য নয়)।’ জুরজা বললেন, ‘তাহলে আপনাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) বলা হয় কেন?’ উত্তরে খালিদ বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আমাদের নিকট তার নবীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের আল্লাহর পথে ডেকেছেন, আমরা সকলে তার নিকট থেকে পালিয়েছিলাম এবং দূরে, বহু দূরে সরে গিয়েছিলাম। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং তার অনুসরণ করে। আমাদের কতক তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার থেকে বহু দূর চলে যায়। আমি ছিলাম তাদের দলে যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দূরে সরে গিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা’আলা আমাদের অন্তর ও কপাল চেপে ধরলেন এবং তার মাধ্যমে আমাদের হেদায়েত ও সত্যপথ দেখিয়েছেন। আমরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছি। তার অনুসরণের অঙ্গীকার করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তুমি আল্লাহর নিকট তরবারি, এই খোলা তরবারি আল্লাহ তা’আলা মুশরিকদের উপর নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহ তা’আলার দরবারে দুআ করলেন। এই প্রেক্ষাপটে আমি ‘সাইফুল্লাহ’ নামে আখ্যায়িত হয়েছি। আর আমি মুশরিকদের জন্য সর্বাধিক কঠোর ব্যক্তি।’

জুরজা বললেন, ‘খালিদ! আপনারা কোনো বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকেন?’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমরা ডাকি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল এবং এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য।' জুরজা বললেন, 'যদি কেউ আপনাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তার কী অবস্থা হবে?' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাহলে সে জিযিয়া কর দেবে এবং বিনিময়ে আমরা তার জ্ঞানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।' জুরজা বললেন, 'যদি সে ব্যক্তি জিযিয়া কর দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কী হবে?' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' জুরজা বললেন, 'আজকের এই মুহূর্তে যদি কেউ আপনাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে তার কী অবস্থা হবে?' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাহলে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সে এবং আমরা সকলের অবস্থান এক হয়ে যাবে। সে আমাদের সমমর্যাদার হয়ে যাবে। আশরাফ-আতরাফ উঁচু-নীচ ও পূর্ববর্তী-পরবর্তী সব একই মর্যাদার অধিকারী।' জুরজা বললেন, 'যে ব্যক্তি আজ ইসলাম গ্রহণ করে আপনাদের দলভুক্ত হবে, তবে তার আর আপনাদের সওয়াব ও পুণ্য কি এক সমান হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তাই হবে। তবে সে আরও উত্তম পুণ্য পাবে।' জুরজা বললেন, 'ঐ ব্যক্তি কিভাবে আপনাদের সমান হবে অথচ ইসলাম গ্রহণে আপনারা তার চেয়ে অগ্রবর্তী ও পুরোনো।' খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি বাধ্য হয়ে। তারপর আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি যখন তিনি জীবিত ছিলেন। তার কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসত। তিনি আমাদের কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয় জানাতেন। তিনি আমাদের বিভিন্ন নিদর্শন ও মু'জিয়া দেখাতেন। আমরা যা দেখেছি কেউ তা দেখলে এবং আমরা যা শুনেছি কেউ তা শুনেলে সে ইসলাম গ্রহণ ও বাইআত সম্পাদনে বাধ্য হয়ে পড়ে। ইসলাম গ্রহণ ও বাইআত সম্পাদন তার কর্তব্য হয়ে যায়। আমরা যা স্বচক্ষে দেখেছি, আপনারা তো তা দেখেননি। আমরা যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ও প্রমাণাদি শুনেছি, আপনারা তা শোনেননি। তা সত্ত্বেও আপনাদের কেউ যদি খাঁটি নিয়তে, স্বচ্ছ বিশ্বাসে এই ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে সে আমাদের চাইতে উত্তম।'

জুরজা তারপর একটি মন্তব্য করলেন যা প্রশ্নের মতো শোনাল, 'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমার নিকট সত্য বলেছেন তো?' খালিদ

রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনার নিকট সত্য বলেছি এবং আল্লাহ সম্পর্কে আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন।’ তখন জুরজা তার ঢাল উলটিয়ে ধরেন এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মুসলিম তাঁবুর দিকে অগ্রসর হন। পশ্চিমধ্যে একসঙ্গে চলার সময় জুরজা বললেন, ‘আপনি আমাকে ইসলাম শিখিয়ে দেন।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তাঁবুতে নিয়ে মশক থেকে পানি ঢেলে অযু করিয়ে দেন এবং তাকে নিয়ে দু-রাকাত নামায আদায় করেন। জুরজা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে যাবার সাথে সাথে রোমানগণ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। জুরজার গমনকে তারা মনে করেছিল তাদের পক্ষে সেটা আক্রমণ। হঠাৎ আক্রমণে তারা মুসলমানদের পিছু সরিয়ে দেয়। তবে বিশেষ রক্ষীবাহিনীকে পারেনি। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হারিস ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{২৪০}

রোমানদের বামবাহু বা বাম দিকের বাহিনী কর্তৃক মুসলমান বাহিনীর ডানবাহু বা ডান দিকের বাহিনীকে আক্রমণ

রোমানদের পুরো বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। তাদের বামবাহুর সৈন্যরা মুসলমানদের ডানবাহুর সৈন্যদের আক্রমণ করে এবং একটু পরেই ডান বাহুর কেন্দ্রস্থলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ শূন্যতা যেমন প্রশস্ত ছিল, তেমনি ছিল গভীর। এতে কেবল চরম ক্ষতিই হয়নি, বরং মারাত্মক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে রোমানরা আক্রমণ করতে করতে মুসলমানদের শেষ সারিতে পৌঁছে যায়। বিপর্যয়ের এই কঠিন মুহূর্তে মু’আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বলে ওঠেন, ‘হে আল্লাহর বান্দারা! এ লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে; আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তোমরা তাদের মোকাবেলায় সত্য ও দৃঢ় হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের এ ব্যবসায় ধৈর্যধারণ করবে, ততক্ষণ তারা পশ্চাদপদ হবে না অথবা তাদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না।’ তারপর তিনি তার ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন এবং বললেন, ‘কে আছে যে আমার ঘোড়া

নিতে চায়, তাহলে সে তা নিয়ে যাক এবং তাতে চড়ে জিহাদে বাঁপিয়ে পড়ুক।’ তিনি আরও কঠিন লড়াই করার পন্থা বেছে নিলেন; তিনি পদাতিক বাহিনীর সাথে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে লাগলেন।^{২৪১}

আযদ, মুযহাজ, হাযারা মাউত ও খাওলান গোত্রের সৈন্যগণ খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল যাতে শত্রুরা তাদের সারিকে ছত্রভঙ্গ করতে না পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের ন্যায় রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের উপর হামলা করে। মুসলিম সৈন্যগণ ডানবাহু থেকে সরে গিয়ে মূল সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়। ঐ মুহূর্তে কিছু মুসলমান যারা ডানবাহুর পেছনের সারিতে ছিল, তারা মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ফলে তারা অরক্ষিত হয়ে পড়েন এবং শত্রুর সহজ লক্ষ্যে পরিণত হন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যদের বিরাট এক দেয়াল মাটি কামড়ে লড়াই শুরু করলে তাদের এ বিপদ কেটে যায়। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তাদের পিছু হটিয়ে দেন এবং পেছনের মুসলিম সারিকে শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এ সময় কিছু মুসলমান সৈন্য যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে মেতে চাইলে অপেক্ষমাণ মুসলিম মহিলাগণ তাদের পাথর নিক্ষেপ করে ও কাঠ দিয়ে প্রহার শুরু করে। তারপর তারা যুদ্ধের ময়দানে স্বস্থানে ফিরে আসেন এবং লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকেই পালিয়ে যাওয়া এবং মুসলিম ভাইদের নিকট কাপুরুষ হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার চেয়ে প্রিয় মনে করেন।^{২৪২}

একজন যিনি নিশ্চিতভাবেই পলায়ন করেননি, তিনি হচ্ছেন ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে কেউ পালানোর কথা বললে তিনি জবাব দেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আমি বহু যুদ্ধ করেছি। আর হে খ্রিস্টানগণ, তোমাদের মোকাবেলায় আজ আমি পালিয়ে যাব?’ তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন, ‘কে আছ মৃত্যুবরণের জন্য শপথ করতে পার?’ তার আহবানে তার চাচা হারিস এবং দিরার ইবনে আযওয়ারসহ প্রায় চার, নেতৃস্থানীয় অশ্বারোহী মুজাহিদ শহীদ হওয়ার জন্য শপথ করেন। তারা সবাই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর তাঁবুর

^{২৪১} আল-আমালিয়াত আত-তারদিয়াহ ওয়াদ-দাফিয়াহ (পৃ. ১৬৯)।

^{২৪২} কভেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ২২২)।

সম্মুখে অবস্থান নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাদের সকলে আহত হন। অনেকেই শাহাদাতবরণ করেন। শহীদদের মধ্যে অন্যতম হলেন দিরার ইবনে আযওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{২৪৩}

ইকরিমা এবং তার সঙ্গে মৃত্যুর শপথ গ্রহণকারী সম্পর্কে ওয়াকিদী একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আহত হওয়া সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, তখন তারা পানি চেয়েছিলেন। কিছু পরিমাণ পানি সেখানে আনা হলো। তাদের একজনের নিকট পানি আনা হলে অন্য একজন সেদিকে তাকিয়েছিলেন। তাই প্রথমজন বললেন, ‘পানি আগে তাকে দিন।’ তার নিকট পানি আনা হলে অন্য একজন সেদিকে তাকিয়েছিলেন। ফলে দ্বিতীয়জন পানি পান না করে বললেন, ‘অমুককে দিন।’ এভাবে তারা একে অন্যের নিকট পানি পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সকলে মারা গেলেন। কেউই পানি পান করলেন না। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

বর্ণিত আছে যে, ইয়ামুক যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন যে ব্যক্তি তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ‘আমি আমার লক্ষ্য পূরণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কি কোনো সংবাদ পাঠাবেন? তার সাথে কি আপনার কোনো প্রয়োজন আছে?’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, আছে। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার সালাম জানাবেন আর বলবেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তার সবগুলোই সত্য ও সঠিক পেয়েছি।’ তারপর ঐ ব্যক্তি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সেদিন প্রত্যেক দল নিজ নিজ পতাকার অধীনে অবিচল থাকে। রোমানগণ তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল যেন তারা যাতাকল। পরিশেষে ইয়ামুকের যুদ্ধ সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হয়। এ রকম ভয়াবহ যুদ্ধে সাহাবীরা এর আগে কখনো অংশগ্রহণ

করেননি। বর্ণনায় বলা হয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মগজ, ছড়ানো-ছিটানো হাতের কবজি ও উড়ন্ত হাতের তালু ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি।

রোমানদের ডান দিকের বাহিনী কর্তৃক মুসলমান বাহিনীর বাম দিকের বাহিনীকে আক্রমণ

কনাতির, রোমানদের ডান দিকের বাহিনীর সেনাপতি, মুসলমানদের বামবাহুর উপর সর্বাঙ্গিক আক্রমণ পরিচালনা করে। কিনানাহ, কাইস, খুসাম, যুদাম, কুদাহ, আমিলাহ এবং গাসসান গোত্র মুসলমানদের বাম দিকের বাহিনীতে নিয়োজিত ছিল। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় এ বাহিনী তাদের জায়গা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং মুসলমানদের বাম দিকের বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশ বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়ে। রোমানরা পলায়নপর মুসলমানদের ধাওয়া করে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে নিয়ে যায়। এ সময় পালিয়ে যেতে চাওয়া মুসলমানরা অপেক্ষমাণ মহিলাদের মুখোমুখি হন এবং মহিলারা তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে এবং কাঠ দিয়ে প্রহার শুরু করে। মহিলারা বলতে থাকে, ‘হে পলাতক ব্যক্তি! তুমি পালাচ্ছ সতী-সাক্ষী মহিলাদের ফেলে রেখে। জেনে রাখ, অবিলম্বে তুমি তাদের খ্রিস্টানদের হাতে বন্দী দেখতে পাবে।’ এ কথা শুনে যুজাহিদরা লজ্জিত হন, তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। তারা ফিরে এসে আবার যুদ্ধ শুরু করেন। তবে এবার আরও নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে এবং ভয়হীন অন্তঃকরণে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে থাকেন। যুদ্ধের এ পর্যায়ে সাইদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন।

রোমানদের বামবাহুর সৈন্যরা মুসলিম ডান দিকের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আরও একবার চেষ্টা করে; তারা তাদের আক্রমণ আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনীর দিকে কেন্দ্রীভূত করে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও রোমানরা মুসলিম বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। পশ্চাতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়ে যেসব মুসলমান যোদ্ধা পলায়নে উদ্যত হয়েছিলেন, তাদের মুসলমান মহিলারা প্রহার করেছেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, ‘আল্লাহ ঐ চেহারাকে কালিমাযুক্ত করুন যে তার জীবন নিকট থেকে পলায়ন করে।

আল্লাহ ঐ চেহারাকে কালিমাযুক্ত করুন যে তার সম্মান বিসর্জন দিয়ে প্রিয়জন থেকে পলায়ন করে।' অন্যান্য মহিলারাও বলতে থাকে, 'আমাদের যদি তোমরা রক্ষা না কর, তাহলে তোমারা আমাদের স্বামী নও।' এসব কথা শুনে মুজাহিদরা আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। তারা আরও নতুন প্রেরণায় যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে। পরিপূর্ণ ও নতুন শক্তি ও উৎসাহে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তারা রোমানদের উপর বিজয় এবং পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

যুদ্ধের গতির অকস্মাৎ পরিবর্তন যা যুদ্ধের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করে

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার অধীনস্থ একদল চৌকস অশ্বারোহী শত্রুসৈন্যের বামবাহুর উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করে যারা তখন মুসলমানদের ডানবাহুর উপর আক্রমণে ব্যস্ত ছিল। মুসলমানগণ রোমানদের এই বামবাহুকে অনবরত আক্রমণে অস্থির করে মূল সৈন্যদলে মিশিয়ে দেন। এই হামলায় প্রায় ছয় হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়।

যুদ্ধের শুরুতে রোমানরা শক্ত অবস্থানে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় যুদ্ধক্ষেত্রের সকল অবস্থানে নিয়ন্ত্রণ হারায়। তারপর চেষ্টা করেও তারা মুসলমানদের শিবিরে তেমন কোনো মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারেনি। এ সময় রোমান ও মুসলমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার অনুপাত ছিল ৬:১। ঐ মুহূর্তে শত্রুদের মনোবল ছিল চরম দুর্বল। এর মধ্যে যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনী ছয় হাজার রোমান সৈন্য হত্যা করে ফেলে, তখন তাদের মানসিক অবস্থা আরও করুণ হয়ে ওঠে। তারা নিজেরা একে অন্যকে প্রশ্ন করতে থাকে, এত ছোট বাহিনী কীভাবে এত দুর্জেয় হয়ে উঠতে পারে? পারদর্শী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের মতোই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিকই শত্রুদের মনোবলের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে সাফল্যের সাথেই তাদের মনোবল গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আক্ষরিক অর্থেই ভীত-বিহ্বল শত্রুর অন্তরের অবস্থা অনুভব, দেখা এবং এমনকি তার ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। যুদ্ধের প্রধান অংশ—যেখানে অস্ত্রের পরিবর্তে শত্রুর মানসিক অবস্থার উপর বেশি কাজ করা হয়—শেষ হয়েছে। আল্লাহর সাহায্যে

রোমান সৈন্যদের অন্তরে দু-টি অনুভূতি (যার কোনটি অপরটি থেকে ভয়াবহ, আমি জানি না) দানা বাঁধে : ভয় এবং আশাহীনতা। আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় যখন হতের মুঠোয়, তখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, 'ঐ সম্ভার কসম যার হাতে আমার জীবন, শত্রুপক্ষের আর ধৈর্য ও শক্তি নেই। আমি আশা করছি, আল্লাহ তা'আলা অবিলম্বে তাদের উপর তোমাদের ক্ষমতা দান করবেন (যাতে তোমরা তাদের হত্যা করতে পার)।'

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর এমন একটি কাজ করলেন যাতে তার জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা, শহীদ হওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং সুযোগকে কাজে লাগানোর অপূর্ব যোগ্যতা মূর্ত হয়ে ওঠে। মাত্র একশ'জন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে শত্রুর একেবারে কেন্দ্রে আঘাত হানেন যেখানে এক লাখ রোমান সৈন্য অবস্থান নিয়েছিল। হয়তো কোনো প্রচণ্ড ভীতি যা তাদের অন্তরকে ঘিরে রেখেছিল অথবা নিশ্চিত পরাজয় অথবা মুসলমান সৈন্যদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধূলিঝড়ের মধ্যে তাদের অধিক সংখ্যার ব্যাপারে মিথ্যা অনুমান—যে কারণেই হোক, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনী পৌছার আগেই রোমান সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক পালাতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য মুজাহিদরাও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুসরণ করে এবং দ্বিধায় আচ্ছন্ন ভীত-বিহ্বল রোমান সৈন্যদের হত্যা করতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর ডানবাহু রোমানদের পালানোর সব পথ অবরুদ্ধ করে ফেলে। ফলে রোমানরা ইয়ারমুক উপত্যকা এবং আয-যারকা নদীর মধ্যখানে বন্দী হয়ে পড়ে।

তারপর মুসলিম বাহিনী রোমানদের পদাতিক বাহিনী থেকে তাদের অশ্বারোহীদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে রোমান অশ্বারোহীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমান অশ্বারোহীদের পালানোর জন্য আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটু সুযোগ তৈরি করে দিতে আদেশ দেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আদেশ পালন করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব রোমান অশ্বারোহী যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যার এবং এভাবে তারা পদাতিক বাহিনীকে তাদের নিয়তির উপর ছেড়ে দেয়। নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর রোমান পদাতিক

বাহিনী পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে যার এবং তাদের আর কোথাও পালানোর জায়গা থাকে না। আরও মারাত্মক বিষয় হলো, তারা একে অন্যের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। এ কৌশল তারা নিজেরাই প্রয়োগ করেছিল যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালাতে সক্ষম না হয়।

অশ্বারোহীদের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তাহীন রোমান পদাতিক বাহিনী নিজেদের ফাঁদে আটকে গেল—একদিকে অতলম্পর্শী গিরিগহ্বর, অন্যদিকে ইয়ারমুক উপত্যকা। তারপর রাতের অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে। পেছনে সরতে সরতে রোমান যোদ্ধারা গিরিগহ্বরে গিয়ে পড়তে থাকে—এটা এত মারাত্মক পতন যাতে নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। আর তারা যেহেতু শেকল দ্বারা বাঁধা ছিল, এজন্য একজন পড়লে তার সঙ্গে পুরো দলই গর্তে পড়ে যেত। যুদ্ধের এ পর্যায় মুসলমানরা রোমানদের অধিকাংশ সৈন্যকে হত্যা করে। ঐতিহাসিকগণের মতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। আর যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তাদের মধ্যে কিছু শামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং কিছু দামেস্কে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে যারা বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ছেলে ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত তার পিতার নসীহতে উজ্জীবিত হয়ে প্রচণ্ড সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার সাথে লড়াই করেন। একবার তার পিতা আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, ‘পুত্র! অবশ্যই আল্লাহর ভয় অবলম্বন করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। কারণ, এখন এই যম্মদানে এমন কোনো মুসলমান নেই, যে যুদ্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। তাহলে তুমিসহ তোমার মতো অন্যান্য দায়িত্বশীল নেতাদের কী ভূমিকা পালন করা দরকার? তারাই তো ধৈর্যধারণ ও উপদেশ গ্রহণে অধিকতর উপযুক্ত। সুতরাং হে পুত্র! আল্লাহকে ভয় কর। আর সওয়াব অর্জন, যুদ্ধে ধৈর্যধারণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনায় তোমার কোনো সাথী যেন তোমার চেয়ে অধিক উদ্যমী ও অগ্রগামী না হতে পারে।’ ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ, আমি তা করব।’ সেদিন তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ করে পিতার কাছে কৃত ওয়াদা রক্ষা

করেছিলেন। আর আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল তার ছেলেকেই উৎসাহ জোগাননি, বরং আরও অনেককেই এ রকম উৎসাহ-উদ্দীপনায় জাগ্রত করে তুলেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একদল থেকে আরেক দলে গিয়ে মুজাহিদদের উপদেশ দিয়ে সাহস জুগিয়েছেন। সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, ইয়ারমুক দিবসে প্রচণ্ড হৈচৈ, রৈরৈ শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আমরা একটি আহবান শুনলাম। ঐ আহবানে প্রায় সকল মুসলিম সেনা গুনেছে। বলা হচ্ছিল, ‘হে আল্লাহর সাহায্য! নিকটবর্তী হও। হে মুসলিম সৈন্যবাহিনী স্থির থাক, অবিচল থাক।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম ঐ আহবানকারী হলেন আবু সুফিয়ান। তিনি তার পুত্র ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পতাকার নিচে অবস্থান করছিলেন।^{২৪৪}

সেদিন এশার নামায বিলম্বিত হয়। বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর এ নামায আদায় করা হয়।^{২৪৫} খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ রাত পুরোটাই অতিবাহিত করেছেন ‘তায়ারুক’-এর তাঁবুতে। তায়ারুক হলো হিরাক্রিয়াসের ভাই। সে ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রোমান সৈন্যের সর্বাধিনায়ক। মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যরা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর তাঁবুর সম্মুখে বীরদর্পে টহল দিচ্ছিল। ঐ পথে যাতায়াতকারী সকল রোমান সৈন্যকে তারা হত্যা করেছিল। ভোর পর্যন্ত তারা এভাবে অভিযান পরিচালনা করে। মৃত রোমান সৈন্যদের মধ্যে তায়ারুকও ছিল, যে বিজয়ীদের জন্য অনেক দামি ও মূল্যবান গনীমতের মাল রেখে যায়। সকাল বেলা মুসলমান সৈন্যগণ গনীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়।^{২৪৬}

ইয়ারমুকের যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণ ঐদিন কত কঠিন বিজয় অর্জন করেছিলেন। তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত সাহাবীও ছিলেন; যেমন ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার পুত্র আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, সালামাহ ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবান ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু

^{২৪৪} তারতিব ওয়া-তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (পৃ. ১৭৩)।

^{২৪৫} তারতিব ওয়া-তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (পৃ. ১৭৩)।

^{২৪৬} তারতিব ওয়া-তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (পৃ. ১৭৩)।

আনহু।^{২৪৭} আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, যদিও রোমানরা মুসলমানদের থেকে ছয়গুণ বেশি ছিল, কিন্তু নিহতদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে রোমানদের অনেক বেশি ছিল—প্রায় চল্লিশগুণ বেশি। সুনির্দিষ্টভাবে রোমানদের ১,২০,০০০ সৈন্য নিহত হয়েছিল। এ খবরে রোমান সম্রাট হীরাকল প্রচণ্ডভাবে মুষড়ে পড়েছিল।

মুসলমানগণ ঐদিন খুব বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তারা একইভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য শোকরগুজারি করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই আনন্দ অকস্মাৎ বেদনায় পরিণত হয়। তারা শীঘ্রই জানতে পারেন যে, খলীফা আবু বকর আস-সিদীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেছেন। সব মুজাহিদকে প্রচণ্ড দুঃখ ও কষ্ট আচ্ছন্ন করে ফেলে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের খবর আসলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই এসেছিল। কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ রকম একটি ভয়াবহ যুদ্ধের আগে খলীফার ইন্তেকালের খবর দিয়ে সৈন্যদের মনোবল হ্রাস করতে চাননি। তিনি যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ শেষে এই দুঃসংবাদ সবাইকে জানিয়েছেন।

সত্যিকার অর্থে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো এই উম্মতে কেউ ছিল না। তবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতোই যোগ্য ছিলেন। খলীফা হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি প্রথম কাজ যেটা করেন, সেটা হলো সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে আবু উবাইদা ইবনে আল-জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনয়ন দেন। এটা নিশ্চিত যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না অথবা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোনো দুর্বলতাও এর কারণ, ছিল না। প্রচণ্ড ধীশক্তি ও বীরত্বের সাথে শাম দেশে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে তিনি খলীফার এ আদেশ শিরোধার্য করে নেন এবং শ্রদ্ধার সাথে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে সরে আসেন।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দায়িত্ব চরম নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং সাহসিকতার সাথে সম্পন্ন করেছেন; এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল বিজয় লাভ করেছেন; তথাপি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করেছেন যে, এখন নতুন সেনাপতি নিয়োগের সময় এসেছে। সম্ভবত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে একের অধিক কারণ বিবেচনা করেছেন : একটা কারণ এই হতে পারে যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিজয় কেবল খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতেই হোক এটা চাননি, বরং এর পরিবর্তে তাকে বিনয়ী সৈন্য হিসেবেই রাখতে চেয়েছেন; সম্ভবত তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এই ক্ষেত্রে যে, সামরিক নেতৃত্ব ও কৌশলে পারদর্শী ব্যক্তির চেয়ে একজন সর্বোত্তম পরহেজগার ব্যক্তিই মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনার দাবি রাখে; অথবা এটা হতে পারে যে, আমি যেমন আগে উল্লেখ করেছি, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতা এবং অনমনীয়তা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নরম ও শান্ত মেজাজের প্রভাবে বদলে যাবে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন আবু উবাইদার নরম ও শান্ত স্বভাবকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতা ও অনমনীয়তা দ্বারা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। যাহোক, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বাভাবিক এবং উৎফুল্লচিত্তেই খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে মেনে নেন।^{২৪৮}

মুসলিম বাহিনীকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তেকালের সংবাদ দেয়ার সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মৃত্যুর ফায়সালা করে দিয়েছেন। তিনি আমার নিকট উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিলেন এবং সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শাসনকর্তারূপে মনোনীত করেছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা কম প্রিয় ছিলেন (ইসলামপূর্ব যুগে)। এখন তাকে ভালোবাসা আল্লাহ আমার জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।’^{২৪৯} একটু

^{২৪৮} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/১৪)।

^{২৪৯} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৭/১৪)।

পরেই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম দেশে মুসলিম বাহিনীর নতুন সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেন।

হিরাক্রিয়াসের জন্য ইয়ারমুকের পরাজয় বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাকে যখন এ অপমানজনক পরাজয় ও হাজার হাজার সৈন্যের নিহত হওয়ার খবর প্রদান করা হয়, তখন তিনি প্রথমে প্রচণ্ড আঘাতে অচেতন হয়ে যান এবং তারপর চেতনা ফিরে পেলেও চরম দুঃখ-কষ্ট তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একটু পরেই পরাজিত রোমান সৈন্যরা আনতাকিয়ায় তার নিকট এসে একত্রিত হয়। পরাজয়ের কারণ জানার জন্য তিনি প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের সর্বনাশ হোক! বল তো, যারা তোমাদের হত্যা করেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হচ্ছে, তারা কি তোমাদের মতো মানুষ নয়?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ, মানুষই তো।’ তিনি বললেন, ‘সংখ্যায় তারা বেশি না তোমরা?’ তারা বলল, ‘বরং আমরাই বেশি। সর্বক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে কী হলো যে, তোমরা একের পর এক পরাজয়বরণ করছ?’ তখন তাদের জনৈক প্রধান ও বিজ্ঞলোক সাহস করে জবাব দিল, ‘আমাদের পরাজয় আর তাদের বিজয় এজন্য যে, তারা রাতভর ইবাদত-বন্দেগী করে এবং দিনভর রোযা রাখে। তারা প্রতিশ্রুতি পালন করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়। অসৎকাজে বারণ করে, নিজেদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে আমরা রোমানগণ মদ পান করি, ব্যভিচারে লিপ্ত হই, হারাম ও অবৈধ কাজ করি, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, রাগান্বিত হই এবং জুলুম-বেইনসাফী করি। আল্লাহর অপহৃন্দের বিষয় বাস্তবায়নের নির্দেশ দিই। আল্লাহ যাতে সম্ভূষ্ট তা থেকে নিজেরাও বিরত থাকি, অন্যকেও বিরত রাখি। আর আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করি। এ পরিপ্রেক্ষিতে হীরাকল বললেন, ‘আপনি আমাকে ঠিক তথ্যটিই দিয়েছেন।’ হীরাকল এ বিজ্ঞলোকের কথাকে গ্রহণ করলেন। যেখানে কেউই তার সামনে তাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে সাহস পাচ্ছিল না, সেখানে এই বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ লোকটি তাকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সঠিক তথ্য দিয়েছে।



তৃতীয় অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ

প্রথম। আবু বকর রা.-এর পররাষ্ট্রনীতি

খেলাফতকালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যপূরণ করার চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো :

১। বিদেশি নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের মধ্যে ভয় ও সম্মম সৃষ্টি

কোনো দেশকে যদি অন্য কোনো দেশ ভয় না পায়, তাহলে সে দেশ নিজের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না। বরং এতে ঐ দেশ অন্য দেশের জন্য সহজ টার্গেটে পরিণত হয়। এমন দেশকে দখল করার জন্য অন্যরা অভিযান পরিচালনা করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এ সত্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল শত্রুর মনে ভয় বসিয়ে দেয়া। খেলাফতের শুরুতেই তিনি দু'ভাবে এ লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন।

প্রথমত, তিনি মুরতাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেছেন। নিশ্চিতভাবেই তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমরাষ্ট্রে স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, বিদেশি জাতিকে সামরিকশক্তি প্রদর্শন যাতে মুসলমানরা যে কোনো হুমকি ও বৈরিতাকে মোকাবেলা করতে সক্ষম, তা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিদেশি রাষ্ট্রগুলো আরব উপত্যকার উপর কড়া দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। বিদেশি রাষ্ট্র বলতে আমি এখানে মূলত রোমান ও

পারস্য সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দের বোঝাচ্ছি। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে কেবল দু-টি পরাশক্তিই বিদ্যমান ছিল; রোম ও পারস্য। তখন আরবদের যদি কোনো অবস্থান থেকে থাকে, তাহলে সেটা হলো, পর্যায়ক্রমে এই দুই পরাশক্তির কোনোটির পক্ষে ব্যবহৃত হওয়া। অধিকন্তু কিছু আরব এলাকা এই দুই পরাশক্তির জন্য বিভাজন হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন মুসলমান রাষ্ট্র বেড়ে উঠছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি মুসলিম সৈন্য প্রেরণ করে রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং তাদের শক্তিমত্তা পরীক্ষা করেছিলেন। এজন্য রোমানদের মতো পারস্যেরও আরবের ঘটনার দিকে খুব নজরদারী ছিল। তারা হতাশ হয়ে লক্ষ্য করছিল যে, মুসলমানরা একের পর এক মুরতাদ বাহিনীকে ধ্বংস করছে। স্বাভাবিকভাবেই পারস্য ও রোমান নেতারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, মুসলমান জাতি দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং প্রতিদিনই তাদের জন্য আরও মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুসলমানগণ দ্রুত এবং দৃঢ়তার সাথে আভ্যন্তরীণ হুমকির মোকাবেলা করেছে যা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। আর অবশ্যই এ দিকটি বিবেচনা করে রোমান ও পারসিকরা মুসলমানদের আক্রমণ করার আগে দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়েছে। মুসলমানদের ভয় এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে বিশাল ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছার কারণে তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বই ঘুরপাক খাচ্ছিল। এজন্য তারা প্রতিবেশী আরবদের আক্রমণ করে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী আরবরা তাদের আক্রমণ করেছে এবং তাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে।

আর দ্বিতীয়ত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এ বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে শত্রুর মনে গভীরভাবে ভয় ও শঙ্কার ক্ষত সৃষ্টি করে দেয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ করে রোমানদের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা জানত যে, মুরতাদদের অনবরত সংখ্যাবৃদ্ধিতে পুরো আরব উপত্যকায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও তারা নিজের চোখে অবলোকন করল যে, তথাকথিত অবরুদ্ধ মুসলিম জাতি এর মধ্যে রোমান অধ্যুষিত এলাকা বিজয়ের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছে। এ অভিযানে মুসলমানদের নির্ভেজাল দুঃসাহসিকতা একপর্যায়ে রোমানদের

অস্তর কাঁপিয়ে দেয় এবং ভীত-সম্ভ্রান্ত করে তোলে। ঘটনা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন উসামার বাহিনী তার লক্ষ্যপূরণ করতে সক্ষম হন, রোমানদের অনুগত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং গনীমতের মাল নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজ ভূমিতে ফিরে যান। এ সময় রোমান সম্রাট হীরাকল শাম এবং আরবের সীমান্ত এলাকা প্রতিরক্ষার জন্য দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন।

পারস্যদেরও একইভাবে মুসলমানদের ডয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। উসামার বাহিনীর বিজয়ের খবর পারস্য নেতৃবৃন্দের কাছেও পৌঁছেছিল। এ খবর পেয়ে তারা তাদের ভূমি রক্ষা ও নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীত-সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল—বিশেষভাবে ইরাক। মুসলমানদের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে পারস্য নেতারা মুরতাদদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলে এবং তাদের সামরিক ও মানসিক সাহায্য দিতে থাকে যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাযথ আক্রমণ গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং সামান্য সৈন্যসামন্ত ব্যবহার করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদেশি সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দের কাছে পরিকার বার্তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এবং বার্তাটি ছিল : আরব ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশে খুব শীঘ্রই মুসলমানরা পরিপূর্ণ আক্রমণ পরিচালনা করবে। তারা এমন বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবে যারা মৃত্যুকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন শত্রুরা জীবনকে ভালোবাসে।

২। রাসূল সা.-এর অনুকরণে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধিকরণ

নবুওয়াতের শুরু থেকেই ইসলাম একটি সম্প্রসারণশীল শক্তি ছিল। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, দেশ বা জাতির জন্য নয়, বরং এটা গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ। এজন্য মুসলমানমাত্রই এটা অন্যের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে এবং বহির্বিশ্বে এর প্রচার-প্রসারে বাধাসমূহকে অতিক্রম করবে; এভাবেই ইসলাম মক্কা থেকে মদীনা, তারপর আরবের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে তা ইরাক ও সিরিয়ায় প্রচার-প্রসার লাভ করে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো কেউই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত কাছাকাছি ছিলেন না; সত্যিকার অর্থে এশার নামাযের পর তারা দু-জন একসাথে বসে মুসলিম জাতির বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে

আলোচনা করতেন। আবার তিনি রাসুলের সাথে এত বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন যে, তিনি কেবল ইসলামের প্রচারের গুরুত্বই অনুধাবন করেননি, বরং এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও যথাযথ কৌশল সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। ভিন্নভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদেশি জনগণের কাছে ইসলাম প্রচারে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের জন্য সামরিকশক্তি প্রয়োগকে প্রধান উপায় মনে করতেন। এজন্য পারস্য সম্রাট যদি ইসলাম কবুল না করে এবং পার্সিয়ানরা মুশরিকই থেকে যেতে চায়, তাহলে পারস্য বিজয় করা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিদেশের মাটিতে সৈন্য প্রেরণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সত্যই অনুধাবন করেছেন যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভোগা মানেই সর্বনাশ ডেকে আনা। যদি তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী করেন, তাহলে শত্রুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং মুসলমানদের পরিবর্তে রোমানরাই মুসলমানদের এলাকা দখল করার জন্য অভিযান প্রেরণ করবে। এজন্য মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পরই তিনি দ্রুত ইরাক এবং পরবর্তীতে শামে অভিযান প্রেরণ করেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মনোনীত সেনাপতিরা বিদেশের মাটিতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই গিয়েছেন এবং শাসন ক্ষমতা থেকে স্বৈরশাসক ও ঔদ্ধত্যকারীদের উৎখাত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেছেন। প্রচণ্ড সাহসী কিছু মানুষকে (যেমন : খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, গুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব সতর্কভাবে বাছাই করে নেয়া হয়েছিল এবং তাদের উপর বিদেশের মাটিতে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও একজন অভিজ্ঞ সমরবিশারদ ছিলেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা এবং উঁচু ধার্মিকতার ভিত্তিতেই তার সেনাপতিদের নির্বাচন করেছিলেন। তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইরাক এবং শাম বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩। বিজিত এলাকার ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার জনগণের প্রতি সদাচরণ

মুখে এটা বলা খুব সহজ যে, তাদের ভালোর জন্যই তাদের দেশকে দখল করা হয়েছে: তাদের আধুনিক সভ্যতার আলোকে গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, তাদের ক্ষমতায়ন করা, স্বৈরশাসক থেকে তাদের মুক্তি দেয়া এবং এ রকম আরও অনেক কিছু! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজয়ী গোষ্ঠী বিজিত এলাকার লোকজনকে এই রকম ভালো ভালো কথা বলে থাকে, তবে সত্যিকার অর্থে তাদের অন্তরে থাকে স্বার্থসিদ্ধি এবং স্বার্থপরতা যেখানে বিজিত লোকজনের সম্মান ও উন্নতির দিকে খেয়াল থাকে না।

কিন্তু ইসলাম চিরকালই এর ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অবশ্যই বিজিত এলাকার অধিবাসীদের মন জয় করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি অমুসলিম নেতাদের মতো মিথ্যা বুলি উচ্চারণ করেননি। তিনি যা বলেছেন, তা-ই বুঝিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তরবারি দিয়ে জনগণের মন জয় করা যায় না। শত্রুর সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করলেই উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় না। মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করেছিলেন যে, যুদ্ধের আগের পরিকল্পনার মতো যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধপূর্ব পরিকল্পনায় শত্রুকে পরাভূত করাই মূল লক্ষ্য থাকে। আর যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনায় বিজিত লোকজনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। জনগণকে আশ্বস্ত করতে হয়ে যে, তারা একজন স্বৈরশাসকের পরিবর্তে আরেকজন দ্বারা আক্রান্ত হয়নি যে কিনা প্রথমজন থেকে আরও অধিক কঠোর, মারাত্মক এবং পাপাচারী।

এ কারণে তিনি তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন বিজিত জনগণের সাথে ভদ্র ও শান্ত আচরণ করেন। যার দেশ জয় করে নেয়া হলো, তাকে অনেক ক্ষেত্রেই আশ্বস্ত করা প্রয়োজন—তার বসবাসের জমি অধিগ্রহণ করা হবে না, তাকে তার জীবিকা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হবে না, তার পরিবার-পরিজন সম্রাসীদের নিকট থেকে

নিরাপদ থাকবে ইত্যাদি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে মুসলিম সেনাপতিরা বিজিত এলাকার কোনো স্থাপনা ধ্বংস করেননি এবং সেখানকার জনগণের ধর্মানুভূতিকে সম্মান করেছেন। এজন্যই পারসিক ও রোমানরা মুসলমানদের উন্নত আখলাক, মহানুভবতা, দয়াদ্রুতা এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের ভালোবেসেছে। মুসলিম সেনাপতিদের উঁচু আত্মিক উৎকর্ষতা ও আচার-আচরণের প্রতিফলনে ইসলামের আলো বিজিত এলাকার লোকজনের অন্তরে প্রবেশ করেছে এবং আরও একবার—মক্কা বিজয়ের সময় ও পরে—লোকজন দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা লাভ করেছে নিরাপত্তা, ভারসাম্য এবং উন্নতি। আর অবিচ্ছেদ্যভাবে তারা আরব মুসলমানদের মতো মুসলিম সমাজে একই মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

পারসিক ও রোমান জনগণ তাদের নিজস্ব জীবনপদ্ধতি ও ইসলামের জীবনাচরণের পার্থক্যকে রাত ও দিনের মতোই মনে করত। এজন্য পারসিক ও রোমান সৈন্যরা কোনো এলাকা জয় করে ঐ এলাকার সবকিছু ধ্বংস করে দিত। বারবেরিয়ানদের মতো তারা শত্রুর দেহকে বিকৃত করত, শিশু ও নারীদের হত্যাসহ পদে পদে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করত। ফলে তারা বিজিত এলাকার লোকজনের ঘৃণা ও অভিশাপলাভ করত। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বারবেরিয়ানদের মতো বিজয়ী কর্তৃক স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা যুগ যুগ ধরে মানুষ মনে রাখত। ফলে পারসিক ও রোমানদের নিকট মুসলমান সেনাপতিরা দুর্ভোগ ও ধ্বংসের পরিবর্তে ন্যায়-বিচার, শান্তি, সম্মান এবং উন্নতি নিয়ে হাজির হয়েছে। হঠাৎ করেই তাদের জীবন থেকে বিগত স্বৈরশাসকের অত্যাচারের ছায়া অপসারিত হয়।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের নিকট থেকে পরিপূর্ণতা আশা করেছিলেন। তিনি তাদের কাজ-কর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাদের স্বৈরশাসকের মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তিনি খুব দ্রুত তার সেনাপতিদের সামান্যতম ভুল হলেও তা শুধরে দিতেন। বিখ্যাত হাদিসবেত্তা বাইহাকি রহ. বর্ণনা করেন যে, যখন বিদেশিরা যুদ্ধে জয়লাভ করত, তখন তারা শত্রুর সাথে বারবেরিয়ানদের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করাকে সঙ্গত মনে করত। উদাহরণস্বরূপ, পরাজিত

সেনাপতির বিচ্ছিন্ন মস্তক তাদের বাদশার সামনে পেশ করা, যা বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হত। শাম অভিযানের সময় দু-জন মুসলিম সেনাপতি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু শামের একজন প্রসিদ্ধ পাদরি বানানের খণ্ডিত মস্তক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন। যখন বাহক উকবাহ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু তা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পেশ করেন, তখন তিনি ভীষণ রাগ করেন। উকবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, তারাও আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছে।’ এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমরা কি পারসিক ও রোমানদের নীতি অনুসরণ করব! এখন থেকে আর কখনও এভাবে মস্তক প্রেরণ করবে না। এর পরিবর্তে চিঠি অথবা সরাসরি জানালেই চলবে।’

৪। বিজিত এলাকায় লোকজনকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান

যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বহির্বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো, কিন্তু মানুষকে জোর করে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা তার ইচ্ছাও ছিল না, লক্ষ্যও ছিল না। মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো জাতি, গোত্র অথবা মানুষকে কখনও ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেননি। এ নীতিই কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে,

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য? ^{২৫০}

সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানগণ স্বৈরশাসকের পতন চেয়েছিল যাতে ঐদেশের সাধারণ জনগণকে ইসলামকে জানা ও গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া সম্ভব হয়। যখনই কোনো দেশ জয় করা হয়েছে, তখনই তাদের সামনে ইসলামের শাশ্বত বাণীকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের ইসলামগ্রহণ অথবা তাদের ধর্মে বহাল থাকার অধিকার দেয়া হয়েছে। তারা ততক্ষণ

পর্যন্ত তাদের স্বধর্মের উপর বহাল থাকার অধিকার পেয়েছিল যতক্ষণ তারা মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তিকে মেনে চলত। এ চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

ক। মুসলমান শাসককে তাদের জিযিয়া কর দিতে হবে। এই কর মুসলমান দেশে অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই কর প্রদানের মাধ্যমে অমুসলিমরা তাদের নিজেদের ধর্মপালনে স্বাধীনতা লাভ করবে এবং যতদিন তারা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, ততদিন তারা বহিঃশত্রু থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং অন্যান্য মুসলমানরা তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে। সুতরাং তারা দেশের সকল নাগরিকের মতোই শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং কারও এ অধিকার নেই যে, তাদের সম্পত্তি চুরি করে বা অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে।

খ। কিছু কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি দেয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের স্বার্থে তাদের আনুগত্য সন্দেহজনক, কোনোভাবেই তাদের মুসলিম সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

গ। তারা কোনোভাবেই কোনো মুসলমান বা ইসলামধর্মের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য অথবা ইসলামের কোনো হুকুমকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় জড়িত হতে পারবে না।

ঘ। তারা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। তবে যদি কখনও অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না।

বিশ্বাস অন্তরের ব্যাপার। এটা মানুষের এমন একটি অংশ যা অভেদ্য। ইসলামও এর স্বীকৃতি দেয়। এজন্য মুসলমানগণ কখনও কাউকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেনি; বরং কথা ও আমলের মাধ্যমে, তথ্য ও বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে তারা অমুসলিমদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম কবুল করে নেয়।

দ্বিতীয়। আবু বকর রা.-এর সামরিক কৌশলের বিবরণ

খেলাফতকালে শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযান ও অর্জিত বিজয়সমূহ পর্যালোচনা করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক কলা-কৌশলের কিছু মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচে এ রকম কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হলো।

১। শত্রুর ভূখণ্ডের একটি শহর একবারে দখল করা

এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিদেশের ভূখণ্ডে যুদ্ধ পরিচালনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কৌশল নির্বাচনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি; তার সেনাপতিরা নয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী বার্তাবাহককে দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে তিনি তার সেনাপতিদের সাথে প্রায় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিরিয়া ও শামের যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করলে দুখরনের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা মূর্ত হয়ে ওঠে : প্রথমত সামগ্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন যেখানে কে কখন আক্রমণ করবে, কখন পিছে সরে আসতে হবে, কখন অন্য বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে, কখন নিজেদের সৈন্যসংখ্যার উপর আশ্রিত হতে হবে ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এরকমের বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে গ্রহণ করে প্রয়োগ করেছেন। একজন মুসলিম সেনাপতি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে আসন্ন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে জরুরি সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন যেখানে খলীফার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তারপরেও তারা যে সিদ্ধান্ত নিতেন তা পরবর্তীতে খলীফাকে অবহিত করতেন। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যেখানে নির্দিষ্টভাবে কোনো লড়াই করার ক্ষেত্রে কৌশল নির্বাচন—কোথায় কোন ব্যাটালিয়ানকে অবস্থান করতে হবে, কোথায় অশ্বারোহীরা অবস্থান করবে, কোন ছকে অগ্রসর হলে সম্মুখ সমরে শত্রুদের সহজে পরাজিত করা সম্ভব হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত প্রায় সবগুলোই যুদ্ধের সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রথম বিষয়গুলোতে প্রশ্ন ছিল কত দ্রুত মুসলিম বাহিনী শত্রুদের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করবে। একটি নীতি হচ্ছে, মুসলমানদের উচিত যতদূর সম্ভব শত্রুদের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রবেশ করবে। কিন্তু আবু বকর এ নীতি পরিহার করলেন। মুসলিম বাহিনীকে শত্রুর দেশের ভেতরে কোনো অভিযান পরিচালনা করার পূর্বে তাদের সীমান্তবর্তী কোনো এলাকায় অবস্থান করার কড়া নির্দেশ দিলেন। যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়ায ইবনে গনম রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে ইরাকে আক্রমণ করার আদেশ দিলেন, তখন তিনি দু-জনের কাছে একই বার্তা পাঠালেন :

তোমাদের মধ্যে যে কেউ আগে হীরায় পৌছবে, হীরার যুদ্ধে সে-ই সেনাপতি হবে। যখন তোমরা সেখানে মিলিত হবে, তখন পারস্য এবং আরব ভূমির মাঝে শত্রুর অবস্থান অনুযায়ী সেনা বহরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবে। যখন নিশ্চিত হবে যে, পেছন দিক থেকে আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন একদল হীরায় অবস্থান করবে। আর আরেকদল শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং তাদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করবে। আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং তাকে ভয় কর। দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দাও এবং তখন তোমাদের দু-টিই দেওয়া হবে। দুনিয়াকে বেছে নিয়ো না (আখেরাতের উপর); তাহলে দু-টিই হারাবে। গোনাহ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং (গোনাহ হয়ে গেলে) দ্রুত তাওবা করে নাও। সাবধান! গোনাহের পথ অবলম্বন কর না এবং তাওবা করতেও দেরি কর না।^{২৫১}

এই চিঠি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনভিজ্ঞ ছিলেন না; অপরপক্ষে অনেক যুদ্ধে অগ্রগামী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দৃঢ়ভাবেই জানতেন কীভাবে শত্রুদের পরাজিত করতে হয় এবং কীভাবে তাদের মনোবল ভেঙে দিতে হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর জ্ঞানকে তখনকার অভিজ্ঞ সমর নেতারাও স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন খালিদ বিন ওয়ালীদ

রাযিয়াল্লাহু আনহু। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল তার আদেশ শিরোধার্যই করে নেননি, বরং তিনি জানতেন, বিজয়ের ক্ষেত্রে তার নির্দেশনাই সর্বোত্তম পদ্ধতি।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হীরার উত্তরে ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামরিক সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কারবালায় যাত্রাবিরতী করেন। মুসলমানরা সংখ্যাগুরুতার জন্য সমস্যা উত্থাপন করছিল। তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াসিমাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘ধৈর্যধারণ কর। ইয়াযকে যে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি ঐসব শত্রুদের ব্যুহ ভেদ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাই। ফলশ্রুতিতে যেন ঐসব এলাকায় আরবরা বসতি গড়ে তুলতে পারে এবং তারা পেছন দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। পরবর্তীতে অকস্মাৎ আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হতে পারবে। এটাই খলীফা আদেশ করেছেন এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করাই মুসলিম জাতির সাহায্যলাভের অন্যতম কারণ।’^{২৫২}

ইরাকে মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু একই কৌশল অবলম্বন করলেন। একজন সম্মানিত এবং প্রবল বিক্রম সেনাপতি মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন : ‘পারসিকদের সাথে তাদের সীমান্ত এলাকা বরাবর আক্রমণ কর, ভিন্নভাবে আরব এলাকার নিকটবর্তী অঞ্চলে লড়াই কর। তাদের দেশের বেশি ভেতরে প্রবেশ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় নসীব করলে তারা তাদের পশ্চাতে এলাকাসমূহ নিজেদের অধীনে রাখতে সক্ষম হবে। আর যদি তাদের ভাগ্যে পরাজয় থাকে, তাহলে তারা পশ্চাতে সরে আসতে পারবে এবং অন্য বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে তারা আরও দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে। কারণ, তারা তখন শত্রুকে পরাজিত করার কৌশল সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। তারা এভাবেই যুদ্ধ করে যেতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন।’^{২৫৩}

^{২৫২} আত-তারিখ আত-তাযারী (৪/১৮৯)।

^{২৫৩} আল-ইসাবাহ (৫/৫৬৮); তারিখ আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম (পৃ. ৩৩১)।

শাম বিজয়ে মুসলমানগণ পশ্চাতের বিশাল এবং শূন্য মরুভূমির সাহায্যলাভ করেছেন। তারপরেও তারা সাবধানতা অবলম্বন করেছেন যেন পশ্চাত দিক থেকে শত্রুরা তাদের আক্রমণ না করতে পারে। অধিকন্তু তারা তাদের অবস্থানের ডান এবং বাম দিকের এলাকাসমূহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২। মুসলিম সৈন্য সংগ্রহ

যজ্ঞার বিষয় হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতকালে কাউকে জবরদস্তি করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। তারপরেও বিজয় অর্জন করতে চাইলে পর্যাণ্ট মুজাহিদ ছাড়া তা সম্ভব নয়; সর্বোপরি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো ছোট গোত্রের বিরুদ্ধে সামান্য যুদ্ধ বা অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না; তিনি তো তখনকার দুনিয়ার দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন—রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কীভাবে শাম এবং পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য বিশালসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করবেন? এ প্রশ্নকে তিনি হালকাভাবে নেননি। এর মধ্যে সৈন্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আবার শর্তারোপ করেছিলেন যে, খুব বেশিসংখ্যক আরবদের এই যুদ্ধে নেয়া যাবে না। এজন্য খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আরও সৈন্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন, ‘যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের মধ্য থেকে সৈন্য আহ্বান কর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর যারা দীনের উপর অটল রয়েছে, তাদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ কর। আর যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করেছে, এরূপ লোকদের আমার নির্দেশ ছাড়া ইরাক অভিযানে গ্রহণ করবে না।’^{২৫৪}

যাহোক, লোকজনকে যুদ্ধে শরীক করার জন্য তিনি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি জায়গায় জায়গায় উৎসাহমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন যাতে তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদের পুরস্কার

সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি ইয়েমেনের মুসলমানদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে অনেকেই ইরাক ও শামে জিহাদের জন্য নাম লেখান। সংক্ষেপে কোনো ফরমান জারি করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, যথেষ্ট মুজাহিদ জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন যারা আল্লাহর ওয়াদার যে কোনো একটি পুরস্কার লাভ করার জন্য মরিয়া ছিলেন: বিজয় অথবা শহীদের মর্যাদা। বস্তুত বেশিরভাগ মুজাহিদই প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির প্রতিই বেশি ঝুঁকে ঈমানের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও শাম অভিযানের পূর্বক্ষণেই কেবল মুজাহিদ সংগ্রহে ব্যাপ্ত হননি, বরং অভিযান চলাকালেও তিনি তার সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছিলেন। এভাবে তিনি তার ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত অনবরত তার সেনাপতিদের সৈন্য প্রেরণ করে শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন—ঐসব ব্যাটালিয়ানে যেখানে মাত্র কয়েকশ বা তার কিছু বেশি সৈন্য ছিল।

৩। যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ

অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও শাম অভিযানে তার প্রাথমিক লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল না : তিনি এটা নিশ্চিত করেছেন যে, সব সৈন্য এ লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে এবং প্রেরিত চিঠিতে সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলের উদ্দেশে এটা পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, তারা ইসলামের বাণীকে প্রচার-প্রসার করার জন্যই যুদ্ধ করছেন যাতে দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর বুক থেকে স্বৈরশাসকদের উৎখাত করাও উদ্দেশ্য, যাদের জন্য তাদের দেশের জনগণ একমাত্র সত্যধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছে না। সেনাপতিরা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তারা শত্রুদের যে প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন, তার ধরন দেখে এই সত্যই মূর্ত হয়ে ওঠে : ইসলামগ্রহণ কর, জিযিয়া কর দাও অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।^{২৫৫}

৪। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জায়গায় সৈন্য প্রেরণ

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল : যদি তিনি বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত থাকতেন, তখন যে ফ্রন্টে বেশি সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানেই বেশি জোর দিতেন। আবার যে ফ্রন্টে সৈন্য পাঠানো একটু কম জরুরি ছিল, সেখানেও সৈন্য প্রেরণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। এভাবে তিনি ভারসাম্য তৈরি করতেন। একদিকে মূল ফ্রন্টে অধিক সৈন্য সমাবেশের দিকে নজর দিতেন, আরেকদিকে কম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কম জরুরি ফ্রন্টেও সৈন্য পাঠাতেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্যদের মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন যেহেতু মুরতাদরা মুসলমানদের প্রতি আসন্ন এবং বিপদসংকুল হুমকি হয়ে উঠেছিল; তথাপি তিনি অন্যান্য ফ্রন্টে চলমান যুদ্ধকে অবহেলা করেননি। এর বাস্তব নিদর্শন হচ্ছে তিনি উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রোমান সীমান্তে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

অন্যান্য যুদ্ধেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনী বণ্টন ও সর্বোচ্চ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি তার খেলাফতকালের মধ্যভাগে এবং শেষ দিকে ইরাক ও শাম দেশে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তারপর যখন তার কাছে এটা পরিকার হয়ে গেল যে, ইরাকের মতো শাম দেশে যুদ্ধ ততটা সফলতার সঙ্গে এগুচ্ছে না, তখন তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে দ্রুত শামের দিকে রওনা হতে আদেশ দেন। আবার যখন তার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য শামে জমা হয়েছিল, তখন তিনি ইরাকে সংঘটিত যুদ্ধকে অবহেলা করেননি। তিনি সেখানে উল্লেখযোগ্য সৈন্য রেখে একজন পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি হিসেবে মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন।

উপরে যা বর্ণিত হলো, তা কয়েকটি উদাহরণমাত্র। খেলাফতের পুরো সময় জুড়েই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ প্রয়োজনসাপেক্ষে সৈন্যদের নিয়োগ করেছেন, পুনর্বিন্যস্ত করেছেন, নতুন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং বদলি করেছেন। আর অত্যন্ত দক্ষতার

সাথে এসব কৌশলগত কাজ সম্পাদন করে তিনি সৈন্যদের মধ্যে মনোবল বৃদ্ধি করেছেন যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, যদি কখনও শত্রুর তুলনায় তাদের সংখ্যা খুব বেশি কম হয়ে যায়, তাহলে তারা সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে অবশ্যই এমনসংখ্যক সৈন্য লাভ করবেন যাতে নিদেনপক্ষে বিজয়ের জন্য লড়াই করা সম্ভব হয়।

৫। সেনাপতি পরিবর্তন

কোনো গভর্নর, সেনাপতি অথবা নেতা চিরকালের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন না। বরং সরকারি প্রতিটি কর্মকর্তাকেই অনবরত তার কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার উপর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। যদি কাউকে তার দায়িত্বে উদাসীন পাওয়া যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পদচ্যুত করা হয়। আবার যদি কেউ খুব আন্তরিক এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পদচ্যুত করতে দ্বিধা করতেন না যদি অন্য কাউকে এর চেয়ে উপযুক্ত পাওয়া যেত। এটা খুবই ফলপ্রসূ এবং সঠিক ছিল। কারণ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির অনুভূতির চেয়ে জাতির সামগ্রিক কল্যাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা তার খেলাফতকালে এমনই ছিল এবং এটাই সব সরকারি দপ্তরে হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, তাবুকের অভিযানে খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেননি। তিনি সৎ এবং উঁচু মনোবলের অধিকারী ছিলেন; তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটা তাকে মুসলমানদের মধ্যে কোনো হেয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেনি, কিন্তু এটা অবশ্যই এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, অন্য কেউ তার জায়গায় সফল হতে পারবে কি না! আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রশ্ন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দিলেন। পরিশেষে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার লক্ষ্যপূরণে সফল হয়েছিলেন।

আবার যদি কখনও কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো কাজের ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতেন এবং সঠিকভাবে তা পালনও করতেন, তবু ঐ

একই পদে অধিক যোগ্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিধা করতেন না। ইরাকে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু চমৎকারভাবেই তার দায়িত্ব পালন করছিলেন, তারপরেও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার চেয়ে বেশি যোগ্য এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধসমূহে বিজয়ের ক্ষেত্রে আরও অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর শামে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রেও যোগ্য এবং উপযুক্ত ছিলেন। তারপরেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করলেন তার পরিবর্তে এমন কাউকে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যে তার চেয়ে ভালো মুসলমান না হলেও তার চেয়ে অধিক সামরিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী—খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। এজন্য যখন সামরিক নেতা নিয়োগ ও পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আসত, তখন তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতির দিকে তাকাতেন না, বরং মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক উপকারের কথা চিন্তা করতেন। পুরো মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনে বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

৬। সেনাপতিদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় কোনো ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ছবি, গোয়েন্দা বিমান, টেলিফোন অথবা এমন কোনো টেকনোলজি ছিল না যার মাধ্যমে তিনি তার সেনাপতিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন। এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিলম্ব ছিল অবধারিত : একজন অশ্বারোহীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত যে সময়ের প্রয়োজন হতো, ততটুকু দেরি হতো। তারপরেও যদি আমরা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইরাক ও শামে রণাঙ্গনের চিত্র দেখি, তাহলে মনে হবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় ছিলেন না, বরং প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি এমনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তার বাহিনীকে এমন পথে প্রেরণ করেছেন, মনে হতো তিনি যেন সব দেখছেন এবং এমনকি তার সামনে আধুনিক যুগের মতো মানচিত্র ছিল যাতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান, পথঘাট ও দুর্গম গিরিপথ সবই যেন চোখের সামনে দেখছেন!

তিনি কীভাবে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের এ বাস্তবভিত্তিক অনুভূতির ছাপ রেখেছিলেন? এটা কোনো যাদু নয়। তবে এটা ছিল তথ্য আদান-প্রদানের এক অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কার যা তিনি তার সেনাপতিদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বার্তাবাহক যেমন বাহিনীর প্রথম ও শেষ সারির তথ্য আদান-প্রদান করতেন, তেমনি রণাঙ্গনের সেনাপতি ও মদীনায় অবস্থানরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বার্তাবাহক আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বার্তাবাহকরা ছিলেন চরম বিশুদ্ধ: তারা পথে খুব কমই বিশ্রাম নিতেন যাতে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়; এবং তারা ছিলেন সতর্ক ও অধরা যাতে তারা শত্রুর কাছ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা লুকিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম ছিলেন। এভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম সারিতে কী হচ্ছে তা জানতে পারতেন; কারণ, পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সেনাপতিদের সাথে তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

ইরাক এবং শাম বিজয়ের মূল কারণ হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিখুঁত পরিকল্পনা বিশাল ভূমিকা রাখে। অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রাথমিকভাবে তার অনুপুঞ্জ বিনয়, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, মহানুভবতা, তাকওয়া এবং সুগভীর জ্ঞানের কারণে মানুষ স্মরণ করে থাকে। কিন্তু একইসাথে তিনি ছিলেন চরম পারদর্শী একজন সমরবিদ যা কিনা পুরো মানবইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমি মনে করি না যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সমরবিদ হিসেবে জনগ্রহণ করেছিলেন; বরং আমি মনে করি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দীর্ঘ দিনের নিবিষ্ট প্রশিক্ষণ নেয়ার ফসল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করেননি, বরং যুদ্ধই তার কাছে এসেছে, বদরের প্রান্তরে কুরাইশদের বাহিনী হিসেবে, উহুদের প্রান্তরে, খন্দকের যুদ্ধে এবং আরও অনেক যুদ্ধ যা মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মোকাবেলা করেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে প্রতিটি যুদ্ধে লড়েছেন, এভাবে তিনি কেবল একজন দক্ষ সৈনিকেই পরিণত হননি, বরং একজন অভিজ্ঞ সমরবিদে

পরিণত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছেন; বস্তুত অন্য সাহাবীরা যখন ইশার নামাযের পর ঘুমাতে চলে যেতেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন এবং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব বিষয়সমূহের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাও স্থান পেয়েছিল। সুতরাং তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং তিনি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিখেছিলেন—এর উপর নির্ভর করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণে সবচেয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা তাকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে এবং পরবর্তীতে ইরাক ও শাম অভিযানে সফল হতে সহায়তা করেছিল।

তিনি। আবু বকর রা.-এর বক্তব্য ও উপদেশে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব এবং সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যের অধিকারসমূহ

একজন মুসলমান যা কিছু করে, তার সব কাজেই কিছু নিয়ম-নীতি প্রতিফলিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকার রক্ষায় সে সচেতন থাকে। হ্যাঁ, তাই যুদ্ধ হচ্ছে এ রকম অনেক কাজের সমষ্টি যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি শত্রুপক্ষের আরেকজন মানুষকে হত্যা করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এই যুদ্ধেও কিছু অধিকার রয়েছে যা আদায় করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, এখানে কিছু অধিকার আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—যেমন : শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য অবলম্বন; কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করা, বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করা, বিশেষভাবে যখন গনীমতের মাল সংগ্রহ ও বিতরণের প্রসঙ্গ আসে এবং বন্ধুত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদির কারণে কখনই ব্যক্তিগত অভিলাষকে প্রাধান্য না দেয়া।

তারপর মুসলিম সেনাবাহিনীর সেনাপতির অধিকার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম সৈন্যরা তার আনুগত্য করবে; অধিকন্তু তিনি যেভাবে গনীমতের মাল বিতরণ করেন, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন কিংবা সমালোচনা করা যাবে না। সবশেষে সাধারণ সৈন্যদেরও তাদের নেতাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সময় অধিনায়কের উচিত তিনি যেন সাধারণ সৈন্যদের স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেন এবং তাদের উন্নতির চিন্তা করেন; তিনি তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করবেন, তাদের

পর্যাপ্ত রসদাদি সরবরাহ করবেন; তাদের নিরাপত্তার জন্য আশেপাশে শত্রু গুঁহ পেতে আছে কিনা অথবা অকস্মাৎ কোনো আক্রমণের পরিকল্পনা করছে কিনা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিবেন; তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদে উৎসাহিত করবেন; তিনি তাদের শাহাদাতবরণ করলে আল্লাহ তা'আলার অশেষ পুরস্কার ও সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্রের অধিকারী, তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করবেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেবেন। নিচে যুদ্ধের সময় আল্লাহ, সেনাপতি এবং সাধারণ সৈন্যের বিস্তারিত হুকুমসমূহ যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা আদায় করার জন্য সচেষ্টি ছিলেন, তা নিচে উল্লেখ কর হলো :

১। আল্লাহ তা'আলার প্রতি দায়িত্বসমূহ

ক। শত্রুর মোকাবেলা করার সময় ধৈর্যধারণ করা

ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আশ্বাসে প্রেরণ করার সময় বিদায় ভাষণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করার সময় ধৈর্যধারণ করবে।’^{২৫৬} একইভাবে তিনি যখন হাশিম ইবনে উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামে প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেন, ‘শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করার সময় ধৈর্যধারণ করবে এবং অন্যকে ধৈর্যধারণ করতে উৎসাহিত করবে। মনে রাখবে, প্রতিটি পদক্ষেপ যা ভূমি নেবে, প্রতিটি টাকা যা ভূমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, আল্লাহর পথে প্রতিটি সময় যখন ভূমি ক্ষুধা ও পিপাসায় আক্রান্ত হবে—আল্লাহ এ সবকিছুকে নেক আমল হিসেবে কবুল করে নিবেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা নেককারদের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেন না।’^{২৫৭}

খ। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠ নিয়ত করা

জিহাদের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের বিদায় দেয়ার সময় ভাষণে এবং বিভিন্ন সেনাপতিদের নিকট প্রেরিত চিঠি-পত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সময় একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন: যদি কোনো

^{২৫৬} উইয়ুনুল আখবার (১/১৮৮)।

^{২৫৭} ফতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ৩৪)।

পার্শ্ব স্বার্থে জিহাদ করা হয়, তাহলে তা মূল্যহীন। ভিন্নভাবে, জিহাদের নিয়ত করার সময় অবশ্যই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখতে হবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শাম দেশে রওনা হতে আদেশ দিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন, সেখানে তিনি এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন যে, তার সব কাজ যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। এ কথা বলে তিনি তাকে অহংকার অথবা অহমিকা থেকে সতর্ক থাকতে বলেন এবং এ কথা যেন মনে না করা হয় যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহকে ধন্য করে দেয়া হচ্ছে। বরং আল্লাহই তাকে জিহাদ করার তাওফীক দিয়ে তার প্রতি করুণা করেছেন—মূলত সব নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য করুণা।

গ। বিশুদ্ধ হওয়া

সেনাপতি এবং সাধারণ সৈন্য—সবার প্রতিই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টি পরিকার করে দিয়েছেন যে, গনীমতের মালের ব্যাপারে সবাইকে বিশুদ্ধ হতে হবে; তিনি এটি উল্লেখ করেছেন কারণ, গনীমতের মাল চুরি করা বড় রকমের অপরাধ। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, যদি কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মাল কুড়িয়ে পায়, তা যেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত ব্যক্তির কাছে তা জমা দেয় যাতে পরবর্তীতে তিনি গনীমতের মাল সকল মুজাহিদদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে পারেন। ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিদায় দেয়ার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে নসীহত করেন। তার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, অবৈধভাবে গনীমতের মাল নেয়া হলে তা অনেক ক্ষতির কারণ হবে।^{২৫৮}

২। সেনাপতির অধিকারসমূহ

ক। তার প্রতি অনুগত থাকা

বিভিন্ন বক্তব্য এবং চিঠিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন যে, যখন নেতার প্রসঙ্গ আসে, তখন সৈন্যদের অনেক

দায়িত্ব রয়েছে যা পরিপূর্ণভাবে আদায় করা জরুরি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তারা তাদের নেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

ইরাকে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্থলাভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তিনি মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি লেখেন : ‘আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকে তোমার জায়গায় প্রেরণ করেছি। সুতরাং তুমি তাকে স্বাগত জানাবে এবং তোমার অধীনস্থ সকলকেও তা করতে বলবে। তারপর তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। তার কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে না এবং তার কোনো মতামতকে উপেক্ষাও করবে না। মূলত তিনি তাদের একজন যাদের কথা আল্লাহ তা’আলা কুরআনে এভাবে বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাকেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবেন।^{২৫৯}

যখন তিনি শামে বেশ কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাদের নেতার প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন : ‘হে লোকসকল! আল্লাহ তা’আলা ইসলাম দিয়ে আমাদের উপর রহম করেছেন, জিহাদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং এ ধর্ম দিয়ে আমাদের (অন্য জাতির উপর) বাছাই করে নিয়েছেন। হে আল্লাহর বান্দারা, শাম দেশের রোমানদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের জন্য নেতা নির্বাচন করে দিয়েছি এবং তাদের পতাকা অর্পণ করেছি। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতার বিরোধিতা করো না। তোমাদের নিয়তকে ঠিক করে নাও। তোমাদের খাদ্য-পানীয় ঠিক রেখো (তা যেন হালাল হয়)। অবশ্যই যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।’^{২৬০} সমবেত সৈন্যরা তার কথায় একসাথে বলে ওঠে : ‘আপনি আমাদের নেতা এবং আমরা আপনার অনুসরণকারী। আপনিই

^{২৫৯} সূরা আল-কাত্তহ, ৪৮:২৯।

^{২৬০} ফতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ৬০-৬১)।

আমাদের আদেশ দেবেন এবং আমরা তা মেনে চলব। আমরা আপনার যে কোনো আদেশ মেনে চলব এবং আপনি যেখানেই যেতে বলবেন, সেখানেই যাব।”^{২৬১}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদের প্রতি নসীহত দিতে গিয়ে সেনাপতির প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন। শাম অভিযানে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন এবং এ ব্যাপারে চিঠিতে যেভাবে তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বলেন, তা আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ আদেশে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরের লোকজনের মধ্যেই প্রভাব পড়ে। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল নিজেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেননি, বরং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠির সারমর্ম ও নিজের বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে তার অধীনস্থ সকলকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আয-যাহহাক ইবনে কাইস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সৈন্যদের একদল থেকে আরেক দলে যোগদান করতে বলেন এবং সে দলের সবাইকে শামে মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর নতুন সেনাপতি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে আদেশ দেন। দলের সব সৈন্যই যাহহাক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথায় সাড়া দেন এবং কথা ও কাজে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশ শিরোধার্য করে নেন।^{২৬২}

খ। তাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ থাকা

আব্রাহাম বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

^{২৬১} কতেহ, ইবনে আতাম (১/৮২)।

^{২৬২} কতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ১৮৯)।

আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোনো সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলো রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত।^{২৬৩}

সাধারণ জনগণের কোনো সমস্যা বা অঘটনের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সাধারণভাবে সবার উপর ছিল না, বরং তাদের সবার জন্য করণীয় ছিল তাদের নেতার সঙ্গে একতা রক্ষা করা এবং তার উপর সম্পূর্ণভাবে বিষয়টি অর্পণ করা। যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত ভুল মনে হতো, তাহলে তার অধীনস্থদের উপর তাকে এ বিষয়ে সত্য অবহিত করার দায়িত্ব ছিল; তারা এটা ইসলামের শাশ্বত নিয়ম পরম্পর পরামর্শের ভিত্তিতেই করবে।^{২৬৪}

এজন্য লোকদের প্রথমে জানা উচিত তাদের নেতা কে এবং তারপর তার উপর বিশ্বস্ত থাকবে এবং তার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করবে। কখনও একটি দলের অনেকের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাদের জানতে হবে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম অভিযানে চারটি সেনাবাহিনী চারজন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। প্রত্যেক কমান্ডার তার বাহিনীর সদস্যদের জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন। কিন্তু যখন দু-টি বাহিনী মিলিত হয়ে গেল, তখন এটা জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ল যে, এখন এই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে হবেন। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চার কমান্ডারের প্রতি উপদেশ প্রেরণ করেন, তখন তিনি বলেন, ‘হে আবু উবাইদা, হে মু’আয, হে শুরাহবিল, হে ইয়াযিদ—আপনারা সবাই ইসলামের রক্ষক। আমি আপনাদের মুসলিম বাহিনীর দায়িত্ব দিয়েছি। সুতরাং কঠোর পরিশ্রম করুন এবং সবাই এক সত্তা হিসেবে শত্রুর মোকাবেলা করুন।’^{২৬৫} তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই চার বাহিনী এক

^{২৬৩} সূরা আন-নিসা, ৪:৮৩।

^{২৬৪} আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াহ, আল-মাওয়াযদি (পৃ. ৪৮)।

^{২৬৫} ফতেহ, ইবনে আত্তাম (১/৮৪)।

স্থানে মিলিত হওয়ার পর সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব কে নেবেন, তা পরিকার করে তুলে ধরেন: ‘যখন তোমার সেখানে মিলিত হবে, এক সত্তা হিসেবে একই জায়গায় শত্রুর মোকাবেলা করবে, তখন তোমাদের নেতা হবেন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু। যদি সবাই মিলিত হওয়ার পর তখনও আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে না পৌছান, তখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।’^{২৬৬} চার বাহিনী একত্রিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন যাতে যে কোনো সন্দেহ এবং চার সেনানায়কের মধ্যে অনৈক্য এড়ানো সম্ভব হয়। একইভাবে তিনি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘তুমি সেখানে আমাদের একজন সেনাপতি। কিন্তু যদি তুমি অন্যদের সাথে এক ইউনিট হিসেবে যুদ্ধ করার জন্য মিলিত হও, তাহলে তোমার নেতা হবে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।’^{২৬৭}

পরিস্থিতিসাপেক্ষে এটা অনেক সময় নির্ধারণ করা জটিল হয়ে যায় যে, আসলে কে সবার নেতৃত্বে রয়েছেন; আর যদি এটা হয়, তাহলে লোকদের মধ্যে সন্দেহ এবং অনৈক্য সৃষ্টি হয় এবং হতে পারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নেতৃত্বের দাবি করে বসতে পারে। এ রকম হলে মুসলমানরা শত্রুর পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই মারামারি করতে থাকবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এজন্য এ বিষয়টিকে সব সময় পরিকার করে বর্ণনা করেছেন যে, কেবল কে মূল নেতৃত্বে থাকবে তা-ই নয়, বরং তার অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুতে কে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। শাম অভিযানে চারটি পৃথক সেনাবাহিনীর উদাহরণ এ বিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লেখেন, ‘আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকে তোমার জায়গায় প্রেরণ করেছি...যতক্ষণ সে তোমার সঙ্গে থাকবে, সে-ই আমীর (সামগ্রিক নেতৃত্বের অধিকারী), কিন্তু যদি সে তোমাকে ত্যাগ করে (ইরাকে বা অন্য কোনো অভিযানের জন্য), তাহলে তুমি আবার তোমার আগের দায়িত্ব বহন করবে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।’^{২৬৮}

^{২৬৬} ফতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ৭)।

^{২৬৭} ফতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ৪৮)।

^{২৬৮} আল-ওয়াসিক আস-সিয়াসিয়াহ, হামিদুল্লাহ (পৃ. ৩৭১)।

গ। তার আদেশ দ্রুত পালন করা

অধীনস্থরা কেবল তাদের নেতার অনুগতই থাকবে না, বরং তার সব আদেশ দ্রুততার সঙ্গে আদায় করবে—বিশেষ করে প্রয়োজনের সময়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে তার সেনাপতি এবং সৈন্যরা তার আদেশ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে এবং বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করেননি; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপতিদের আদেশ পালনেও অধীনস্থরা একই আচরণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সৈন্যদের জানালেন যে, তাকে মুসাইলামা কাঙ্জাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, তখন তার সৈন্যরা এ কথা বলে জবাব দিয়েছে, ‘আপনার সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আপনার আদেশ অমান্য করবে।’^{২৬৯}

ইরাকে অবস্থানের সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠির মাধ্যমে তার বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শাম অভিযুখে রওনা হওয়ার আদেশ দেন, তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা দ্রুততার সাথে পালন করেন। এটা তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর তখন জরুরিভাবে অতিরিক্ত সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আদেশ পালন করতে গিয়ে অপরিচিত ও অব্যবহৃত এক দুর্গম পথে দিন-রাত সফর করে মাত্র পাঁচ দিনে গন্তব্যে পৌঁছে যান।^{২৭০}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুদাআ থেকে ইয়ারমুক পর্যন্ত সফর করার আদেশ প্রদান করেন, তখন তিনি এ আদেশ পালনে না আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের কোনো সমালোচনা করেন, না কোনো সময় অপচয় করেন। আবার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শাম ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন এবং তাদের শত্রুর দেশের বেশি ভেতরে প্রবেশ না করে তাদের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ করার আদেশ দেন, তারা দু’জনেও তখন এ আদেশ দ্রুত পালন করেন। আদেশ পালনের এ

^{২৬৯} ফতেহ, ইবনে আতাম (১/২৯)।

^{২৭০} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান কামাল (১/১১২)।

দৃশ্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুরো খেলাফতকালে একইরকম ছিল : অধীনস্থরা সব পর্যায়েই তাদের নেতাদের আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেছিল। সন্দেহাতীতভাবে এটাই মুসলমানদের এতসব বিজয়ের একটি মূল কারণ ছিল।^{২৭}

ঘ। গনীমতের মাল বিতরণে সম্ভট থাকা

দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এমন ঘটেছে যেখানে বেদুইনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বিতরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে; তারা মনে করেছে তারা এর চেয়ে বেশি প্রাপ্য, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিরস্কার করেছেন, বার বার বিভিন্নভাবে বলেছেন যে, তিনি যদি সঠিকভাবে বণ্টন না করে থাকেন, তাহলে আর কে করবে? অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায় আচরণই করেছেন এবং তাদের আপত্তির কোনো ভিত্তি ছিল না। অধিকন্তু অন্যান্য মুসলমানরা একই ভুল করা থেকে সতর্ক হয়েছেন। এ থেকে সাহাবীরা খুব ভালোভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এ রকম একজন সৈন্যও পাওয়া বার না যে কিনা গনীমতের মাল বিতরণের ক্ষেত্রে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বরং তারা তাদের নেতার আচরণে পুরোপুরি সম্ভট ছিল। আর এটা কেনই বা হবে না? সেনাপতিরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশ অনুসরণ করেছেন, আর একইভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করেছেন।

ইয়ামামা যুদ্ধের সমাপ্তিতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গনীমতের মালের ব্যাপারে চিঠি প্রেরণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন জবাবে লেখেন, ‘গনীমতের মাল, মহিলা ও শিশুদের এবং আর বা কিছু তোমাদের আল্লাহ তা’আলা বনু হানীফা গোত্র থেকে দান করেছেন—সব জমা কর। তারপর সেখান থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে আমাদের নিকট প্রেরণ কর যাতে সেগুলো এখানকার মুসলমানদের মধ্যে

বিতরণ করা যায় এবং তোমার অধীনস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা প্রাপ্য তা দিয়ে দাও। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সব সেনাপতিরা ঠিক একই পদ্ধতিতে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বণ্টন করেছেন। কোনো সৈন্যই এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি অথবা খুব সামান্য পেয়েছে বলে অভিযোগ করেনি।^{২৭২}

৩। সৈন্যদের অধিকারসমূহ

ক। সারিবদ্ধ অবস্থায় তাদের দিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখা এবং তাদের দায়িত্ব নিশ্চিত করা

একদল মুরতাদ যখন মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। তারপর তাদের মধ্য থেকে ঐসব সৈন্যদের বাছাই করে নিলেন যারা মদীনার প্রধান প্রবেশ পথে পাহারার দায়িত্ব পালন করবে।^{২৭৩}

আবার যখন শাম অভিযানে প্রেরণের জন্য সেনাবাহিনী গঠন করলেন, তখন তিনি বাহনের উপর চড়ে এমন এক স্থানে অবস্থান নিলেন যেখান থেকে পুরো বাহিনীর উপর দৃষ্টি দেয়া যায়। তিনি তার সৈন্যদের দিকে তাকালেন যারা তার আগেই এসে জমা হয়েছিল এবং এ দৃশ্য দেখে তার চেহারা আনন্দ প্রতিভাত হলো। তারা রওনা হওয়ার আগে তিনি তাদের নসীহত করলেন; তাদের জন্য দুআ করলেন; যুদ্ধের পতাকা হস্তান্তর করলেন এবং তারা যখন রওনা হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের সাথে প্রায় দুই মাইল হেঁটে সঙ্গ দিলেন।^{২৭৪} নিশ্চিতভাবেই তিনি সৈন্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করে ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করে তাদের অন্তরে তাদের নেতার প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মানের বীজ রোপণ করেছিলেন।

খ। সৈন্যদের প্রতি নরম হওয়া

এটা সত্য যে, যুদ্ধ কঠিন এবং কষ্টকর; তথাপি একজন নেতার জন্য উচিত নয় যে, তিনি সৈন্যদের জন্য বিষয়টিকে প্রয়োজনের তুলনায়

^{২৭২} প্রাকৃত (১/১২০)।

^{২৭৩} আভ-তারিখ আভ-তাবারী (৪/৬৪)।

^{২৭৪} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান আল কামাল (১/১৩৬)।

আরও কঠিন করে তুলবেন। বরং তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের অবস্থানকে অধিক সহনীয় করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একজন পথপ্রদর্শক নিয়োগ করে সেনাবাহিনীকে সহজ এবং দ্রুত পথে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারেন। পথপ্রদর্শক ছাড়া সেনাপতি হয়তো এমন জটিল পথে গমন করতে পারেন যাতে কেবল দুর্ভোগ ও কষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সৈনিকদের প্রতি নরম আচরণ করার আদেশ দেন এবং পথ চলার জন্য একজন পথপ্রদর্শক নিতে বলেন।^{২৭৫} এই যুদ্ধের পুরো সময় জুড়েই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অন্যান্য সেনাপতিদের একই আদেশ দেন।^{২৭৬} ইরাক অভিযানে আলইয়াস গোত্রের সঙ্গে (এবং অন্যান্য গোত্রের সঙ্গেও) খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সন্ধিচুক্তি করতে একমত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি শর্তাধীন বিষয় হিসেবে নিশ্চিত করেছেন যে, তারা মুসলিম বহিনীর সঙ্গে রয়েছে, তাদের আগে হাঁটছে, তাদের পাহারা দিচ্ছে এবং মুসলিম কমান্ডারদের সবচেয়ে উত্তম পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি চুক্তির শর্ত হিসেবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ, আলইয়াস গোত্রের লোকদের ইরাকের পথ-ঘাট সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি তার সৈনিকদের জন্য সফরকে যতদূর সম্ভব সহজ ও আরামদায়ক করতে চেয়েছেন।

একইভাবে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইরাক ত্যাগ করে দ্রুত শামে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হলো, তখনও তিনি পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়েছেন। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামে প্রেরণ করার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'যখন তুমি সফর করবে তখন বিষয়টিকে তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য কষ্টকর বানিয়ে না।'^{২৭৭} তারপর যখন ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন সৈন্যকে দলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত এগুতে আদেশ দিলেন, তখন তাদের একজন তাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে স্মরণ করিয়ে দেন যাতে তিনি তার অধীনস্থদের প্রতি সদয় আচরণ করেন।^{২৭৮}

^{২৭৫} প্রাপ্তক।

^{২৭৬} মাসির আল-আনাকাহ, কলকাসাদি (৩/১৪০)।

^{২৭৭} ফতেহ আশ-শাম, ওয়াকিদী (১/২৩)।

^{২৭৮} ফতেহ আশ-শাম, ওয়াকিদী (১/২৩)।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তোমার সাথীদের সঙ্গে পিতার মতো আচরণ করবে, কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল (সম্ভবত অসুস্থও) লোকও রয়েছে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের অধীনস্থদের সঙ্গে সদয় এবং বিনয়ী আচরণের জন্য এত বেশি ভাগিদ দিয়েছেন যা সেনাপতিদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। এজন্য তাদের যে কেউ যেখানেই সফর করতেন, একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে রাখতেন এবং যে পথে পানি ও ঘাস সহজলভ্য, এমন সহজ ও আরামদায়ক পথ অবলম্বন করতেন। সবশেষে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কারও কোনো রকমের দৈহিক দুর্বলতা এবং মানসিক বৈকল্য ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছা।^{২৭৯}

গ। প্রতিটি ব্যাটালিয়ানের জন্য একটি শ্লোগান নির্বাচন

শ্লোগান দু-টি প্রধান ভূমিকা রাখে : এটা দলের সবাইকে একতাবদ্ধ রাখে এবং কষ্টকর পরিস্থিতিতে মানসিক বাধা উত্তরণে সহায়তা করে—বিশেষভাবে যখন শ্লোগানের বাক্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। যখন উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু শামে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান, তখন তার বাহিনীর শ্লোগান ছিল, ‘ইয়া মানসুর উম্মাত!’ যুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামাতে গমন করেন, তখন তার বাহিনীর শ্লোগান ছিল, ‘হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ!’ ইরাক অভিযানের সময় তানুকের শ্লোগান ছিল, ‘হে আল্লাহর বান্দাদের পরিবার!’ শাম অভিযানের সময় প্রতিটি ব্যাটালিয়ান এবং গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা শ্লোগান ছিল যা ব্যাটালিয়ানের সবাইকে একতাবদ্ধ থাকতে সহায়তা করে। যখন যুদ্ধ শুরু হতো, তখন প্রতিটি ব্যাটালিয়ানের প্রতিটি সদস্য সজোরে শ্লোগান উচ্চারণ করত। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাটালিয়ানের শ্লোগান ছিল, ‘হে উম্মাত, হে উম্মাত’; খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাটালিয়ানের শ্লোগান ছিল, ‘হে আল্লাহর দল’; আবস গোত্রের শ্লোগান ছিল, ‘হে আবসের লোকসকল’; ইয়েমেনবাসী এবং তাদের সঙ্গীদের শ্লোগান ছিল, ‘হে আল্লাহর সাহায্যকারী’; হিময়ার আল-ফাতহ এবং দারাম আস-সাকাসিক গোত্রের শ্লোগান

^{২৭৯} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান আল কামাল (১/১৪৯)।

ছিল, ‘ধৈর্য, ধৈর্য’; বনু মুরাদ গোত্রের শ্রোগান ছিল, ‘হে আব্বাহর সাহায্য, আমাদের উপর নাযিল হও।’ এগুলো ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্রোগান।

ঘ। শত্রুর নজরদারী এবং অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে সৈন্যদের হেফাজত করা

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সামরিক অভিযানে কমান্ডারদের প্রেরণ করতেন, তখন তিনি কোনো আগন্তুককে নিজেদের ক্যাম্পের ভেতর প্রবেশ করা এবং মুসলমান সৈন্যদের সাথে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দিতে নিষেধ করতেন—যতক্ষণ না তার পরিচয় জানা যেত এবং গোয়েন্দা না হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যেত। একইসাথে অতীতে মুরতাদ হয়েছিল, এমন কাউকে তিনি মুসলমানদের সৈনিক হিসেবে দলে নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের বিশ্বস্ততার প্রয়োজন ছিল এবং তারা মুরতাদদের উপর আস্থা রাখতে পারতেন না যেহেতু তাদের ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। সহজ কথায়, যেহেতু তারা একবার দুনিয়ার মোহে ইসলামবিমুখ হয়েছিল, সুতরাং আবার একই কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নেয়ার সম্ভাবনা ছিল—বিশেষভাবে যখন তারা দেখত যে, শত্রুপক্ষ মুসলমানদের উপর বিজয় অর্জন করছে।

শাম (সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের বিদেশি বার্তাবাহকদের সাথে খুব সতর্ক আচরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর দুর্বল দিকগুলো বিদেশি বার্তাবাহকদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা অথবা তাকে সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না দেয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে তারা মুসলমানদের ব্যাপারে কোনো সংবেদনশীল তথ্য যোগাড় করে তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা ত্যাগ করার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘শত্রুপক্ষের কোনো বার্তাবাহক তোমার নিকট এলে, তার সঙ্গে সদয় আচরণ করবে যেন তারা ভালো অনুভূতি নিয়ে ফিরে যেতে পারে। তোমার সঙ্গে তাদের খুব অল্প সময়ের জন্য থাকার সুযোগ দেবে যাতে তারা যাওয়ার সময় তোমার গোপনীয় কোনো বিষয় জানতে না পারে

এবং তোমার সৈন্যদেরও তাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করবে।
তুমি একাই শুধু তাদের সঙ্গে কথা বলবে।’

সাধারণ সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পাহারাদার নিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন যেন তারা শত্রুর যে কোনো অকস্মাৎ আক্রমণে সবাইকে সতর্ক করতে পারে। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মদীনার প্রবেশ পথে পাহারাদার নিয়োগ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তার এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাকে সব সময় শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। ইরাক ও শাম অভিযানে সেনাপতিদের তিনি একই উপদেশ দিয়েছিলেন। মূলত পাহারাদারদের দায়িত্ব এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যদি একজন পাহারাদারও ঘুমের কারণে তার দায়িত্বে অবহেলা করে তাহলে সে একাই পুরো মুসলিম বাহিনীর উপর শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ কিংবা মুসলিম তাঁবুতে তাদের অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী হতে পারে—এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতিদের এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, তারা যেন না জানিয়ে মাঝে মাঝে পাহারাদারদের খোঁজ-খবর নেন যাতে যারা এ দায়িত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি, তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যখন শামের উদ্দেশে ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রওনা হবেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘অনেক পাহারাদার নিযুক্ত করবে এবং তাদের দিনে-রাতে বিভিন্ন সময় না জানিয়ে দেখতে যাবে (তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে কি না)।’^{২৮০}

শাম অভিযুখে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনা থেকে বিদায় দেয়ার সময়ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তোমার সাথীদের কাউকে তাঁবুর প্রবেশ পথে পাহারায় নিযুক্ত করবে এবং তারপর ব্যক্তিগতভাবে তাদের দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রাখবে।’ মুসলিম সেনাপতিগণ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তারা সফরের সময় এবং তাঁবুতে অবস্থান করার সময়ও পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন।^{২৮১}

^{২৮০} মুক্কাব আদ-যাহাব (২/৩০৯)।

^{২৮১} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান আল কামাল (১/১৯৬)।

ঙ। সৈন্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার-পানীয় সরবরাহ করা

এটা সত্য যে, মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের জন্য কিছু পরিমাণ খাবার-পানীয়ের সরবরাহ যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল; তথাপি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে কোনো অভিযানের শুরুতেই প্রেরিত বাহিনীর সদস্যদের জন্য অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। বস্তুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন সামরিক অভিযানের জন্য অনবরত উট, ঘোড়া এবং অস্ত্র ক্রয় করছিলেন।^{২৮২} খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এই আদেশ দেন যে, তিনি যেন শত্রুর ভূমির অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা না করেন।^{২৮৩}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপতিরাও তাদের বাহিনীর সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার এবং রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তার যখন কোনো গোত্রের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতেন, তখন চুক্তিতে এটা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করতেন যে, অত্র এলাকার সব লোকজন মুসলিম বাহিনীকে হালাল খাবার ও রসদ সরবরাহ করবে এবং তা তাদের দেশের মধ্য দিয়েই পৌছাতে হবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের উট কিংবা ভেড়াকে জোরপূর্বক যবেহ করে খাওয়াকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতিসাপেক্ষে মুসলিম বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ না থাকায় একবার তিনি এ রকম হালাল পশুকে যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন যা ছিল একটি ব্যতিক্রম ঘটনা।^{২৮৪}

চ। মুসলিম সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে রণসাজে দাঁড় করানো

বিভিন্ন যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক বাহিনীর সেনাপতিরা সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে যুদ্ধের সূচনা করেছেন; যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এ সারির দৈর্ঘ্য কম বা বেশি হতো।^{২৮৫}

^{২৮২} আল-খাররায়, আবু ইয়ুসুফ (পৃ. ২৮৬, ২৮৭)।

^{২৮৩} নিহাইয়াতুল আরিব, আন-নুওয়াইরি (৬/১৬৮)।

^{২৮৪} নিহাইয়াতুল আরিব, আন-নুওয়াইরি (৬/১৬৮)।

^{২৮৫} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান আল কামাল (১/২৩১)।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে সৈন্যদের অভেদ্য সারিতে দাঁড় করাননি—এটাই ছিল তখনকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যতিক্রম ঘটনা। এর পরিবর্তে তিনি সৈন্যদের ছোট ছোট সারিতে ক্রাস্টার ফর্মে দাঁড় করিয়েছেন এবং একটি ক্রাস্টার থেকে আরেকটির বিশাল দূরত্বে অবস্থান করছিল। এ দূরত্বের কারণে মুসলমানদের ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে যা তাদের স্বাধীনভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুভমেন্ট করতে সহায়তা করে। এ রকম নতুনত্ব প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল কারণ, তা রোমানদের বিশাল বাহিনীর বিপরীতে ছিল খুবই কার্যকরী। যাহোক, এ যুদ্ধের পরে মুসলমানরা আবার পূর্বের সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার নীতিতে ফিরে আসেন।^{২৮৬}

ছ। সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান

সৈনিকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করা সেনাপতিদের একটি অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্ববোধ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল না। বরং তিনি অনবরত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সৈনিকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পুরস্কারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের জিহাদে জয়যুক্ত হওয়ার পথও বাতলে দিয়েছেন। প্রায়ই তিনি এ লক্ষ্যে সামান্য কিছ শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতেন যা ছিল গভীর অর্থবোধক। যেমন তিনি একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে উৎসাহমূলক বক্তব্য দিলেন, ‘মৃত্যু তালাশ কর, তাহলে তোমাকে জীবন দেয়া হবে।’^{২৮৭} শাম অভিযানের পূর্বে সেনাপতিদের হাতে যখন যুদ্ধের পতাকা হস্তান্তর করলেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈনিকদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিলেন, তাদের নসীহত করলেন, তাদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং তাদের সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে আদেশ দিলেন।^{২৮৮}

জ। বিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও বরফ সৈনিকদের সঙ্গে পরামর্শ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের সঙ্গে

^{২৮৬} আল-ইদারাহ আল-আসকারিয়াহ ফিদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ, সুলাইমান আল কামাল (১/২৩২)।

^{২৮৭} প্রাণ্ডক (১/২৩৮)।

^{২৮৮} ফতেহ আশ-শাম, আজদি (পৃ. ১১-১৫)।

দেশের জনগণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতেন। উদ্ধৃত জটিল কোনো বিষয়ে শরীয়তের হুকুম জানার প্রয়োজন হলে এবং মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে কোনো যুদ্ধ কিংবা অভিযান প্রেরণের ইচ্ছা করলে তিনি তাদের মতামত জানার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আমর! অবশ্যই কুরাইশদের মধ্যে তুমি একজন প্রখর বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তুলাইহাহ প্রকাশ্যে নবী হওয়ার দাবি করছে। আমাদের এখন কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর?’ তার আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক পারদর্শিতার কথা তুলে ধরলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ যুদ্ধের মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন।

তিনি নিজে একাই কেবল তার বিশুদ্ধ উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করেননি, বরং তিনি তার সেনাপতিদেরও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছিলেন।^{২৮৯} এই নির্দেশ অনুযায়ী খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে তার অধীনস্থ সৈনিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে; তারপর তিনি মদীনার উচ্চপদস্থ কর্মবর্তাদের তার যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যেখানে সব সৈনিকরা একমত পোষণ করেছিলেন।^{২৯০}

শামে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের চিন্তা করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন—এসব উপদেষ্টাদের মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রবীণ সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের এ নীতিকে তিনি তার সেনাপতিদের প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন; উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইয়াজিদ ইবনে আবু সফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘এই যে রাবিয়াহ ইবনে আমির...তুমি তার সাহস সম্পর্কে জান, তাহলে এটাও জেনে রাখ : আমি তাকে তোমার সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিয়েছি এবং তোমাকে তার আমীর বানিয়েছি। সুতরাং তাকে আগে রাখ (সম্মান কর), বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ কর এবং তার বিরোধিতা করো না।’ ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমি

^{২৮৯} আল-আমালিয়াত আত-তাআরুদিয়াহ ওয়াদ-দিফাইয়াহ ইনদাল মুসলিমিন (পৃ. ১৪২)।

^{২৯০} আল-ফতেহ, ইবনে আতাম (পৃ. ১১-১৫)।

ভালোবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন করে তার হুকু আদায় করব।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, 'যখন তুমি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ কর অথবা সফর কর, তখন তুমি বিষয়টিকে তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য কঠিন করো না। তুমি লোকদের প্রতি অথবা তোমার সঙ্গীদের প্রতি রাগ করো না। তাদের নিকট থেকে সৎ পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং তাদের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করবে।'^{২১১}

ভালো স্বভাব এবং প্রফুল্লতা সংক্রামক। মুসলিম সেনাপতিরা যেমন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখতেন, তারা নিজেরাও তেমনি পরামর্শের এই নীতিকে অনুসরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'হে আমর! মুসলমানরা তোমার উপস্থিতিতে এবং তোমার মূল্যবান পরামর্শে বিভিন্ন সময় উপকার লাভ করেছে। মনে রেখো, আমি তোমাদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, যদিও আমাকে তোমাদের নেতা বানানো হয়েছে! আমি তোমার মতামত ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। সুতরাং প্রতিদিন তুমি তোমার মূল্যবান সৎ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে, আমি তোমাকে ছাড়া (তোমার সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত) কিছুই করব না।'

ঝ। সৈনিকদের আল্লাহর হুকু আদায় করার হুকুম দেওয়া

একজন নেতা অবশ্যই তার অধীনস্থদের দুনিয়াবী প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত খাবার-পানীয় এবং অন্যান্য আসবাবপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করবে; তাদের জীবনের নিরাপত্তাবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সস্ত্র সরবরাহ করে শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে; একইসাথে তাদের আল্লাহর হুকু সম্পূর্ণভাবে আদায় করার জন্য সুযোগ দেবে এবং তা নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি যে বাহিনী আল্লাহর প্রতি অবাধ্য হবে, তাদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য লাভ করার আশা করা যায় না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সত্য জানতেন। এজন্য তিনি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্যালেস্টাইনে প্রেরণের পূর্বে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছেন, 'প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ভয় কর। যখন একা থাক, তখন তার প্রতি লজ্জিত হও—কারণ, তিনি তোমার সবকিছু দেখেন। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আমি

তোমাকে তোমার চেয়ে অধিক ঈমানদার লোকদের উপর নেতৃত্ব দিয়েছি এবং তোমার অধীনস্থদের অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানদের মধ্যে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অবস্থান করছে। সুতরাং যারা আখেরাতকে সামনে রেখে কাজ করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং তোমার কাজ-কর্মে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা কর। তোমার অধীনস্থদের সাথে পিতার মতো আচরণ কর। নামাযের প্রতি যত্নবান থেকে। আমি আবার বলছি, নামাযের প্রতি যত্নবান থেকে। নামাযের সময় হলে আযান দিয়ো। আযান যেন ক্যাম্পের সবাই শুনতে পারে। তারপর জামাতে নামায আদায় করবে। শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক সদস্য যেন অবশ্যই কুরআন তিলাওয়াত করে। সবাইকে ইসলামপূর্ব যুগের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করবে। এই বিষয়ে কথা বললে নিজেদের মধ্য দ্বন্দ্ব এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দুনিয়ার আনন্দদায়ক উপভোগ থেকে বিরত থাকবে এবং যারা আগে চলে গিয়েছে তাদের সাথে দেখা হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে। কুরআনে যেসব নেতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ﴿٢٨٢﴾

আমি তাদের নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি অহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার ইবাদতে ব্যাপ্ত ছিল।^{২৮২}

চার। মুসলমানগণ কীভাবে রোমান ও পারসিকদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন

মুসলমান জাতি এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে যা বাহ্যিকভাবে ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম জাতি, যাদের শত্রুরা হঠাৎ গজিয়ে উঠা জাতি বলে মনে করত, তখনকার দুই

পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে অনেকের নিকট ইসলামের শুরুতে মুসলিম বাহিনীর অবিশ্বাস্য সব সাফল্য মূলত ব্যাখ্যার অতীত। ইতিহাসের ঐসব নবদিগন্ত সূচনাকারী ঘটনাবলি বাস্তব সত্য, কিন্তু এগুলো সত্যিকার অর্থে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ কিংবা বোঝার চেষ্টা করা হয় না। বিজ্ঞ ইতিহাসবেত্তার পক্ষে পারস্য এবং রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাফল্যের পেছনে অনেকগুলো যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্যই নির্ণয় করা সম্ভব। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন; মনে হয় তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনায় সংঘটিত হয়েছিল। তারপর অবশ্যই সফল নেতৃত্ব যা খুলাফায়ে রাশেদীন প্রদর্শন করেছেন—আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তারপর কিছু কারণ ছিল যা মুসলমানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একইভাবে কিছু কারণ ছিল যা পারস্য ও রোমানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মুসলমানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। মুসলমানগণ প্রচণ্ড ঈমানীশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন।

২। মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তারা প্রগাঢ়ভাবে তাকদীরের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যিকার অর্থে তারা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবেই তাদের পুরো জীবদ্দশায় রিযিকের পরিমাণ এবং তাদের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এজন্য তারা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং তারা জানতেন, আল্লাহর ইচ্ছা থাকলেই তারা মৃত্যুবরণ করবেন, নতুবা নয়।

৩। সাহসিকতা এবং যুদ্ধ করার শক্তি মনোবল তাদের অন্তরে গোঁথে ছিল।

৪। মুসলমানগণ বিজয়কৃত এলাকায় লোকজনের প্রতি বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ, সদয় এবং অনুগ্রহশীল ছিলেন; ফলে তারা তাদের মন ও হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। বিজয়কৃত এলাকার লোকজনের আনুগত্য অর্জন করার পর তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এ

অর্জন কণহায়ী নয়। সামান্য বিদ্রোহে এ আনুগত্য ভেঙে যাবে না, বরং তা স্বায়ী।

৫। কোনো এলাকা বিজয় করার পর জিযিয়া কর নির্ধারণে মুসলমানগণ দয়াপরাবশ হয়ে সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক পরিমাণই আশা করতেন। ফলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অমুসলিমদের মনে ভিত্ততা ও শত্রুতা তৈরি হতো না।

৬। মুসলিম বাহিনীতে অনবরত দক্ষ জনবল সরবরাহে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। এসব ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। তাদের অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শহীদ হওয়াকেই বেশি পছন্দ করতেন। সত্যিকার অর্থে এ রকম সাহসী কয়েক হাজার মানুষ হাজার হাজার সৈন্যের যে কোনো বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম। ইরাক ও শামে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল।

৭। মুসলমানরা যুদ্ধের এমন পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল যা দেখলে মনে হয়, ঐশ্বরিক প্রেরণাতেই ঐ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রতিটি যুদ্ধেই—মুর্তাদদের বিরুদ্ধে, পারস্য ও রোমানদের বিরুদ্ধে—মুসলমানরা এমন কৌশল প্রয়োগ করেছে যা তাদের যথার্থ ফলাফল এনে দিয়েছে।^{২৯৩}

মুসলমানগণ যেসব কারণে পারস্য ও রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ রকম পরাজয়ের পেছনে পারসিক ও রোমানদেরও কিছু কারণ চিহ্নিত করা যায়। দু-জন বাদশাই দায়িত্ব পালনের সর্বশেষ অবস্থায় পাকড়াও করার উপযুক্ত ছিলেন। তাদের উভয়ের শাসনকাল ছিল চরম অরাজকতা, অন্যায়-অত্যাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতিতে জর্জরিত। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম হচ্ছে, যখন কোনো দেশ বা জাতির মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি বিস্তৃতি লাভ করে, তখন সে দেশ বা জাতির অবনতি হতে থাকে এবং অন্যায়-অত্যাচারের সীমাহীন মাত্রা খুব বেশি বেড়ে গেলে, সে দেশ বা জাতির মধ্যে ভাঙ্গণ শুরু হয়। পতনের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, এই দুই সাম্রাজ্যের লোকজনের

^{২৯৩} তারিখ আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম (পৃ. ২২২-২৭)।

নৈতিক চরিত্রের মারাত্মক অবক্ষয়ের কারণে তারা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে এসেছিল। অপর দিকে মুসলমানরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের পুরোপুরি অনুসরণকারী ছিলেন; সুতরাং তারা বিজয়েরই উপযুক্ত ছিলেন।

উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, এ থেকে সম্মানিত পাঠকের এ ধারণা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, পারসিক ও রোমানদের পরাজিত হওয়ার পেছনে তাদের দুর্বলতার ভিত্তিতে মুসলমানদের পক্ষে এ বিজয় অর্জন কোনো সহজসাধ্য ও আরামদায়ক ছিল। অপরদিকে উভয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের দোরগোড়ায় থাকলেও তা তাদের নেতাদের হাজার হাজার সৈন্য জমা করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেনি। আক্রমণকারী মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে তাদের সেনাদের পরিমাণ অনেক গুণ বেশি ছিল। তারা কেবল সংখ্যাধিক্যেই মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল না, বরং তাদের অনেক বেশি উন্নত সামরিক সরঞ্জামাদি, অফুরন্ত রসদ সরবরাহসহ এমন সব অস্ত্র ছিল যা মুসলমানরা ইতিপূর্বে দেখেনি—যেমন : হাতি এবং উত্তম বড়শি যা তারা দুর্গসমূহে আক্রমণে উদ্যত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, রোমানরা মুসলমানদের হালকাভাবে নিয়েছিল অথবা তাদের অবমূল্যায়ন করেছিল। মুসলমানরা একদিন সহসাই শক্তি অর্জন করে রোমান সাম্রাজ্য দখল করে নিবে—হেরাকল দীর্ঘদিন ধরেই এ আশঙ্কা করত। সুতরাং মুসলমানদের অবমূল্যায়ন করার পরিবর্তে হীরাকল তাদের রীতিমতো ভয় পেত এবং তাদের ব্যাপারে আক্রমণের আশঙ্ক করত। এনমনি তিনি যখন মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তখন খ্রিস্টান পাদরিরা একমত না হওয়ার তাদের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, ‘এ বিষয়ে (আমাদের ভূখণ্ডের দিকে মুসলমানদের আসা) আমি তোমাদের সতর্ক করছি এবং এর পরিবর্তে, তোমরা সবাই আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছ।’^{২৯৪}

চতুর্থ অধ্যায়

আবু বকর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নিয়োগ এবং আবু
বকর রা.-এর ইন্তেকাল

এক। আবু বকর রা. কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নিয়োগ

১৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকে এবং যখন এটা প্রতিভাত হয় যে, তার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি লোকদের তার চারপাশে জমা হতে আদেশ দেন। যখন সবাই একত্রিত হলেন, তখন তিনি বললেন, ‘আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছি, এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। রোগের তীব্রতা এত বেশি যে, আমার মনে হয়, আমি শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করব। সুতরাং তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তি থেকে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দেবেন। এখন আল্লাহ তা’আলা জাগতিক সব বিষয়াদি তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন (তোমাদের মধ্য থেকে নতুন নেতা নির্বাচনে তোমাদের সামর্থ্য), সুতরাং যাকে ইচ্ছা, তাকে তোমাদের নেতা নির্বাচন করে নাও। মূলত, আমি বেঁচে থাকতে যদি তোমরা পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করতে পারতে, তাহলে এ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ কম হতো।’

পরবর্তী খলীফা নির্বাচন চূড়ান্ত করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিলেন :

১। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য হতে বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।

মুসলিম জাতির পরবর্তী খলীফা নির্বাচন নিয়ে সাহাবীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। যখন কোনো সাহাবীকে এ পদ গ্রহণের জন্য বলা হতো, তখন ঐ সাহাবী দ্বিমত পোষণ করতেন এবং অন্য কাউকে নির্বাচন করার পরামর্শ দিতেন। এ রকমই ছিলেন রাসূলের সাহাবীরা : প্রত্যেকেই তার অন্য মুসলিম ভাইকে নিজের চেয়ে ভালো এবং অধিক যোগ্য মনে করতেন। এ কারণে সাহাবীরা তাদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা পদে নির্বাচিত করতে পারলেন না এবং তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! (খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে) আপনার মতই আমাদের মত।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে আমাকে কিছু সময় দাও যাতে আমি চিন্তা করতে পারি যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে কে সবচেয়ে উত্তম হবে এবং কে তার মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও তার বান্দাদের জন্য কল্যাণকর হবে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাত অনুসরণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এ নীতির কারণে তিনি কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রথমে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার পরবর্তী খলীফা উমর হলে তুমি কেমন মনে কর?’ আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনারই অধিক জ্ঞান রয়েছে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তবু তুমি বল।’ আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, উমর প্রকৃতপক্ষেই একজন ভালো লোক।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে উসমান! আমার পরে উমর খেলাফতের আসনে বসলে তুমি কেমন মনে কর?’ উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমাদের সবার থেকে আপনারই অধিক জ্ঞান রয়েছে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তবু তুমি বল, হে আবু আব্দুল্লাহ।’ তখন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘উমর সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তার বাইর থেকে ভেতর অনেক ভালো। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় তার তুলনা নেই।’

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আপনার পরে তিনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। সুখের সময় তিনি খুশি প্রকাশ করেন এবং রাগের সময় রাগ প্রকাশ করেন। আর প্রকাশ্যে তিনি যে আচরণ করেন, তার ভেতর আরও উত্তম। খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে যোগ্য এবং দায়িত্বশীল আর কেউ নেই।’

একইভাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনে যালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে অন্যান্য প্রবীণ ও প্রধান সাহাবীদের ডেকে এ বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করেন। বেশিরভাগই এ মত পোষণ করেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতার ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আপনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন যখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন যে, কেন তুমি উমরকে তোমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলে যেখানে তুমি তার কঠোর আচরণের ব্যাপারে অবগত ছিলে?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমাকে সাহায্য কর। বল।’ তারপর বললেন, ‘তোমরা আমাকে শান্তির ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! খলীফা নির্বাচনে কেউ অসৎ এবং অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে অবশ্যই শান্তি পাবে। (তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলছি) আমি আল্লাহর কাছে জবাব দেব, ‘হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার একজন অতি ন্যায়পরায়ণ এবং শ্রেষ্ঠ বান্দাকেই আমার স্থলবর্তী করে এসেছি।’ বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে আরও যুক্তি পেশ করেছেন এ কথা বলে, ‘আমার নন্দ ব্যবহার দেখে তোমরা উমরকে কঠোর মনে করছ। খেলাফতের দায়িত্ব মাথায় চাপলে তার কঠোর প্রকৃতি কোমল স্বভাবে পরিণত হবে।’

২। পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি লিখিত ডিক্রি জারি করেন যা মদীনবাসী এবং মদীনার বাইরে বসবাসকারী সকল মুসলমানের নিকট পড়ে শোনানো হয়।

এ ডিক্রিতে যা লিপিবদ্ধ করা তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা ইহলোক হতে পরকালের দিকে যাত্রাকালে এই অসিয়ত করে যাচ্ছে, অন্তিম সময় একটি মহা সংকটের সময়, এই মহা সংকটময় মুহূর্তে দুর্দান্ত কাফেরও স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করে এবং অতি বড় মিথ্যাবাদীও সত্য কথা বলে দেয়। আমার পরে আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করে যাচ্ছি। হে মুসলমান! তোমরা সবাই তার অনুগত থেকে। তোমাদের হিতকামনায় আমি কখনও ত্রুটি করিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উমর সব কাজই সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, অন্যায় বা অবিচার করলে কাল কিয়ামতের দিন তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট জবাবদিহি করবে। গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন।’

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল
কীরূপ? ২৯৫

মুসলিম জাতির জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন একমাত্র সমাধান। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখছিলেন যে, দুনিয়া সম্পদ এবং প্রাচুর্য নিয়ে মুসলমানদের নিকট ধৈর্য আসছে এবং তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, যদি তারা সেসব হাত প্রসারিত করে গ্রহণ করে, তাহলে তারা অবশ্যই ধ্বংস ডেকে আনবে। এটা অবাস্তব নয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্মরণ করছিলেন,

فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ
عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطْتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا
تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتَهُمْ

আমি দরিদ্রতার জন্য তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি না। বরং আমি এ দুনিয়ার অফুরন্ত নেয়ামতকে ভয় পাচ্ছি যা তোমাদের দেয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল; ফলে

পূর্ববর্তীদের ন্যায় এগুলো নিয়ে তোমরা প্রতিযোগিতা করবে।
অথচ এটা তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন পূর্ববর্তীদের ধ্বংস
করেছিল।

এ অবস্থাকে ভয় পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি সমাধান
দিয়েছেন—এ সমাধান আদর্শগত এবং বাস্তবভিত্তিকও, উমর ইবনে
খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব। সর্বোপরি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু
এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন,

أَيُّهَا ابْنُ الْخَطَّابِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا
فَجَاقَظَ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

হে ইবনুল খাত্তাব, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! তুমি
যে পথে চল সে পথে শয়তান চলে না।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সব সিদ্ধান্ত এবং মতামতই সঠিক ছিল। এ
ব্যাপারেও তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর
ইচ্ছাকালের পরেই মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন পরীক্ষা ও দুর্যোগ ঘিরে ধরে।
এটাই প্রমাণ করে যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উমর রাযিয়াল্লাহু
আনহুকে খলীফা হিসেবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক
ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘মুসলিম
ইতিহাসে তিনজন বিখ্যাত বাস্তবভিত্তিক পরামর্শক ছিলেন। তারা হলেন :

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

পিতা! তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর
হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।^{২৯৬}

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

একে সম্মানে রাখ। সম্ভবত সে আমাদের কাছে আসবে অথবা
আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব।^{২৯৭}

এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন যেন অভেদ্য বাঁধ যা বিপথগামিতা এবং পরীক্ষা ও দুর্যোগের শ্রোত থেকে মুসলিম উম্মতকে রক্ষা করেছে।

৩। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য পরবর্তী ধাপ ছিল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার সিদ্ধান্তকে জানানো। এ কথা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন নিজের অনিচ্ছার কথা বললেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কেবল কথা দ্বারা ভয় দেখাননি, বরং তরবারির ভয়ও দেখিয়েছিলেন। অন্য কোনো উপায় না দেখে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন এবং তিনি তার চাওয়ার সর্বশেষ সুযোগ হিসেবেই এটা গ্রহণ করেছিলেন।

৪। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের কারণে যেন কোনো ধরনের মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি লোকজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমি যাকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছি, তোমরা কি তাতে সম্মত আছ? অবশ্যই আমি দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং আমি আমার কোনো আত্মীয়কে খলীফা মনোনীত করিনি। আমি তোমাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করেছি। তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার অনুগত থাকবে।’ তারা বলল, ‘আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।’

৫। তারপরেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সিদ্ধান্ত নিতে জাগতিক সব প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও হেদায়েতের জন্য দুআ করার কথা ভুলে যাননি। বর্ণনার পাওয়া যায় যে, তিনি তার অন্তিম অসুস্থতার সময় বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তাকে খলীফা নির্বাচিত করেছি যদিও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করে যাননি। তারপরেও তার এ নিয়োগের মাধ্যমে আমি মুসলিম জাতির অবস্থার উন্নতি কামনা করছি। তাদের উপর কঠিন পরীক্ষা ও দুর্যোগ নেমে আসবে বলে আমি শঙ্কিত। সুতরাং তাদের

জন্য যা ভালো হবে, তা-ই নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করেছি। এজন্য আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছি—যে তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার উপর কী বিপদ আপতিত হয়েছে (অসুস্থতা এবং আমার আসন্ন মৃত্যু); সুতরাং আপনার বান্দাদের জন্য আমার পরিবর্তে আরেকজন (ভালো স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করুন।’

৬। পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করার পর যাতে জনগণের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি না হয়, এজন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব ধরনের কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তারপরেও তিনি আরও কিছু সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যাতে ক্ষমতার এ হস্তান্তর সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার আদেশ সম্বলিত চিঠি জনগণের মধ্যে পড়ে শোনানোর দায়িত্ব দেন এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে জনগণের বাইআত গ্রহণ করার জন্যও বলেন। এসব ঘটনাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর আগেই সংঘটিত হয়েছিল। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর লিখিত আদেশ খামবন্ধ অবস্থায় জনগণের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা কি এ চিঠিতে উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট বাইআত গ্রহণ করতে রাজি আছ?’ তারা বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তারা সবাই একযোগে সম্মতি প্রকাশ করে এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগে খুশি প্রকাশ করে।

৭। মুসলিম জাতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বেঁচে থাকতেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বাইআত গ্রহণ করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের সব দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইজ্তেকাল করেন। পাঠকরা খেয়াল করবেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশেই খলীফা নিযুক্ত হননি, বরং তাতে ‘আল-হিল ওয়াল-ইকদ’ মানুষদেরও আকৃষ্ট সম্মতি ছিল। ‘আল-হিল ওয়াল-ইকদ’ মানুষ মানে সমাজের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগের ক্ষেত্রে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবীরা যা ‘আল-হিল ওয়াল-ইকদ’-এর লোকজন সবাই একমত পোষণ করেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিক একইভাবে নিয়োগ পাননি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচন মূলত ইসলামের শূরাহ নীতির (পরস্পর আলোচনা) ভিত্তিতে হয়েছিল। আমরা উপরের বর্ণনায় দেখছি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক বিজ্ঞ ও প্রবীন সাহাবীর সঙ্গেই পরামর্শ করেছেন। সুতরাং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগ পারস্পরিক পরামর্শ এবং উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছিল। কোনো ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে বলে বর্ণনায় পাওয়া যায় না। এমনকি কোনো ব্যক্তি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার অপসারণ চেয়েছে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। পুরো মুসলিম জাতিই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারা তাকে মেনে চলা শুরু করল এবং তারা তার খেলাফতের শেষমূহর্ত পর্যন্ত অনুগত থেকেছে।

৮। উমর রা.-এর প্রতি আবু বকর রা.-এর বিদায় উপদেশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদশায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একান্তভাবে অনুগত এবং অনুসারী ছিলেন। তারপরে দু-বছর বা এর চেয়ে কিছু বেশি সময় তিনি অনুসারী হিসেবে নয়, বরং নেতা হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন—সামান্য কয়েকজন মানুষের নেতা হিসেবে নয়, বরং পুরো মুসলিম জাতির নেতা। তিনি দিন-রাত পরিশ্রম করতেন, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম জাতির সবকিছু স্বাভাবিক এবং সহজভাবে সম্পন্ন করার জন্য আত্মাণ চেষ্টা করতেন। পরিশেষে দীর্ঘ পরিশ্রম ও কষ্টের পর তিনি তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাচ্ছেন, কিন্তু এ জগৎ ত্যাগ করার আগে তার আরেকটি কাজ বাকি ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করা প্রয়োজন ছিল।

তারা যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎ করেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিম্নলিখিত নসীহত করেন :

হে উমর! আল্লাহকে ডয় কর। জেনে রাখ, কোনো কোনো কাজ দিনে করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, তা রাতে করা হলে

আল্লাহ তা কবুল করবেন না। অনুরূপভাবে যে কাজ রাতে করার আদেশ করেছেন, তা দিনে করলে কবুল হবে না। ফরয কাজ সমাধা না করে নফল কাজ করলে তাও কবুল হয় না। নেক কাজ ব্যতীত কিয়ামতের দিন পাল্লা ভারী হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেক কাজ করবে, কিয়ামতের দিন তার পাল্লাই ভারী হবে। আর যদি কিয়ামতের দিন কারও পাল্লা হালকা হয়, তাহলে দুনিয়াতে বদ আমল করার জন্যই হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বদ আমল করবে, কিয়ামতের দিন তার পাল্লা হালকাই হবে।

কুরআনে যে যে স্থানে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের উল্লেখ করেছেন, সেখানেই নেককাজ করার জন্য এবং পাপকার্য বর্জন করার জন্যও প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বহু স্থানে রহমত এবং আযাবের বর্ণনা একসঙ্গেই করেছেন; সুতরাং যেমন নেককাজের প্রতি সচেষ্টি থাকতে হবে, তদ্রূপ পাপকার্য হতেও বিরত থাকতে হবে। হে উমর! তুমি আমার এ সব কথা শ্রবণ করে তদনুযায়ী আমল করলে মৃত্যুই তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বস্তু হয়ে পড়বে। তুমি সর্বদা আল্লাহর নিকট মৃত্যুই কামনা করবে। আরা আমার কথামতো না চললে মৃত্যুর ন্যায় অপ্রিয় বস্তু তোমার নিকট আর কিছুই হবে না।

দ্বিতীয়। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'কনকনে শীতের সময় ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জ্বরে আক্রান্ত হন। পনেরো দিন পর্যন্ত তিনি এই জ্বরে ভোগেন। এ সময় তিনি ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। বরং তার নির্দেশে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে জামাআতের ইমামতি করেন। লোকজন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে আসত। তবে তার পুরো অসুস্থতার সময় সবচেয়ে বেশি সেবা-শুশ্রূষা করেছেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{২৯৮} যখন তার অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন কেউ একজন বলল, 'আপনি একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভালো হতো।'

তিনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, করেছি। তিনি বলেছেন, আমার যা ইচ্ছা তা-ই করব।'^{২৯৯}

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, অন্তিম অসুস্থতার সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'দেখ, খলীফা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি কী পরিমাণ অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়েছি এবং অতিরিক্ত সম্পদ আমার পরবর্তী খলীফার নিকট হস্তান্তর করবে।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, তার নিকট বাইতুল মালের তহবিলের একজন দাসী (যে তার সন্তানদের কোলে-কাখে রাখত) এবং একটি উট (যা তার বাগানে পানি দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো) রয়েছে। আমরা সেগুলো উমরের নিকট পাঠিয়ে দিই। উমর এগুলো গ্রহণ করে কেঁদে ওঠেন এবং বলেন, 'আল্লাহ আবু বকরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হতে কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রচণ্ড কাজের ভার বহন করেছিলেন।'^{৩০০}

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিতার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। পিতার মৃত্যুকষ্ট দেখে তিনি একটি কবিতার কয়েকটি লাইন পাঠ করেন। এ কবিতা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারায় রাগ ফুটে উঠে এবং বলেন, 'তুমি যা বলছ, বিষয়টি সেরকম নয়। হে উম্মুল মু'মিনীন, আল্লাহর কথাই সর্বাধিক সত্য :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ①

আর মৃত্যুর কষ্ট সত্যিই এসে পড়েছে। এটা সেই মৃত্যু যাকে তুমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত।'^{৩০১}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর বলেন, 'হে আয়েশা! আমার পরিবারেই তুমিই আমার সর্বাধিক প্রিয়। তুমি আমার একটি ফলের বাগান নিয়েছ এবং আমি এ ব্যাপারে স্বস্তিবোধ করছি না। সুতরাং তুমি সেটি

^{২৯৯} তারতিব ওয়া-তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (পৃ. ৩৩)।

^{৩০০} সিকাতুস সাফওয়াহ (১/২৬৫)।

^{৩০১} সূরা আল-কফ, ৫০:১৯।

আমার নিকট ফিরিয়ে দাও (যেন তোমার ভাই-বোনেরা আমার মীরাস হিসেবে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পেতে পারে)।’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এতে কোনো আপত্তি করেননি। তিনি পিতার নির্দেশ পালন করেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘মুসলিম জাতির খলীফা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত কোনো দিনার বা দিরহাম গ্রহণ করিনি। এ সময়ে আমি ন্যূনতম ও কম উপাদেয় খাবার খেয়েছি এবং কমদামি অমসৃণ কাপড় পরিধান করেছি। বাইতুল মাল থেকে আমার নিকট একজন আবিসিনিয়ান দাসী এবং একটি উট রয়েছে। উটটি দিয়ে আমি বাগানে পানি দিতাম। আর খেজুর বৃক্ষের এই কাণ্ডটি রয়েছে। আমার ইন্তেকালের পর এগুলো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট জমা দেবে যেন আমি এসব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূত যখন এগুলো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌছে দিল, তা দেখে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত বেশি ক্রন্দন করলেন যে, জমিনের দিকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর বললেন, ‘আল্লাহ আবু বকরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ আবু বকরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ আবু বকরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন।’^{৩০২}

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, ‘উমর আমাকে বাইতুল মাল থেকে ৬,০০০ দিরহাম নিতে বাধ্য করেছে (আমার সংসার ব্যয়ভার বহনের জন্য)। আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক বাগান বিক্রি করে তা পরিশোধ করবে।’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর তার এ অসীয়াত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছানো হলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহ আবু বকরের উপর

^{৩০২} আত-তাবাকাত, ইবনে সাঈদ (৩/১৪৬, ১৪৭) এবং এর সকল বর্ণনা সহীহ।

রহমত বর্ষণ করুন। তার মৃত্যুর পর তার কোনো কাজের প্রতি যেন কোনো প্রতিবাদ করতে না পারে, এটাই ছিল তার কামনা।^{৩০৩}

উপরের ঘটনাবলি থেকে পাঠকবৃন্দ সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, মুসলিম জাতির সম্পদের ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কত সতর্ক ছিলেন। দুই বছরেরও অধিক কাল তিনি শুধু নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য সুগতি করেননি, বরং সম্পদ অর্জনের সব পথই বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি সর্বান্তঃকরণে মুসলিম জাতির খেদমতে নিজেকে নিয়োগ করতে পারেন। যেহেতু তার নিজের আয়ের কোনো সুযোগ ছিল না এবং মুসলিম জাতির খেদমতে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছিলেন, এজন্য তাকে বাইতুল মাল থেকে পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় যা কোনোভাবেই তার নূণ্যতম প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে বেশি ছিল না। নূণ্যতম প্রয়োজন বলতে এখানে স্বাভাবিক বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু খাবার-পানীয় এবং নিজের সতর ঢাকার জন্য যতটুকু কাপড়ের প্রয়োজন তা-ই বোঝানো হচ্ছে। তিনি তার খেদমতের তুলনায় খুব সমান্যই গ্রহণ করেছিলেন। তারপরেও তার কাছে এটাকে বেশি মনে হয়েছে। এজন্য মৃত্যুর পর তিনি তার কাছে থাকা একজন আবিসিনিয়ান গোলাম এবং একটি উটকেও বাইতুল মালে জমা করে দিতে আদেশ করেছেন যাতে তিনি তার রবের সঙ্গে রিক্ত হস্তে হাজির হতে পারেন এবং তাকে মুসলিম জাতির কোনো মালের জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে না হয়। যেখানে সবাই অনেক সম্পদ ও ধন-দৌলত নিয়ে কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, সেখানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল তার নেক আমল, তাকওয়া-পরহেজগারি এবং ঈমান নিয়ে হাজির হবেন। অবশ্যই তার জীবন বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য বিরাট নসীহত। তিনি কেবল তার কাছে অবশিষ্ট সম্পদই বাইতুল মালে ফেরত দিতে আদেশ দেননি, বরং তিনি খেলাফতকালে বাইতুল মাল থেকে যে পরিমাণ বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তা-ও হিসেব করে সমুদয় অর্থ বাইতুল মালে জমা করে দিতে অসীয়াত করে গিয়েছেন। সম্পূর্ণ বৃত্তির পরিমাণ টাকা না থাকায় তিনি তার বাগান বাইতুল মালে জমা দিতে বলেছেন যার মূল্য তিনি পুরো খেলাফতকালে

^{৩০৩} আল-মুনতায়িম, ইবনে আল-জাওযি (৪/১২৭) এবং আসহাবে রাসূল (১/১০৫)।

যে পরিমাণ অর্থ বাইতুল মাল থেকে নিয়েছিলেন তা থেকেও বেশি। তিনি এটা করতে বাধ্য ছিলেন না। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই স্বেচ্ছায় এমনটি করেছিলেন। কারণ খেলাফতের কাজের বিনিময়েও তিনি দুনিয়ায় কোনো পুরস্কার বা অর্থ আশা করেননি। তিনি এর পুরস্কার আল্লাহর কাছ থেকেই আশা করেছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অসুস্থতা পনের দিন স্থায়ী হয়। তার অসুস্থতার শেষ দিন ছিল সোমবার, ২২ জুমাদুল উখরা, ১৩ হিজরী। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেন, ‘কোন দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছিলেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘সোমবার।’ তখন ছিল সোমবারের বিকেল। একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। তখন মঙ্গলবার শুরু হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একই দিনে ইন্তেকালের আশা নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমিও এই কামনা করি যে, আজ সন্ধ্যার পূর্বে যেন আমারও মৃত্যু হয়।’

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফনে মোট কতটি কাপড় ছিল?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমরা তাকে তিনটি নতুন কাপড় দিয়ে কাফন পরিয়েছি। এগুলোকে বলা হয় সহুলিয়া। তার পাগড়ি এবং পাঞ্জাবি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’ নিজের পরিধেয় কাপড়ের দিকে ইশারা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার এই কাপড়টি ধুয়ে দেবে। এতে জাফরানের দাগ রয়েছে। এর সাথে আরও দু’টা কাপড় দিয়ে আমাকে দাফন দেবে।’^{৩০৪} যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছাকাছি ছিলেন, তারা এ কথায় খুব অবাক হলেন। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘আল্লাহ তা’আলা আমাদের এখন ধনী করেছেন। সুতরাং কেন আমরা আপনাকে নতুন কাপড়ের কাফন পরাব না?’ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দৃঢ়তার সাথে বললেন, ‘এটাই চলবে। মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি। আর কাফনের কাপড়ও একসময় নষ্ট হয়ে যাবে।’^{৩০৫}

^{৩০৪} আসহাবে রাসূল (১/১০৬)।

^{৩০৫} আত-তারিখ আল-ইসলামি, মাহমুদ সাকির; খুলাফায়ে রাশেদীন (পৃ. ১০৪)।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ দুটি অসীহতের একটি ছিল যে, তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে গোসল कराবে এবং তাকে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন করা হয়। দুনিয়ার বুকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ কথা ছিল,

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۱۰۱

মুসলমান অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দান করুন এবং নেককার লোকদের সঙ্গে আমার হাশর করুন। ৩০৬

যেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হয়, সেদিন পুরো মদীনা শহর থমকে যায়; বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মদীনাবাসীদের উপর আর এমন কষ্টকর দিন আর আসেনি, এমন কান্নাও কেউ করেনি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের খবর পেয়ে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত তার বাড়ির দিকে আসেন। আর পুরো পথেই ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিয়ুন বলতে থাকেন।

তারপর তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে এক দীর্ঘ শোকবার্তায় বলেন :

হে আবু বকর! আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে নিকটতম সঙ্গী এবং বন্ধু ছিলেন। আপনি ছিলেন তার চোখের শক্তি; আপনিই তার সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তার কোনো গোপন কথা থাকলে আপনাকে বলতেন এবং তার যদি কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হতো, তাহলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আপনি প্রথম ঈমান আনয়নকারীদের একজন এবং আপনি দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্য যে কারও থেকে আপনার ঈমান ছিল শক্তিশালী। একইভাবে আপনি সবার থেকে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন। আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে আপনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধনী। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এবং ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি দরদী ছিলেন। সবার চেয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম সঙ্গী ছিলেন, আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন; আপনার অতীত ছিল গৌরবময়, আপনার মর্যাদা অনেক উপরে এবং আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব প্রিয় ছিলেন।

আপনি ইসলামের অনুসরণ ও আদর্শ বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের যে কারও কাছ থেকে আপনার সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সম্মান করতেন এবং যে কারও থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যথাযথ পুরস্কার দান করুন। যখন সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে, আপনি তখন তার উপর ঈমান এনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আপনি ছিলেন তার চোখ, যা দিয়ে তিনি দেখতেন, আপনি ছিলেন তার কান যা দিয়ে তিনি শুনতেন। আল্লাহ আপনার বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে, তারাই তো খোদাভীর।^{৩০৭}

যখন লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার ব্যাপারে চরম অনীহা প্রকাশ করেছে, আপনি তখন তাকে সাহায্য দিয়েছেন। আর যখন লোকেরা অলস বসেছিল, আপনি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে একই কষ্টকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। দুর্যোগ ও সংঘাতে আপনি ছিলেন তার আদর্শ ও মহান সঙ্গী। আপনি ছিলেন হিজরতের সময় গুহায় 'দু-জনের একজন' এবং এমন একজন যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা নাযিল হয়েছে। আপনি মদীনায় হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন এবং দ্বীনের

ব্যাপারে ও মুসলিম জাতির জন্য আপনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আপনি রাসূলের যথাযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আপনি এমন সব ভালো কাজ করেছেন যা আপনার আগে রাসূলের অন্য কোনো খলীফা করেনি। রাসূলের অন্যান্য সাহাবীরা দীনের দুর্দশার সময় যখন আশা ছেড়ে দিয়েছিল এবং নরম আচরণ করেছিল, তখন আপনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আর যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আপনি সত্যিকার অর্থেই তেমনি ছিলেন যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘শারীরিক দিয়ে দুর্বল হলেও আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে দৃঢ়। আচরণে বিনয়ী, কিন্তু আল্লাহর নিকট উঁচু মর্যাদাশীল; মানুষের দৃষ্টিতে অনুপ্রেরণার উৎস, সম্মানিত এবং হৃদয়ের মণি। আপনাকে অপছন্দ করার বিন্দুমাত্র কোনো কারণ নেই। আপনার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই অথবা আপনার সঙ্গে রাগ করারও কোনো যৌক্তিকতা নেই...আপনার দুর্বলতা ও সহনশীলতা সর্বদাই দৃঢ় ও সম্মানের কারণ ছিল, যা নিশ্চিতভাবেই সকলের প্রাণ্যকে সঠিকভাবে পরিশোধ করেছে। এক্ষেত্রে আপনি আগন্তুক এবং আত্মীয়ের সঙ্গে একই আচরণ করেছেন। যারা দীনদার এবং আল্লাহকে বেশি ভয় পায়, আপনি তাদের সম্মান করেছেন। আপনার সার্বিক চরিত্রে ছিল সত্যবাদিতা এবং ধৈর্য।

আপনার খুতবা সব সময় গভীর প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনায় পরিপূর্ণ ছিল। আপনি সর্বদা বিনয় ও দৃঢ়তার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। আপনি প্রজ্ঞাময় সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং একবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তা বাস্তবায়নে আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন...অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তারই দিকে আমরা ফিরে যাব। আমরা এতেই সম্বষ্ট এবং আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের নিকট নিজেদের ন্যস্ত করছি। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতি আপনার মৃত্যুর মতো এ রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি। আপনি ইসলামের রক্ষক, আদর্শ এবং সম্মানের উৎস ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তার রাসূলের সঙ্গে আপনার মিলনকে বরকতময় করুক এবং আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করুন। আপনার পরে আমাদের যেন আল্লাহ তা’আলা দীনের পথে অবিচল রাখেন।

লোকজন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চারিদিকে এসে জমা হতে লাগল এবং শেষ হওয়া পর্যন্ত তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর তারা উচ্চস্বরে কাদতে লাগল এবং সবাই একযোগে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যে একমত পোষণ করে বলে উঠল, ‘আপনি সত্য বলেছেন।’^{৩০৮}

উলামায়ে কেরাম সবাই এ বিষয়ে একমত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তেষটি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একই হায়াত পেয়েছিলেন। অসীয়াত অনুযায়ী^{৩০৯} আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা গোসল করান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধ বরাবর রাখা হয়^{৩১০} এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের একদম পাশ ঘেঁষেই তাকে দাফন করা হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবরে একে একে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নামেন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{৩১১} আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।

ইসলামের জন্য জীবনভর দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে এমনই শান্তিময় ছিল আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু। ইসলামের শুরুতে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্তি এবং সাহায্যের উৎস; তিনি ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে সব সময় সর্বান্তঃকরণে তৈরি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি যেখানে ইসলামকে রেখে গিয়েছিলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিক সেখান থেকেই দীনকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি মুসলিম জাতির ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেন, প্রথমে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের পরাজিত করেন এবং তারপর ইসলামের প্রচার-প্রসারে

^{৩০৮} আত-তাবসিরাহ, ইবনে আল-জাওযি (১/৪৭৭-৪৭৯); আসহাবে রাসূল (১/১০৮)।

^{৩০৯} আত-তাবাকাত, ইবনে সা‘দ (৩/২০৩-২০৪) এবং হাদীসের সনদের পরম্পরা সহীহ।

^{৩১০} তারিখুল ইসলাম, যাহাবি; আহদ আল-খুলাফা আর-রাশিদুন (পৃ. ১২০)।

^{৩১১} আসহাবে রাসূলুল্লাহ (১/১০৬)।

বিভিন্ন দেশ ও শহর বিজয় করেন। আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং তাকে অশেষ নেয়ামতে পুরস্কৃত করেন।

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ১০:১০

তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য' বলে।^{৩১২}

হে আল্লাহ! আপনি কতই না পরিপূর্ণ এবং সকল প্রশংসা কেবল আপনার জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট নিজের গোনাহের জন্য তাওবা করছি।



সারসংক্ষেপ

১। মুসলমানদের জন্য খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী সব যুগেই ইসলামী জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে আছে। সন্দেহাতীতভাবে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এর পরেই রয়েছে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী—আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

২। বিশেষ করে আধুনিক জটিল ও সংকটময় পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সাহাবীদের মহান চরিত্র ও গুণাবলি এবং তাদের জীবনের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাপদ্ধতির সরাসরি প্রভাব জানা অতীব জরুরি।

৩। অমুসলিম পণ্ডিত, সুনির্দিষ্টভাবে পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতাবশত সাধারণভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং বিশেষ করে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর ঘটনাবলির বিকৃতিসাধন করেছে এবং অপব্যাখ্যা করেছে। এজন্য মুসলমান স্কলারদের জন্য এটা জরুরি হয়ে পড়েছে যে, সাধারণ লোকজনের কাছে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের জীবনী সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং এসব ঘটনাবলিও সত্যতার সঙ্গে বর্ণনা করা যা তাদের জীবনকে গড়তে সহায়তা করেছিল।

৪। নিঃসন্দেহে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার প্রতিটি কথা ও আচরণই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। তারপরেই রয়েছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান। কারণ, জীবনভর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বন্ধুত্ব তার মধ্যে এমন সব মহান গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়েছিল যা লাভ করার জন্য সব মুসলমানেরই চেষ্টা করা উচিত।

৫। ইসলামপূর্ব যুগেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতোই তিনি কখনও মদপান বা কোনো মূর্তিকে সেজদা করেননি।

৬। ইসলামের পূর্ব যুগে উচ্চবিত্ত সমাজের সদস্য হিসেবে তার মহান গুণাবলির জন্য সকলেই তাকে ভালোবাসত এবং তার জ্ঞান ও মেধার জন্য তাকে বিশেষ সম্মান করত। তিনি তার যুগের সবচেয়ে বিজ্ঞ বংশবিশারদ। যে কোনো বিশেষজ্ঞের চেয়ে সাধারণভাবে আরবদের বংশ পরম্পরা এবং বিশেষ করে কুরাইশদের বংশ-পরিচয় ছিল তার নখদর্পণে। অন্যান্য বংশবিশারদদের মতো তিনি কখনও মোহের বশবর্তী হয়ে কোনো বংশের মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করতেন না।

৭। কুরাইশরা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সার্বজনীন ভালোবাসা পোষণ করত। তাকে ভালোবাসার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সহজ ও সরল জীবন-যাপনকারী, চমৎকার বন্ধু এবং অত্যন্ত দানশীল একজন মানুষ। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি তার নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্মকাণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং নিজ বাড়িতে বিশাল মেহমানদারীর জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এ মেহমানদারীতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষজন অংশগ্রহণ করত—ধনী, মধ্যম শ্রেণি এবং বিশেষ করে গরিব।

৮। ইসলামগ্রহণ করেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যের নিকট ইসলামের প্রচার-প্রসারকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এজন্য তার দাওয়াতী কার্যক্রমের সাফল্য সুবিদিত। তার দাওয়াতে কুরাইশ বংশের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম কবুল করেন। ইসলামের জন্য তার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যায়নি : তাকে অপমান করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এবং এমনকি আঘাত করা হয়েছে। তিনি জীবনে একবার মৃত্যুর কাছাকাছি ভয়াবহ নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন।

৯। কঠোর পরিশ্রম ও দুর্ভোগের মধ্যেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দীনের ব্যাপারে সামান্যতম নমনীয়তা প্রদর্শন করেননি। এর কারণ তিনি

ছিলেন সাহসী এবং স্থির, অপমান ও শাস্তিকে ভয় পেতেন না, বরং সর্বান্তঃকরণে অর্পিত দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি দিতেন—আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা, আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করা।

১০। স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে তিনি কাফের মালিকদের হাতে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত মুসলমান দাস-দাসীদের মুক্ত করতেন। তিনি মক্কায় একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তিনি শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিম দাস-দাসীদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন।

১১। ইসলাম কবুল করে তিনি তার বংশবিদ্যা সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যকে নষ্ট করে ফেলেননি; বরং তিনি এ জ্ঞানকে ভালো কাজে ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো গোত্রকে সাহায্য ও আশ্রয়ের জন্য দাওয়াত দিতে মনস্থ করতেন, তখন আবু বকর তার সঙ্গে যেতেন। ঐ গোত্রের বিভিন্ন ভালো ও মন্দ দিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তুলে ধরতেন, তাদের শক্তি ও দুর্বলতাও বর্ণনা করতেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত নিতেন যে, তিনি কোনো গোত্রের কোনো প্রতিনিধির কাছে দাওয়াত দিতে যাবেন এবং কার কাছে সাহায্য ও নিরাপত্তা চাইবেন।

১২। যখন এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কেবল একজন সাহাবী রয়েছেন, তখন অনিবার্যভাবে সেটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই হতেন। খুব কমই এর ব্যতিক্রম হয়েছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত। এ সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই তার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন। ঐ সময় এবং অন্যান্য সময়েও যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একাকী অবস্থান করতেন, তখন তিনি রাসূলের সাহচর্যে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতেন। কেবল রাসূলের সঙ্গে থাকার কারণেই তিনি ঈমান, বিনয় ও যুহদ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং জ্ঞান ও দৃঢ়তায়

উন্নতি লাভ করতেন। একইভাবে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যেখানে অন্যরা পরাজিত হতো। এইরকমই একটি সিদ্ধান্ত ছিল উসামার বাহিনী প্রেরণ এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত।

১৩। এটা সত্যি যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সময়, আন্তরিকতা, পরামর্শ এবং সম্পদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু তাতে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একজন সাহসী এবং দক্ষ সৈনিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে উহুদের লড়াইয়ে তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন যেখানে অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করছিলেন। আবার তারুক অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুরো বাহিনীর পতাকা হস্তান্তর করেন।

১৪। যুদ্ধের ময়দানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মুসলিম যোদ্ধার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং মদীনার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করার সময় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান—তার আচার-আচরণে, মানবিক গুণাবলিতে, বক্তব্য ও নেক আমলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কার জীবনে এবং পরবর্তীতে তার খেলাফতকালে মুসলিম জাতির প্রতি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদান নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদানী জীবনেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদান অবিস্মরণীয়।

১৫। অনেক বেশি নেক আমল নয়, বরং সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ঈমানের জন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সকল সাহাবী থেকে মর্যাদাশীল ছিলেন। তারপরেও তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। এটা এজন্য যে, কেউ যদি হাদীস অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহান চরিত্র নিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত প্রশংসা করেছেন!

১৬। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে ছিলেন? এটা স্বাভাবিক যে, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকের নাম পাওয়া যাবে। যেমন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, উবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইত্যাদি। সত্য কথা বলতে কী, এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যদিও এটা সব মুসলমানদের জানা নাও থাকতে পারে, ইসলামের পণ্ডিতদের মধ্যে এটা বিতর্কের বিষয়ও নয়, কারণ তারা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবীর মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। এটা এজন্য সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি সবার চেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন—দিনে কিংবা রাতে, বাসায় কিংবা সফরে। প্রতিদিন এশার নামাযের পর এটা রীতিমতো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৈনন্দিন রুটিন হয়ে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসা; এ সময় তারা দু-জন মুসলিম জাতির বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

কিছু ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি মুসলিম জাতির প্রথম হাজার নেতৃত্ব আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন। এর আগে কখনও মুসলমানগণ হজ করেননি। এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। কারণ, হাজার মাসায়েলসমূহ খুবই জটিল এবং বিস্তারিত। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি আস্থা পরিস্ফুটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় কেবল একজনকেই তার জায়গায় মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অবশ্যই সেই ব্যক্তি ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামে যাকাতের বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বিষয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদান খুব বেশি পরিচিত নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যা এ বিষয়ে খবুই প্রয়োজনীয় একটি দলীল। ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীসের উপর নির্ভর করে যাকাতের মাসআলার জটিল সব সমাধান দিয়ে থাকেন। অধিকন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন কোনো কথা বা আমল পাওয়া যাবে না যা অহীর বিপরীত। এই একটি বিষয়ই প্রমাণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কত বেশি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন এবং ইসলামী আইন-কানুন বোঝার ক্ষেত্রে কত বেশি বিচক্ষণ ছিলেন।

১৭। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন লোকেরা মারাত্মক শোকে আক্রান্ত হয় এবং অনেকে ইসলামধর্ম ত্যাগ করতে থাকে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে সচেতন করে তোলেন এবং তখন তিনি তার বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন : ‘হে জনমণ্ডলী, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর।’ এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হন, যা একটু ব্যতিক্রম হলে মুসলিম জাতিকে বড় ধরনের সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারত। ইতিমধ্যে আনসার সাহাবীরা তাদের মধ্য থেকে মুসলিম জাতির খলীফা নির্বাচন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। এ সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রজ্ঞা ও মেধা প্রয়োগ করে সুন্দর ও উৎসাহমূলক ভাষায় তাদের স্বীকার করাতে সক্ষম হন যে, মূলত তারা ভুল পথে পা বাড়ানো ছিলেন—সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতির খলীফা কুরাইশ বংশ থেকেই নির্ধারিত হবে।

১৮। প্রথমে সা’দ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য ও যুক্তি শুনে তিনি দ্রুত তার এ মনোনয়ন থেকে সরে আসেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একমত পোষণ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা হিসেবে মেনে নেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই নির্বাচন ছিল বিতর্কহীন। আনসারদের প্রত্যেকেই এই নির্বাচনে সন্তুষ্ট ছিলেন; বস্তুত সা’দ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাতিজা বশির

ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এর বিপরীতে কিছু ঐতিহাসিকগণ লিখে থাকেন যে, কোনো সহীহ বর্ণনায় ঐদিন মুসলমানদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত বা মতানৈক্যের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এসব লেখকদের মতামত সম্পূর্ণ ভুল এবং প্রত্যেক সচেতন মুসলমানেরই তা এড়িয়ে চলা উচিত।

১৯। কুরআন মাজীদে কিছু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উক্তি থেকে—কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট—প্রমাণিত হয় যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই মুসলিম জাতির প্রথম খলীফা হওয়ার জন্য অধিক যোগ্য ছিলেন; অধিকন্তু আগের এবং পরের সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবী থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল সাহাবীরাও বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাকে নিজের স্থলে মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য নিয়োগ করেন; এ থেকে তিনি ইশারা করেছিলেন যে, তার পরে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব তার উপরই বর্তাবে।

২০। মুসলিম জাতির প্রথম জেনারেশনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমরা এখন জানি যে, ইসলামে সরকার গঠনে খেলাফতব্যবস্থাই কাম্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর পরই এ বিষয়টি উপলব্ধি করে আনসার সাহাবীরা দ্রুত কোনো সময় নষ্ট না করে এক জরুরি সভার আহবান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলে মুসলিম জাতির জন্য পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে আলোচনা শুরু করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, খলীফা ছাড়া তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্য সৃষ্টি হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের অব্যহতি পরবর্তী ঘটনা বিশ্লেষণ করে উলামায়ে কেরাম খলীফা নির্বাচনে দু-টি

পন্থার ব্যাপারে একমত গোষণ করেন : ১) পারস্পরিক আলোচনা, ২) বাইআত গ্রহণ। তারপর খলীফার জন্য দায়িত্ব হচ্ছে তার রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা গঠন করা এবং মুসলিম জাতির বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করা।

২১। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্তপূরণ করা জরুরি ছিল। এ শর্তসমূহে উল্লেখিত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, এসব যোগ্যতাই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

২২। সাধারণ মুসলমানগণ যখন তার কাছে বাইআত গ্রহণ করল, তখন তিনি সকলের উদ্দেশে একটি ভাষণ প্রদান করেন যা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। মাত্র কয়েকটি কথায় তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বর্ণনা করেন; তারপর তিনি শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে সুসম্পর্কের বুনিয়াদি বিষয় তুলে ধরেন—শাসিতরা অবশ্যই শাসকের ততক্ষণ অনুসরণ করবে যতক্ষণ না শাসক আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার আদেশ দিবেন। পরিশেষে তিনি অবিশ্বাস্য শব্দাবলি দিয়ে মুসলিম জাতির জন্য ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ এবং সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্ক বর্ণনা করেন। একইভাবে তিনি সমাজে অনৈতিক কাজ-কর্মের বিস্তৃতির কারণে নতুন নতুন বিপদ ও ধ্বংসের অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করেন।

২৩। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রদত্ত ভাষণে তিনি কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এ বিষয়ে তার নীতিসমূহ তুলে ধরেন। এ নীতিসমূহ বাস্তবায়নে তিনি নেককার ও সামর্থ্যবান লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। এ কারণে তিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মুসলিম জাতির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি, রাষ্ট্রের বাইতুল মালের ইনচার্জ নিযুক্ত করেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিচারক নিযুক্ত করেন এবং তিনি নিজেও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং সরকারি সব চিঠি-পত্র লেখা ও পড়ার জন্য য়ায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দান করেন। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সাহাবীরা

উপস্থিত থাকলে, যেমন আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তাদের ও সরকারি চিঠি লেখার দায়িত্ব দিতেন।

২৪। খেলাফতের পুরো সময় জুড়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সাহাবীরা তাকে সম্মান এবং সমীহ করেছেন। তারাই তাকে ‘আল্লাহর রাসূলের খলীফা’ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তারাই তাকে সর্বক্ষণ মুসলিম জাতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। এ কারণে তাকে তার ব্যক্তিগত আয়ের পথ বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেছেন।

২৫। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু মুসলিম জাতিকে পরিচালিতই করেননি, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে তাদের দীন শিখিয়েছেন, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছেন।

২৬। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেরই বর্ধিত অংশ বলা যায়। কারণ, এ সময় ইসলামের যাবতীয় বিষয়াদি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণে ঠিক একইভাবে সমাজে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হতো। আর এই স্বর্ণালি যুগের সূচনা হয়েছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের মাধ্যমে।

২৭। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কারণে মদীনায়ে বসে সকল অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতিকে অনুসরণ করেই তিনি বিভিন্ন এলাকার জন্য একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এসব গভর্নরের দায়িত্ব ছিল ঐ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা, মসজিদে নামাযের ইমামতি করা, বিরোধ মীমাংসা করা, যাকাত আদায় করা এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে সর্বাত্মকভাবে বাস্তবায়ন করা। এসব দায়িত্বের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব সতর্কতার সঙ্গে তার গভর্নরদের নিয়োগ করেছেন। তিনি এটা নিশ্চিত করেছেন যে, গভর্নররা

যেন অবশ্যই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়। বস্তুত তার গভর্নররা যেমন সৎ ও নেককার ছিলেন, তেমনি নেতা হিসেবেও যোগ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তকে যেহেতু তিনি নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়োগকৃত গভর্নরদের তিনি পুনঃ নিয়োগ দান করেন। উল্লেখ্য, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময়ও ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ রকম একজন গভর্নরকেও পদচ্যুত করেননি। যদি কখনও কাউকে গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তাও তাকে অন্য এলাকার দায়িত্বে বদলি বা নিয়োগ দেয়ার জন্যই তা করেছেন যেখানে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন গভর্নরের প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গভর্নর হিসেবে বদলি করেছিলেন।

২৮। অনেক বর্ণনায় এসেছে যে, আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বাইআত গ্রহণে দেরি করেছিলেন। এসব বর্ণনা সন্দেহ এবং জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে কিছু লোক অজ্ঞতা এবং দূরভিসন্ধি হাসিলের স্বার্থে ছড়িয়েছে। তাদের দাবি হচ্ছে, খলীফা হওয়ার জন্য তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি যোগ্য ছিল। এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। কারণ, এসব বর্ণনার বেশিরভাগই দুর্বল এবং মিথ্যা। কারণ সহীহ বর্ণনায় তাদের এ দেরীর পেছনে যৌক্তিক কারণ তুলে ধরা হয়েছে। সহীহ বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আলী, যুবায়ের এবং তাদের সাথে যারা ছিলেন, তারা বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত থেকে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে ছিলেন। বেশ কয়েকজন মুহাজিরীন সাহাবী, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল করানো এবং কাফনের কাপড় পরানো। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরদিন, মঙ্গলবার, যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে

বাইআত হন।’ সুতরাং তারা একদিন দেরি করে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন এবং এর যৌক্তিক কারণও ছিল। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনে ব্যস্ত ছিলেন।

২৯। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আমাদের (নাবীদের) কোনো ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।’ আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা যেভাবে করে গিয়েছেন, আমিও তা সেভাবেই করতে চাই। আল্লাহ না করুন, আমি যদি তার ব্যতিক্রম কিছু করি, তাহলে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাব।’ খেলাফতের পুরো সময় জুড়েই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্যদের যা প্রাপ্য তা নিশ্চিত করেছেন— গনীমতের মালের অংশ, ফাদাকের সম্পদ এবং খাইবারের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদ। তবে তিনি দৃঢ়ভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা শুনেছেন, তার ভিত্তিতে রাসূলের বংশধরদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস বণ্টন করে দেননি।

৩০। খলীফার দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর প্রদত্ত ভাষণে তিনি মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে নিজের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন যে, তিনি আল্লাহর খলীফা নন, বরং আল্লাহর রাসূলের খলীফা। তিনি নবী বা রাসূল নন। বরং সাধারণ একজন মানুষ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শূন্য স্থানকে তিনি কখনও পূরণ করতে পারবেন না। এভাবে তিনি নিজেকে একজন অনুসরণকারী হিসেবে ব্যক্ত করেন, একজন উদ্ভাবক বা নতুন আইন প্রণয়নকারী হিসেবে আবির্ভূত হননি।

৩১। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উসামার বাহিনী প্রেরণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। তার মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষা নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক। জীবনে কখনও কষ্টকর সময় অতিবাহিত হয়, কখনও সুখের। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সব সময় মানসিক দিক দিয়ে অবিচল ও দৃঢ় থাকা। এজন্য কষ্টে মুসলমানদের ভয় পাওয়া উচিত না অথবা আগে থেকেই মানসিক বৈকল্যে ভোগা উচিত না, যাতে সে দীন থেকে দূরে সরে যায়। মুসলিম জাতি রাসূলের ইন্তেকালের পর ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় : অনেক মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা মুসলিম জাতির নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ হুমকি সত্ত্বেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানে দুর্বল হয়ে পড়েননি, বরং তিনি রাসূলের শেষ নির্দেশ অনুযায়ী উসামার বাহিনীকে মদীনার বাইরে প্রেরণ করেন যেখানে মদীনার নিরাপত্তার জন্য মুরতাদদের বিরুদ্ধে তার অনেক বেশি সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন ছিল।

খ। কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপস্থিতি কিংবা অংশগ্রহণের উপর ইসলামের প্রচার-প্রসার থেমে থাকে না। কেউই এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তাকে ছাড়া মুসলমানরা অন্যের কাছে দীন প্রচার করা থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন; কিন্তু তার মিশন চালু রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ মুসলমানগণ দুনিয়ার বুকে থাকবে।

গ। যখন মুসলমানরা কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবে, তখন তাদের উচিত আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের দিকে মনোনিবেশ করা। অনেক সাহাবী উসামার বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন; কিন্তু যখনই তিনি তাদের সামনে এর যৌক্তিক কারণ তুলে ধরেছেন, তখন তারা তার সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেছেন।

৩২। অনেক মানুষ তখন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তবে সবাই একই কারণে মুরতাদ হয়নি অথবা সবাই একই পরিমাণ অবিশ্বাস ও সন্দেহে আবর্তিত হয়নি।

ক। কিছু মানুষ পুরোপুরিভাবে ইসলাম ত্যাগ করেছিল—ঈমান এবং আমল উভয় দিক থেকেই; এ ধরনের লোকেরা তাদের পূর্বধর্মে ফিরে গিয়েছিল, যে ধর্মের মূল বিষয় ছিল মূর্তিপূজা।

খ। কিছু লোক নিজেদের নবী হিসেবে দাবি করে মুরতাদ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো তারাও মানুষের

কাছে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে বলে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বেড়াতে। গোত্রপ্রীতি ও আনুগত্যের কারণে অথবা পরিস্থিতির ফায়দা নিতে অনেকেই এসব লোকদের উপর ঈমান এনে কুফরী করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইয়ামামায় মুসাইলামা এবং তার অনুসারীরা।

গ। কিছু মানুষ নামায ছেড়ে দিয়েছিল। তবু তারা নিজেদের মুসলমান দাবি করত।

ঘ। আবার অনেকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী ছিল এবং নামাযও পড়ত; কিন্তু তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে যায়।

ঙ। অনেকে অস্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ঘৃণা পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং মূর্তিপূজায় ফিরে যায়।

চ। আরেক দল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। জাগতিক দিক বিবেচনা করে তারা কাউকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে। তারা মুরতাদ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিজয়ীদের সঙ্গে হাত মেলানোর অপেক্ষায় থাকে।

৩৩। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে সাহসী এবং আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেন। এটা এমন এক অবস্থান ছিল যা ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি তাদের দু-টির যে কোনো একটি বেছে নিতে বলেছিলেন: তাওবা কর এবং ইসলামে ফিরে এসো অথবা যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অমুসলিমদের সঙ্গে চুক্তি করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। আর এখানেই ছিল পার্থক্য : পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইসলামিক আইনে অমুসলিম এবং মুরতাদ প্রসঙ্গে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে অমুসলিম মানে যারা এখনও ইসলামধর্ম গ্রহণই করেনি। আর মুরতাদ মানে যারা একবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তা ত্যাগ করেছে এবং বেঈমান হয়ে গিয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ পার্থক্য ভালো করেই জানতেন এবং এ কথা বিশ্বাস করতেন, যদি মুরতাদদের সঙ্গে কোনো ধরনের

আপস করা হয়, তাহলে ইসলামধর্মের সত্য ও শিক্ষাকে কলুষিত করা হবে। অমুসলিমরা ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং তারা ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে ওঠে না; অপর দিকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তারা ইসলামের মূল শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের মুসলমান বলত, কিন্তু একইসাথে ইসলামের কিছু মূল বিশ্বাস্য বিষয় অস্বীকার করত। মুসলমানদের একটি বিশ্বাস হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার পর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু কিছু মুরতাদ—মুসাইলামা ও তার অনুসারীরা—এ কথা বিশ্বাস করত না। মুসলমানমাত্রই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভকে মেনে চলে। এর যে কোনো একটিকে অস্বীকার করলে, ঈমান থাকে না। এ রকমভাবে যাকাতকে অস্বীকার করে একশ্রেণির লোক মুরতাদ হয়ে যায়।

এজন্য মুরতাদদের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের সত্য ও শাশ্বত শিক্ষাকে অবিকৃত ও কলুষমুক্ত রেখেছেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত তাকে সম্মান করা, প্রশংসা করা এবং তার জন্য দুআ করা।

৩৪। মুরতাদদের প্রোপাগান্ডা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে যাতে বাহ্যিকভাবে মনে হতে থাকে যে, আরব উপত্যকার প্রায় সব মুসলমানই ইসলামধর্ম ত্যাগ করে ফেলেছে। মুরতাদদের প্রচারণায় সব এলাকায় এর প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে সব জনগণ মুরতাদদের কাতারে সামিল হননি। আরব উপত্যকায় বিভিন্ন গোত্র অধিপতি ও তার অনুসারীরা ইসলামত্যাগ করেছিল। কিন্তু একই সাথে অনেক গোত্রই ইসলামের উপর অটল ছিল।

৩৫। ইয়েমেনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দু-ধরনের মহিলার চিত্র ফুটে ওঠে। একশ্রেণির মহিলারা সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে, আরেক শ্রেণি সত্যিকার অর্থে শয়তানের ছায়া হিসেবে কাজ করে। প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন শাহর ইবনে বাদান রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আজাদ-এ-ফারিসিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি ফাইরোজ ফারিসিয়্যাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী

ছিলেন। ইসলামের প্রতি তার ঐর্ষ্য, সাহস এবং আনুগত্য তখনকার যুগে ইসলামের একজন ভয়াবহ শত্রুকে হত্যা করতে সহায়তা করে। আর দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিল ইয়েমেনের এক মহিলা যে কিনা সতীকার অর্থে ইসলাম গ্রহণই করেনি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে শোক প্রকাশের পরিবর্তে প্রকাশ্যে তা উৎযাপন করেছে, আনন্দ-উল্লাস করেছে এবং জঘন্য সব আচরণ করেছে যাতে অন্যেরা ইসলাম ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ হয়।

৩৬। ইয়েমেনে ভণ্ড নবী ও তার অনুসারীরা মাথাচাড় দিয়ে উঠলেও এটা সকল আরব জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত ইয়েমেনের অনেকেই আসন্ন বিপদ টের পেয়েও দ্বীনের উপর অটল ছিলেন। তাদের কাছে মুরতাদরা যে বিপদের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা থেকে তাদের নিকট জাহান্নামের ভয়ই প্রবল ছিল। এ রকম একজন ব্যক্তি ছিলেন মিরান ইবনে যী উমাইর আল-হিমদানী। তিনি একজন রাজা ছিলেন; এ রকম আরেকজন আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক আল-আরহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাসূলের সাহাবী ছিলেন; এবং একই মনোবলের অধিকারী আরও দু-জন, শুরাহবিল ইবনে আস-সামিত এবং তার ছেলে, যারা উভয়েই কিন্দাহর বনু মুআবিয়াহ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন।

৩৭। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে ইয়েমেন অধিবাসীরা ইসলামে ফিরে আসে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা সম্পূর্ণভাবে মদীনায়ে কেন্দ্রীয় ইসলামী সরকারের অধীন হয়। তারপর ইয়েমেনকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করা হয়—সানাআ, জুনদ এবং হাযারা মাউত। এসব এলাকার সীমানা সেখানে বসবাসকারী গোত্রের বিচারে নির্ধারিত হয়নি; বরং এখানকার জনগণকে পরিচালিত করা কিংবা তাদের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব গোত্রের কোনো ভূমিকা ছিল না। গোত্রের একটিই উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। সেটা হলো আর্মির প্রতিটি ইউনিট একই গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠন করা হত। আর সেটাও প্রাথমিকভাবে তাদের মনোবল ও আত্মীকরণে সহায়তার জন্য করা হতো। সংক্ষেপে ইয়েমেন অধিবাসীদের পরস্পরের পরিচয়ের ক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতির কোনো ভূমিকা বাকি থাকেনি, বরং এর পরিবর্তে ঈমানে দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং নেক আমলই ভিত্তি হয়ে ওঠে।

৩৮। মুরতাদদের বিরুদ্ধে বুজাকাহর যুদ্ধ ছিল একটি বিশাল টার্নিং পয়েন্ট। যুদ্ধ শেষে যখন তুলাইহা আল-আসাদী পরাজিত হলো, তখন অনেক গোত্রই মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তির শর্তসমূহ পুনর্বিবেচনা করে এবং পরিশেষে তারা ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ শেষে বনু আমির গোত্রের প্রতিনিধিরা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে বলল, ‘আমি সেখানেই প্রত্যাবর্তন করছি যেখান থেকে একদিন বেরিয়ে গিয়েছিলাম (ইসলামধর্ম থেকে)’। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনুশোচনাকে মেনে নেন এবং খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে তাদের বাইআত গ্রহণ করেন।

৩৯। কিছু লেখক সূচত্বরভাবে যা লিখেছে, তার বিপরীত সত্য হচ্ছে, মালিক ইবনে নুবাইরাহ ঔদ্ধত্য এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশের অনাগ্রহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। যদিও সে বাহ্যিকভাবে মুসলমান দাবি করত, কিন্তু সে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তার লোকজন যখন যাকাতের সম্পদ জমা করেছিল, সে এ সম্পদ মদীনা় পাঠাতে অস্বীকার করেছিল। মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিকার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাকে হত্যার আদেশ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরো ঘটনা তদন্ত করেন এবং প্রাপ্ত সকল সংবাদের ভিত্তিতে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, তা ঠিকই ছিল।

৪০। উত্তম নেতা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। তিনি জানতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আদর্শ নেতা; যিনি অনুগ্রহ ও দয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করেছিলেন। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যাপারে বলেছেন, ‘আমি রহমতের নবী এবং আমি হত্যারও নবী (ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারী কিংবা সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে (কতল করার আদেশ দিতে) আমি পিছপা হই না)’। অপরদিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে, তিনি পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্য রাখতে সক্ষম নন, তবে কঠোরতা থেকে

অনুগ্রহের দিকে ঝুঁকে থাকেন। ব্যক্তি হিসেবে এটাতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু নেতা হিসেবে তাকে কখনও শক্ত সিদ্ধান্তও নিতে হতো। এজন্য তিনি যেখানে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, সেখানে শক্ত মনোবলের যারা ছিলেন, তাদের নিয়োগ করতেন। এজন্যই তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রধান উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন এবং তার সামগ্রিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

৪১। বাহরাইনে মুরতাদদের উর্ধ্বগতি অবদমন করার ক্ষেত্রে আলা হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এক্ষেত্রে মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি তার লোকবলসহ আলা হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার লোকজনকে সামরিক ও কৌশলগত সাহায্য করেছেন। তিনি বাহরাইনের উত্তর দিক থেকে দজলা নদী পর্যন্ত সফর করেছেন। এ পথে তিনি মুরতাদদের শক্ত অবস্থানকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন এবং তাদের মিত্র পারস্য থেকে রসদ সরবরাহের লাইন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হন। মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ সাফল্যের খবর মদীনায যথাসময়ে পৌঁছলে খলীফার উপস্থিতিতেই কায়েস ইবনে আসিম মাসকারী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রশংসা করেন।

৪২। বনু হানীফার পরাজয়ে মুরতাদরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত না হলেও এ পরাজয়ে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা হয়তো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল, কিন্তু কিছুতেই আর বিজয়ের আশা করতে পারেনি।

৪৩। ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয় অনেক আনন্দ ও উৎসবের কারণ ছিল, কিন্তু একই সাথে এই যুদ্ধে অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবীর শাহাদাতবরণে সবার মধ্যে এক দুঃখ-ভারাক্রান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। বস্তুত অনেক হাফেজ এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এতে একটি ভয় প্রকট হয়ে দাঁড়ায় : যদি আরও কুরআনে হাফেজ এভাবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করতে থাকে, তাহলে কুরআনের অনেক অংশ হয়তো হারিয়ে যাবে। এজন্য প্রথমে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাফেজদের অন্তরে প্রোথিত অথবা

বিচ্ছিন্নভাবে হাড়, চামড়া, পাথর কিংবা গাছের পাতায় লিখিত কুরআন বই আকারে এক সাথে জমা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এটা একটি কঠিন কাজ ছিল। এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ দেন। তিনি হলেন য়ায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি একইসাথে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ, আবার কাতেবে অহীও ছিলেন।

৪৪। বিজয়, উন্নতি এবং স্থিরতা একজন মুসলমানের জন্মগত অধিকার নয়; এগুলো তাকে কতগুলো শর্তপূরণ করেই অর্জন করতে হয়; যেমন, আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য করা, জমিনে আল্লাহর নীতির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ইত্যাদি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব শর্তের কথাই বার বার মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি একটি জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—যেমন : মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত এবং উসামার সেনাবাহিনী প্রেরণ—যাতে ঐ শর্তসমূহ পূরণ করা সম্ভব হয়। মুসলমানগণ তার নেতৃত্বকে অনুসরণ করেছেন এবং তাদের জীবনে পুরোপুরিভাবে ইসলামের নীতিকে প্রয়োগ করেছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির ফায়সালা করেছেন, তাদের শক্তিশালী করেছেন এবং শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করেছেন।

৪৫। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের শুধু তার নিকট দু'আ এবং পুরোপুরি তার নিকট সমর্পিত হতেই বলেননি—যদিও এগুলো ঈমানের জন্য অপরিহার্য—বরং, তাদের সব উপায়-উপকরণ নিয়ে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন যেন লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়। এ সত্য উপলব্ধি করেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করেছেন, হেদায়েতের পথের উপর নির্ভর করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বস্ত থেকেছেন; এবং এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য তিনি সব পার্থিব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছেন। তিনি এমন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন যারা একই সঙ্গে সাহসী এবং যুদ্ধে পারদর্শী। তিনি তাদের ঐ সময়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সমরাজ্ঞ সরবরাহ করেছেন, তাদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য সেনাপতি নিয়োগ করেছেন এবং ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে

লোকজনকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করেছেন। অতঃপর তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন, যায়েদ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন জমা করার জন্য নিয়োগ দিয়েছেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনার বিচারক নিয়োগ করেছেন এবং আবু বারযাহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি ও খলীফার মধ্যে বার্তাবাহক নিযুক্ত করেছেন।

৪৬। আরব এলাকা জুড়ে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারসাম্যের জন্য মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। তবে এর আরেকটি দিকও ছিল। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ বহিঃবিশ্বের দেশসমূহ বিজয় করার ক্ষেত্রে মনোবল এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আল্লাহর সাহায্যে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয় অর্জন করে। এটা তাদের মনোবলকে যে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছতে দৃঢ় করে তোলে; এবং ঐ সময়ের দুই পরাশক্তি—রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য—তারা এত বেশি শক্তিশালী নয় যে, তাদের পরাভূত করা যাবে না। যতক্ষণ তারা ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে এবং যতক্ষণ তারা আল্লাহর বাণীকে সবকিছুর উপরে সমুচ্চ করার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, মুসলমানরা বিশ্বাস করত যে, আকাশ হচ্ছে তাদের সীমানা। এজন্যই তারা এত অল্প সময়ে এত বিস্তৃত ভূমি বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪৭। আল্লাহর দয়া ও করুণায় সাহাবীদের আত্মবিসর্জনের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই আরব উপত্যকার সব এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের করতলগত হয়। এ উপত্যকার সব আরব অধিবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নতির নেয়ামতে সিক্ত হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এখন সময় হয়েছে আরব উপত্যকার বাইরে বিদেশি ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টি দেয়ার; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে বহিঃবিশ্বে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার। এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও শামে সৈন্য প্রেরণ করা আরম্ভ করেন।

৪৮। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের নিকট যেসব আদেশ প্রেরণ করেছিলেন, এগুলো বিবেচনা করলেই তিনি যে প্রচণ্ড

দীক্ষিতসম্পন্ন সামরিক কমান্ডার ছিলেন তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। মদীনায়ে বসেই তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এবং ইয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের পথ বাতলে দিয়েছেন; কোন পথে তারা সফর করবে এবং কোন দিক দিয়ে তারা ইরাকে প্রবেশ করবে ইত্যাদি। তার দিকনির্দেশনা এত নিখুঁত ও সঠিক ছিল যে, মনে হয় মদীনা আধুনিক যুগের কোনো সামরিক কমান্ড সেন্টার এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ডিজিটাল ম্যাপ রাখা আছে যা দেখে তিনি ইরাকের প্রাকৃতিক অবস্থা, ভূখণ্ড এবং পথ-ঘাট সম্পর্কে জেনে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

৪৯। খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। এসব যুদ্ধের সাফল্য সম্পূর্ণ এলাকাকে বিজয় করার পথকে উন্মুক্ত করে। নিচে কয়েকটি যুদ্ধের নাম দেয়া হলো : আস-সালাসিল, মাজহার, উল্লায়সের যুদ্ধ, ওয়ালাজার যুদ্ধ, আশ্বার, আয়নুত-তামার, ওয়ালজাহর যুদ্ধ, আললীসের যুদ্ধ, হীরার যুদ্ধ, দওমাতুল জন্দল, ওয়াকাতুল হাসিদ, ওয়াকাতুল মাসিখ এবং ওয়াকাতুল ফারাদ।

৫০। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইয়েমেন থেকে আগত মুজাহিদদের তালিকা তৈরি করেছেন। তিনি তার পুরো সেনাবাহিনীকে চারটি ব্যাটালিয়ানে ভাগ করেছেন। প্রতিটি ব্যাটালিয়ানের জন্য পৃথক পৃথক লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এসব ব্যাটালিয়ানের সেনাপতিরা হলেন : ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

৫১। চারটি ব্যাটালিয়ান তাদের লক্ষ্যপূরণ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। কারণ, তারা শুধু শামের শত্রু সেনাদের মোকাবেলা করছিল না, তাদের রোমান বাদশা প্রেরিত সৈন্যদেরও মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। তাদের বিশাল সৈন্যসংখ্যার কারণে মুসলিম সেনাপতিরা খলীফার কাছে বিপদসংকুল

পরিস্থিতির কথা জানাতে বাধ্য হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাদের জন্য আরও সৈন্য প্রেরণ করে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চার ব্যাটালিয়ানকেই শত্রু এড়িয়ে ইয়ারমুকে জমা হতে আদেশ দেন। সেখানে পৌঁছে তারা মদীনা থেকে প্রেরিত অতিরিক্ত মুজাহিদদের জন্য অপেক্ষা করবে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারপর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে ইরাক থেকে শাম অভিমুখে দ্রুত রওনা হতে আদেশ দেন।

৫২। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি বড় বড় বিজয় অর্জন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্যযোগ্য হলো, আজনাদীন এবং ইয়ারমুক যুদ্ধ।

৫৩। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন :

ক। অন্য জাতিরা যেন মুসলিম জাতিকে ভয় পায়।

খ। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখা।

গ। বিজিত এলাকাসমূহে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং অধিকৃত এলাকার লোকজনের সঙ্গে ভদ্র ও ভালো আচরণ করা।

ঘ। বিজিত এলাকার লোকজনকে তাদের স্ব স্ব ধর্ম পছন্দ করে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান।

ঙ। দুনিয়ার বুকে সব মানুষের কানে অন্তত দ্বীনের কথা পৌঁছানো।

৫৪। যুদ্ধ কোনো বিনোদন নয় যা খুব হালকাভাবে নেয়া সম্ভব, অথবা এমন কোনো কিছু নয় যা সুনির্দিষ্ট নীতি এবং আদর্শ অনুসরণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা বিশৃঙ্খলভাবে করা সম্ভব। যুদ্ধে কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে যা অনুসরণ করা জরুরি এবং যারা সশরীরে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব অধিকার সুচিহ্নিত করে তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য তার

সেনাপতিদের চিঠিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রথমেই মুসলমান সৈন্যের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ অবশ্যই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল ও দৃঢ় থাকবে; অধিকন্তু, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যকে অন্য সব লক্ষ্য থেকে প্রাধান্য দেবে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদেরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সেনাপতিরা তাদের উপর কি অধিকার রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সেনাপতিদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তাদের অন্যতম দায়িত্ব; মূলত সেনাপতি যে আদেশ দেবে, তা দ্রুত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করার আশ্রয় চেষ্টা করা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, তারা যেন গনীমতের মাল সংগ্রহে তাড়াহুড়ো না করেন; বরং তাদের উচিত সেনাপতির বণ্টনের আদেশ দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

পরিশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের উপর সৈন্যদের হক রয়েছে। একজন নেতার প্রধান কাজ হচ্ছে তার সৈন্যদের রক্ষা করা। এটা নিশ্চিত করার জন্য একজন সেনাপতি অবশ্যই শত্রুর গোয়েন্দা তৎপরতার ব্যাপারে সজাগ থাকবে। সেনাপতিরা নিশ্চিত করবে, যে কোনো অভিযানে প্রেরিত সৈন্যদের জন্য যেন পর্যাপ্ত খাবার-পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিদের সৈন্যদের দেখাশোনার পাশাপাশি তাদের প্রতি ভদ্র ও অনুগ্রহশীল হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। একজন সফল নেতা হিসেবে সেনাপতি অবশ্যই তার সৈন্যদের মনোবলকে যুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত করবে, তাদের আল্লাহর পুরস্কারের কথা মনে করিয়ে দিবে, শহীদী মৃত্যুর ফযিলতের কথা বলবে এবং জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করার ভয়াবহ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেবে।

৫৫। এত অল্প সময়ে মুসলিম বাহিনীর এত বিশাল বিজয়—যে কোনো ইতিহাসের ছাত্রের জন্যই বিস্ময়কর! মাত্র বিশ বছর আগে আরবরা দুনিয়ার বুকে ছিল অপরিচিত জাতি, কিন্তু এখন তারা শুধু নিজেদের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে পারে তা না, বরং আল্লাহর সাহায্য ও মদদে পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অর্ধেক রোমান সাম্রাজ্য দখল

করে নিয়েছে। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো যে কারণে মুসলিম বাহিনী এত বড় বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল :

ক। মুসলমানদের ঈমান অনেক দৃঢ় ছিল; মূলত এটাই তাদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস ছিল। আর এর দাবিতেই তারা যুদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক মুজাহিদই জানতেন যে, তিনি যে কোনো দু-টির একটি পুরস্কার লাভ করবেন: বিজয় অথবা শাহাদাত। আর তাদের বেশিরভাগ সদস্যদেরই দ্বিতীয়টির আকাঙ্ক্ষা ছিল বেশি। এ মনোবলে অধিকারী মুসলিম সৈন্যের নিকট রোমান ও পারস্য সেনারা ছিল ভীতু—তারা শুধু তাদের নিরাপদ গৃহেই ফিরে যেতে চেয়েছিল।

খ। মুসলিম বাহিনী ছিল বিশাল ও দক্ষ সামরিক যান, যে যানে সাহসী যোদ্ধা এবং অভিজ্ঞ সেনাপতির কোনো অভাব ছিল না।

গ। মুসলমানগণ বিজয়কৃত এলাকায় লোকজনের প্রতি বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ, সদয় এবং অনুগ্রহশীল ছিলেন; ফলে তারা তাদের মন ও হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।

ঘ। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অমুসলিমদের কর দিতে হত। আর এ কর নির্ধারণে মুসলমানগণ খুব অনুগ্রহশীল ছিলেন। অধিকন্তু তারা সব সময় চুক্তি ও ওয়াদা রক্ষা করে চলতেন। মুসলিম সেনাবাহিনী এবং বিজিত এলাকার লোকজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হতো, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পেত। মূলত, এসব অধিবাসীরা আগের অবস্থা থেকে মুসলমানদের নেতৃত্বে উন্নত জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করেছিল।

৫৬। মৃত্যুশয্যায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বিজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের কাছে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কে সবচেয়ে বেশি যোগ্য - এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করেন। যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করা হলো এবং বেশিরভাগ সাহাবী এ নির্বাচনে সম্মতি প্রকাশ করলেন, তখন তিনি সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অফিসিয়াল চিঠি লিপিবদ্ধ করেন। এ চিঠিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার কথা লেখা হয় যা মদীনা এবং আরবের সব মুসলিম প্রদেশে পাঠ করে সাধারণ

জনগণকে শোনানো হয়। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয়ভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ দেন এবং অনেকটা জোর করেই তাকে এ পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। জাগতিক সব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পরও তাকে এ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজে সমাধা করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে ডুলে যাননি। বস্তুত তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এ বিষয়ে দুআ করেছিলেন। পরিশেষে কোনো ধরনের সন্দেহ যেন না থাকে, এজন্য তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি জনসমক্ষে পড়ে শোনানোর আদেশ দেন। তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবিত থাকাকালেই লোকজন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তারপর সর্বশেষ দায়িত্ব হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যক্তিগতভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখা করেন এবং মুসলিম জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৫৭। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিক একইভাবে নিয়োগ পাননি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচন মূলত ইসলামের শূরাহ নীতির (পরস্পর আলোচনা) ভিত্তিতে হয়েছিল। সমাজের সবচেয়ে ধার্মিক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল এবং তারা খলীফা পদে সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেই সম্মত হন। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় কোনো সাহাবীই অন্য কাউকে খলীফা পদে আসীন করার চেষ্টা করেননি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কেউই তাকে অপসারণ বা পদচ্যুত করার চেষ্টাও করেননি। মূলত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানগণ এক ধর্মের এবং এক নেতার অধীনেই ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

৫৮। ইসলামের জন্য দীর্ঘ ত্যাগ-তিক্ষার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মূলত শান্তিতে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের শুরুতে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্তি এবং সাহায্যের উৎস। তিনি ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে সব সময় সর্বান্তঃকরণে তৈরি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি যেখানে ইসলামকে রেখে গিয়েছিলেন, আবু বকর

রাযিয়াল্লাহু আনহু ঠিক সেখান থেকেই দ্বীনকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি মুসলিম জাতির ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেন, প্রথমে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের পরাজিত করেন এবং তারপর ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশ জয় করেন। আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাকে অশেষ নেয়ামতে পুরস্কৃত করেন।

শেষ কথা

৫৯। আমি পাঠকের সামনে আমার ক্ষুদ্র চেষ্টাকে তুলে ধরেছি, অবশ্যই পাঠকদের জন্য সমালোচনা এবং পরামর্শ প্রদান করার অবকাশ রয়েছে। এটা নিতান্তই একটি সরল প্রচেষ্টা যেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীকে নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আমরা যেন আধুনিক যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

আমি আল্লাহ, সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সম্মানিত আরশের অধিপতির কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এ চেষ্টাকে কবুল করেন, এতে বরকত নসীব করেন এবং এটাকে আমার নেক কাজে অন্তর্ভুক্ত করে যেন। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দুআও করি তিনি যেন আমাকে এবং যারা এ কিতাব সম্পূর্ণ করতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের যেন যথাযথ পুরস্কার থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য এবং সত্যবাদী, শহীদ ও নেককারের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত না করেন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।^{৩৩}

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য' বলে।^{৩১৪}

হে আল্লাহ! আপনি কতই না পরিপূর্ণ এবং সকল প্রশংসা কেবল আপনার জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট নিজের গোনাহের জন্য তাওবা করছি।

কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন

- কুরআন ও বিজ্ঞান (৬২৪০) | ইসলাম ও সামাজিকতা (৬২৪০) | ইসলামে আধুনিকতা (৬২৪০) | তাবলীগ ও তা'লীম (৬২৪০) | পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দীনি অনুভূতি (৬৩০০) | An Appeal to Common Sense (৬৩০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন

- আত্মশুদ্ধির পাথের (৬২৪০) | প্রফেসর হযরতের মালকুয়াত (৬৩০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

- প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর (৬২৪০) | প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর (৬২২০) | সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি (৬২৩০) | পথের দিশা ১-২ (প্রতিটি ৬২৪০) | লোহবতের গল্প (৬৩০০) | একজন আলোকিত মানুষ (৬৩০০) | একা একা আমেরিকা (৬৩০০) | মুহাম্মাদ আদম আলী

- খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি (৬২৪০) | জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (উম্মুল মুমিনিন, সঙ্গীনী, ফকীহ) (৬৪০০) | রশীদ হাইলামায় | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- তাসাওউফ : তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয় | মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ | মূল্য : ৬ ৩০০.০০

- জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (মোট মূল্য ৯৮০) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ | ড. তারিক রমাদান | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৬ ৪০০.০০

- মুনাযাতে মাকবুল (৬২০০) | মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. | পিচ্ছিল পাথর (৬৪৮০) | খাদের বেগ | বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- মালকুজাতে বোয়ালভী রহ. | সংকলন : মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ | মূল্য : ৬ ৩০০.০০

- মুমিনের সফলতা | হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ২০০
- হাদীসের দু'আ দু'আর হাদীস | ইমাম আবু ইসা তিরমিযী | অনুবাদ ও টীকা : মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৩০০.০০
- মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয় | সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান মূল্য : ৳ ২৪০.০০
- The Accepted Whispers (৳৪০০.০০) | Khalid Baig
- Listening to the Quran (৳৫০০.০০) | Khalid Baig
- জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য ১১০০
- জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (প্রথম খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : উম্মে মুহাম্মাদ | মূল্য : ৳ ৯০০.০০
- মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন | শায়খ মাহমুদ আল-মিসরী | অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক | মূল্য : ৳ ৯০০.০০
- জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবী তালিব রা. (প্রথম খণ্ড) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী | মূল্য : ৳ ৮০০.০০
- First Things First (৳৮০০.০০) | Khalid Baig